সাহিত্য-সেবক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ—১৩০২-৩।

লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী।
„ অচ্যুতচরণ রায়।
„ অভয়াশঙ্কর গুহ।
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
„ কালীগোপাল রুদ্র।
শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায়।
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন।
„ গোবিন্দলাল দত্ত।
„ চারুচন্দ্র গোস্বামী।
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৺ জগন্নাথ রায়।
শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন গুহ, বি-এ।
„ তারানাথ চৌধুরী।
„ তারিণীচরণ নন্দী।
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ দেবনারায়ণ ঘোষ।
„ নগেন্দ্রনাথ সরকার।
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্‌-এ।
„ পাঁচকড়ি ঘোষ।
„ প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
„ মতীন্দ্রমোহন বসু।
„ মনোমোহন রায়, বি-এ।
„ মুকুন্দলাল দেব।
„ যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ, এম্‌-বি।
„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।
„ রেবতীমোহন দাস, এম্‌-এ।
„ রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত।
„ বঙ্কিমবিহারী দাস।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ।
„ সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি-এ।
„ সিদ্ধেশ্বর রায়।
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌-এ, বি-এল।

"শিলং সাহিত্য-সভা" কর্ত্তৃক পরিচালিত

ও সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

সূচী।

বিষয়। — পৃষ্ঠা।

১। অতীত ও স্মৃতি ... ২১৮
২। অপূর্ব্ব বাসর (উপন্যাস) ... ৫২, ১১৩, ১৭৫, ২৫১, ৩৪৮
৩। অভিলাষ (পদ্য) ২৮২
৪। আমি ১২
৫। আমি কে ? ৩১৩
৬। আলোক-চিত্র-বিদ্যার উপযোগিতা ... ৩৪০
৭। আলোক-চিত্রের সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি-বিবরণ ... ২৮০
৮। আবাহন (পদ্য) ১
৯। আসামের ইতিবৃত্ত ১৬, ২০৬
১০। ইন্দুমতী (সমালোচনা) ৪৫
১১। ঐক্য ৮৭
১২। ক্ষুদ্র প্রসাদ ১৬১
১৩। কবিতা-কুঞ্জ ৭৬, ১৪৩, ১৬৭, ২১৫, ২৩৮, ৩০৯, ৩৩৮, ৩৭৪

অপরাজিতা ৩১২
আবাহন ২১৫
কি চা'ব ৩৭৮
কে তুমি ? ৩৩৯
চাই প্রাণ ! ১৪৪
জাহ্নবীর প্রতি ৩৭৬
ডাকে ব'ধুয়া ২৪০
তবু আমি নিঠুর কানাই ! ... ৭৬
থাক ৭৯
দগ্ধ হৃদয় ৩৭৭
দু'খানি ছবি ২১৭
পাগলিনী ১৭০
পা'ব প্রতিদান ১৪৪
ভালবাসা তোমার আমার ২৩৯
মানিনী ৩০৯
যূথিকা ৩৭৪
রমণী ৩১১
বিদায় ২৩৮
বিল্ববৃক্ষ ৩৩৯
বিসর্জ্জন ২১৬
শান্তি ৩৭৮
শিশুমঙ্গল ৩৩৮
সাধ ১৬৯
সুহৃদ স্মৃতি ৭৮
সোণার কমল ১৬৭
সোণার মুকুল ১৪৩

১৪। কালিদাসের কাহিনী ... ১৮৭, ২৪৬, ৩১৭, ৩৯৪
১৫। কি হয় ম'লে ? ১৫০
১৬। ক্রোধ ৩০২
১৭। গিরিজায়া ৯২
১৮। গিরিজায়ার গীত (সমালোচনা) ... ২৯১
১৯। চিত্রপট দর্শনে (পদ্য) ১৯
২০। জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটি কথা ... ২৩১, ৩৭৯
২১। জন্ উইক্লিফ্ ৭১

বিষয়। পৃষ্ঠা।

২২। দুর্গাপঞ্চরাত্রি (ভূমিকা) ২৬
২৩। দুর্গাপঞ্চরাত্রি (কাব্য) ... ৬১, ১২১, ১৮২, ২৭৫, ৩৪৪, ৩৮৭
২৪। ধর্ম্ম-সমন্বয় ৮০, ২৯৭
২৫। নিবেদন ২
২৬। পরিণয়ে মনোনয়ন-স্বাধীনতা ... ১৩৬
২৭। প্রকৃত ধার্ম্মিক কে ? ... ৯৯, ২৭০
২৮। প্রকৃতি-পুরুষ ৩২৯
২৯। প্রহসন ১৯৪
৩০। প্রাচীন আসামে আর্য্য-প্রভাব ... ১০৮
৩১। প্রাচীনের পূর্ব্বকথা ৩২১
৩২। প্রাণহীন প্রকৃতি ২৬১
৩৩। প্রার্থনা (পদ্য) ২২৫
৩৪। ফুল ২৪০
৩৫। ফুলের তোড়া (পদ্য) ৫৮, ১০৭

কেন, বল, ফাকি দিয়ে পালা'ল আমায় ? ১০৭
চিত-চোর ৬০
তাই আমি কলঙ্কিনী রাই ! ... ৫৮
পুতুলের বিয়ে ৬০
সাধ ১০৮
স্বপনের ছায়া ১০৮

৩৬। ভ্রান্তি ১০৩, ৩৬৫
৩৭। মহিমা (পদ্য) ১৯৩
৩৮। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ ... ২২
৩৯। রামচন্দ্র কবিরাজ ... ৩৩৩
৪০। রূপনারায়ণ ১২৯
৪১। বাক্যবীর ... ৪০
৪২। শারদ উৎসব ৩৫৯
৪৩। শিক্ষা-ব্যভিচার ১৭১
৪৪। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ... ৬৫
৪৫। "শিক্ষিতে"র নিবেদন ১৪৬
৪৬। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ১৬০, ২২১, ৩৯৯
৪৭। সম্মিলন ৩৬১
৪৮। সাহিত্যের নিত্য লক্ষণ ও সাহিত্য-সাধনা ... ২২৬
৪৯। সাহিত্যের লাভালাভ ৩৩
৫০। সুখ ২৮৯
৫১। সুখ ও দুঃখ ৭
৫২। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ১২৪, ১৬৩
৫৩। হরি বল মন ২৮৬
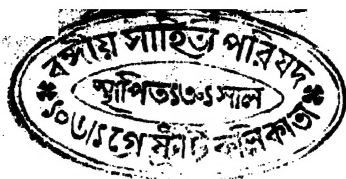
সাহিত্য-সেবক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ।

আবাহন।

যে ভুবনে রবি, শশী, তারকা-নিকর,
বিমল কিরণ-ধার করি' বিকীরণ,
আলোকিত করে নিতি বিশ্ব চরাচর,
বিনাশি' আঁধার-রাশি অনন্ত প্লাবন,—
জ্বলে তথা ক্ষীণপ্রাণ খদ্যোতের পাঁতি
ক্ষুদ্র মনে ক্ষুদ্র আশা করিয়া পোষণ—
যথাশক্তি দিবে ভবে আলোকের ভাতি,
তরল তিমির-কণা করিতে হরণ!
সযতনে সুধীবর কৃতী পুত্রগণ
সাজা'ন যে মাতৃভাষা রতন-ভূষণে,
দীন হীন "সেবকের" বাঞ্ছা অনুক্ষণ—
সাজা'বে চরণ তাঁ'র তৃণ-আভরণে।
ভরসা কেবল তব চরণ-সঙ্গতি,—
অধমে অভয় দান কর মা ভারতি!

নিবেদন।

অনন্ত সময়-স্রোতে একটী ক্ষুদ্র বর্ষ ভাসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রপ্রাণ 'সাহিত্য-সভা'র সাহিত্য-লীলারও এক অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। পরমাণুর সহিত পরমাণুর সমবায়ে বিমানস্পর্শী মহাশৈলের সংগঠন হয়, বিন্দুর উপর বিন্দুপাতে উত্তাল-তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ঘটে,—ক্ষুদ্রপ্রাণ মানবের সাধ্য কি, এই মহাতথ্যের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করে? সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে, তদানীন্তন শিলঙ্-প্রবাসী কতিপয় কৃতবিদ্য-ব্যক্তির যত্নে যখন ৪৭ খানি মাত্র পুস্তক অবলম্বনে 'সাহিত্য-সভা'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, কে তখন আশা করিয়াছিলেন যে, এই দীর্ঘকাল পরে প্রায় দেড় সহস্র সদ্গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সভা আজি নব উৎসাহে ও নবীন উদ্যমে সাহিত্য-সেবক গঠন করিতে পারিবে?—তখন উহার কঙ্কালমাত্র গঠিত হইয়াছিল; আজি উহা অনেকাংশে, পূর্ণাবয়বসম্পন্ন হইয়া এই নূতন কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। অপূর্ণ মানবের উদ্যোগে কো[ন] কার্য্যই পূর্ণ হয় না,—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই সকল অনুষ্ঠানের সার ভিত্তি। আ[জ] তাঁহারই নাম মস্তকে ধারণ করিয়া 'সাহিত্য-সেবক' সাহিত্য-সংসারে অবতীর্ণ হইল;—কাল সাক্ষ্য দিবে, কিসে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

কার্য্য বিধাতার বিধানানুযায়ী হইলেও, নগ্ন চক্ষুর সমক্ষে মানুষ তাহার উপলক্ষ; সুতরাং তৎসাধনের ইষ্টানিষ্ট কল্পে মানুষই সাধারণের নিকট দায়িত্ব-ভাগী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সেই সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ।—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা প্রসূত হইলেও, 'সাহিত্য-সেবকে'র সৃষ্টির জন্য উহার অনুষ্ঠাতৃগণ 'সাহিত্য-সভা'র প্রত্যেক সভ্য এবং অপর সাধারণের নিকট সমভাবে দায়ী। সেই দায়িত্বের অনুরোধে, কার্য্যারম্ভে, দুই চারি কথা নিবেদনের প্রয়োজন বো[ধ] হয়।

বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করাই 'সাহিত্য-সভা'র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে—

১। বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ এবং তদ্দ্বারা স্থানীয় বঙ্গভাষানুরাগী ও বিদ্যোৎ-

সাহী বন্ধুবর্গের পরিচর্য্যায় তাঁহাদিগের বাঙ্গালা গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করা; এবং

২। বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধনোদ্দেশে তাঁহাদিগের বাঙ্গালা রচনার অনুরাগ ও ইচ্ছা সঞ্জাত করিয়া দেওয়া।

'সভা'র বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা প্রথম উপায় অবলম্বনে অনেক পরিমাণে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এখন দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রস্বরূপ এই 'সাহিত্য-সেবকে'র জন্ম। দীন, বঙ্গভাষার সহিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। অধুনা এই শিলঙ-শৈলে তাদৃশ মহানুভবের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এবং তাঁহাদিগের অধিকাংশই 'সাহিত্য-সভা'র সহিত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংশ্লিষ্ট। বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনোদ্দেশে তাঁহারা সকলেই এক প্রাণে ইহার অভীপ্সিত কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন—এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া 'সাহিত্য-সেবক' কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। পরন্তু, সাহিত্যবিৎ সর্ব্ব সাধারণের সহিতই 'সাহিত্য-সেবকে'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এস্থলে বলা বাহুল্য, প্রয়োজনই প্রত্যেক কার্য্যের মূলসূত্র এবং উদ্দেশ্য সংসাধনই তাহার চরম লক্ষ্য। অতএব, 'সাহিত্য-সেবকে'র প্রয়োজন এবং তাহার উদ্দেশ্য বর্ণন করিলেই সাধারণের সহিত উহার সম্বন্ধ সূচিত হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, বর্ত্তমান অবস্থায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে 'সাহিত্য-সেবকে'র কোন প্রয়োজন আছে কি না। যে সংসারে 'বঙ্গদর্শন,' 'বান্ধব' ও 'আর্য্যদর্শন' বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইয়াছে, 'প্রবাহে'র স্রোত কাল-স্রোতে লয় পাইয়াছে, 'নবজীবন' অকালে বিনষ্ট হইয়াছে, 'আলোচনা' ও 'প্রচার'-কার্য্য অল্পদিনেই ফুরাইয়াছে, 'কল্পনা'র আবেগ শূন্যমার্গে মিশিয়াছে, 'মালঞ্চ' অঙ্কুরেই বিশুষ্ক হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে আরও কত 'মাসিক', 'পাক্ষিক' ও সাময়িক সমালোচকের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, সে সংসারে এই ক্ষুদ্র 'সাহিত্য-সেবকে'র সৃষ্টির, বাস্তবিক, কি কোন আবশ্যকতা আছে?—আবার যে ক্ষেত্রে এখনও 'ভারতী'র বাণী বঙ্গীয় পাঠকের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিতেছে, 'নব্যভারত' প্রাচীন ভারতের স্থান অধিকার করিয়া অটলভাবে স্বকীয় বিজয়-নিশান উড়াইতেছে, বঙ্গবাসী জননী 'জন্মভূমি'র যথাসাধ্য পরিচর্য্যা সাধন করিতেছে, এবং স্বয়ং 'সাহিত্য'ই সশরীরী সৌম্যমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, সে ক্ষেত্রে আবার নূতন 'সাহিত্য-সেবকে'র কি কোন প্রয়োজন আছে?—

সহৃদয় পাঠক এবং সুশিক্ষিত লেখকগণ এই গুরুতর প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন। উপস্থিত, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, 'সাহিত্য-সেবকে'র নব আবির্ভাব বর্ত্তমান 'সময়ের লক্ষণ।' 'জন্মভূমি'র 'সূচনা'য় এই কাল-ধর্ম্মের প্রতি তীব্র কটাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়;—সাময়িক পত্রের অনুক্ষণ উত্থান-পতনের হেতু নির্দ্ধারণে, এবং তদীয় দীর্ঘজীবন লাভের উপায় নির্ব্বাচনে, 'জন্মভূমি' যত্নের ক্রটী করেন নাই। কিন্তু, তথাপি, কাল-ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হয় নাই—সাময়িক পত্রের জন্ম-মৃত্যুর ক্রম কোন অংশে পরিবর্ত্তিত বোধ হয় না। এই সাময়িক পত্রের উত্থান-পতনের মধ্যে অলক্ষিত ভাবে একটী লক্ষণ প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষাই এই কালধর্ম্মের মূল; এই শিক্ষাগুণে সাধারণের জ্ঞানস্পৃহা অপেক্ষাকৃত বলবতী হইয়াছে, এবং সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্যই গণ্য নগণ্য নানাবিধ সাময়িক সাহিত্যের অভ্যুত্থান ঘটিতেছে। 'যোগ্যতমের দীর্ঘজীবন' সুনিশ্চিত;—এই অবিসংবাদী সূত্রানুসারে সাহিত্যসেবী যোগ্য পাত্রগুলিই সংসার-ক্ষেত্রে কিছু দীর্ঘকাল কার্য্য করিতেছেন, অপর সকলে অকালেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। কেবল জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যই এই যোগ্যতার একমাত্র উপাদান নহে, তাহা হইলে বঙ্গদর্শন-বান্ধব বা নবজীবন-প্রচারের অকাল নিধন ঘটিত না। আয়োজন ও যত্নের গুণেও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়; এই যত্ন-আয়োজন-বলেই অপেক্ষাকৃত হীনগুণ পত্রেরও অবস্থা অনেক স্থলে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

'সাহিত্য-সেবক'ও সেই পাশ্চাত্যশিক্ষাজনিত জ্ঞানস্পৃহাবশে মাতৃভাষার সেবাকল্পে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে। বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে বসিয়া শক্তিসম্পন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বীয় মাতৃভাষার সেবায় নিরত আছেন;—ইহা বাস্তবিকই শ্লাঘনীয়; কিন্তু মাতৃভূমির সীমা অতিক্রম করিয়া, সুদূর খাসিয়া শৈলের শিখরদেশে বিভিন্ন প্রকৃতিস্থ এবং বিভিন্ন ভাষাবিৎ লোকের সংসর্গে মিশিয়াও, মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি যে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা দ্বারা—

> "Let all the ends thou aim'st at
> Be thy country's———"

মহাজনোক্ত এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এই সামান্য কারণেও 'সাহিত্য-সেবক' সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে—এরূপ সম্পূর্ণ ভরসা করা যায়। স্বদেশবাসী সুহৃদ্বর্গের ন্যায় ইহার জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য বা আয়োজনের অনুরূপ শক্তি নাই, কিন্তু ইহার আ[illegible]

জীবনব্যাপী যত্ন। এই যত্ন মাত্র সহায়ে কতদিন ইহার অস্তিত্ব থাকিবে, সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন। তবে—উত্থান-পতন সংসার-চক্রের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম—অকাল-পতন ঘটিলেও ইহার পক্ষে আক্ষেপের হেতু দেখা যায় না; উত্থানকালে, প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, অস্ফুট বিনয়-বিনম্র বচনে ইহা সর্ব্ব সমক্ষে বলিবে—

তথাপি "কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

আর, কালবশে লয়প্রাপ্ত হইলেও, সাহিত্য-সংসারে 'সময়ের লক্ষণ' দেখাইয়া যাইবে,—ইহাই উহার পক্ষে সন্তোষের যথেষ্ট কারণ। সার্দ্ধ দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে 'নব্যভারত' কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কালে জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষাই নব্যভারতের ভাষা হইবে। তাঁহার সে আশা কখন পূর্ণ হইবে কি না, বলা যায় না; তবে শিক্ষিত বাঙ্গালী আজি-কালি মাতৃভাষার সেবায় বদ্ধপরিকর এবং অনেকাংশে সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন,—এ কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বে শিক্ষাভিমানী বঙ্গীয় যুবক পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভাষায় আপন নাম উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন, এমন কি—বড় অধিক দিনের কথা নহে—তৎসম্প্রদায়ের মৌখিক কথায় ইংরাজি বাঙ্গালার অবাধ মিশ্রনজনিত খিচড়া-ন্নের গুরুপাকে অস্থির হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে তাঁহাদিগের জন্য মহাত্মা Southey-বিহিত দণ্ডাজ্ঞার বিধান করিতে হইয়াছিল; আর এখন বিলাত প্রত্যাগত, অন্যথা ইংরাজতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত, যুবক—পরন্তু, ভারতের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরপ্রবাসী প্রৌঢ় পর্য্যন্ত মাতৃভাষার মর্য্যাদা সংরক্ষণে সম্পূর্ণ সচেষ্ট। ইহা নিরতিশয় আনন্দের কথা, এবং দীনা বঙ্গভাষার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ, সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রকেই এই স্রোতঃ পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা বলিতে হইবে।—শুভক্ষণে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বৈদেশিক বহু ভাষা হইতে রত্ন সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় মাতৃ-ভাষার পুষ্টিসাধন করিতে—বৈদেশিক সাহিত্যের অধীত জ্ঞানরাশি স্বদেশীয় [illegible] ব্যক্ত করিয়া স্বদেশবাসীকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, [illegible] সেই পথে স্বীয় সুহৃদ্বর্গের মতি-গতি ফিরাইতেও সক্ষম হইয়াছিলেন; [illegible] তাঁহারই প্রদর্শিত পথে, পঙ্গু হইয়াও, 'সাহিত্য-সেবক' সংসারক্ষেত্রে [illegible] হইতেছে। 'নব্যভারতে'র নির্দ্দিষ্ট আশা বা অভিমান ইহার নাই;

তবে, যে কয়েক দিন জীবিত রহিবে, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবায় যেন ইহার সর্ব্বথা মতি থাকে—ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' 'শিলঙ্ সাহিত্য-সভা' অপেক্ষা জন্মগত বংশ-মর্য্যাদায় ও কার্য্যগত গুণগ্রামে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; তাই 'পরিষদ'-সংগঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইতে 'পত্রিকা'র উৎপত্তি হইয়াছে। অবস্থাগতিকে, 'সভা'র 'সেবক', সে পক্ষে পশ্চাৎপদ হইলেও, সহযোগিনী শ্রেষ্ঠা ভগিনী 'পত্রিকা'র ন্যায় 'সাহিত্যে'র সেবাতেই, প্রধানতঃ, জীবন উৎসর্গ করিবে, এবং বঙ্গসাহিত্যের লুপ্তরত্নোদ্ধারে তাঁহার সহায়তা করিতেও ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত রাখিবে; কিন্তু 'সেবক' সাহিত্য-সংসারে নিতান্ত শিশু ও সুকুমার,—সুতরাং সুকুমার সাহিত্য-সেবাতেই সহৃদয় পাঠকগণ উহাকে অপেক্ষাকৃত নিযুক্ত দেখিতে পাইবেন। তবে, তদন্তর্গত কাব্য-উপন্যাস, চরিত-ইতিহাস, আলোচনার সঙ্গে, সাধ্যমত, দর্শন-বিজ্ঞানের বন্ধুর পথেও পাদক্ষেপ করিতে 'সেবক' চেষ্টার ত্রুটী করিবে না; কেবল আদৌ পারিবে না—রাজনীতির সমালোচনা করিতে; এ কার্য্য বাস্তবিক উহার সাধ্যায়ত্ত নহে।

আর এক কথা। জনৈক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "সাহিত্য স্বর্গের দুহিতা;—মানব-জীবনের পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, দূর করিয়া হৃদয় পরিমার্জ্জিত ও অনন্তের পথে প্রধাবিত করিবার জন্যই উহার মর্ত্ত্যে আবির্ভাব।" সেই স্বর্গদুহিতা সাহিত্যের সেবায় 'সেবকে'র ক্ষুদ্র শক্তি ব্যয়িত হইবে,—ইহাই সভার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'সেবক' কোন সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র হইবে না; নিরপেক্ষভাবে সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জন এবং সর্ব্বোপরি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। 'সাহিত্য-সভা' এই দৃঢ় সংকল্প ও আত্মগৌরব সংরক্ষণে আজীবন লক্ষ্য রাখিয়াছে; বলা বাহুল্য, তদনুষ্ঠিত 'সেবক'ও কদাপি সেই উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হন তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন করিবে। সর্ব্বলোকবিধাতার নিকট 'সেবকে'র শেষ প্রার্থনা—

"যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।"
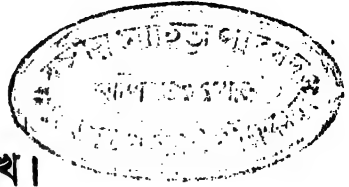
সুখ ও দুঃখ।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

জগতে যে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, উহার মূলে সুখলাভের ও দুঃখমোচনের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখা যায়। ঐ যে রবিরশ্মি-প্রপীড়িত গলদ্ঘর্ম্ম কৃষাণ বহুকষ্টে হল চালনা করিতেছে; ঐ যে দারুণ শীতের সময়ে মৎস্যজীবী জলাশয়ের সুশীতল জলমধ্যে নিমজ্জমান হইতেছে; ঐ যে বিদ্যালয়ের ছাত্র আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি গ্রন্থাধ্যয়নে স্বীয় শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট করিতেছে; ঐ যে আপিষের কর্ম্মচারী প্রভুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাণপণে খাটিয়া শরীর পাত করিতেছে, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য পরিণামে সুখলাভ ও দুঃখাপনোদন। কণ্টকদ্বারা যেমন কণ্টকোদ্ধার হয়, তদ্রূপ আপাতক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কি কৃষাণ, কি মৎস্যজীবী, কি ছাত্র, কি কর্ম্মচারী, সকলেই ভবিষ্য দুঃখ নিবারণের তথা সুখপ্রাপ্তির উপায় সাধন করিতেছে।

সুখের জন্য সকলে লালায়িত হইলেও, রুচিভেদে, প্রকৃতিভেদে ও শিক্ষার তারতম্যে, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ত্ম অনুসরণ করতঃ সুখান্বেষণ করিতেছে। আমার যাহাতে সুখ, অপরের পক্ষে হয়ত তাহা ক্লেশজনক, এবং আমার যাহাতে দুঃখ, অন্যের তাহাই সুখজনক হইতে পারে। একটা স্থূল কথাই ধরা যাউক। সংসার সুখ আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষার জিনিস; কিন্তু শুকদেবের পক্ষে তাহা বিষবৎ হেয় পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

মানুষের সুখ ও দুঃখ তাহার মানসিক বা শারীরিক অনুভূতি মাত্র। সুতরাং মনের বা শরীরের অবস্থার উপর উহা অনেকটা নির্ভর করে। উপস্থিত আমার যে কার্য্যে অপরিসীম সুখ, সময়ান্তরে, মনের ভাবান্তর হইলে, সেই কার্য্য দারুণ দুঃখজনক হইয়া থাকে। আবার রুগ্ন ব্যক্তি বা স্থবিরের পক্ষে যাহা ক্লেশকর, এক সুস্থকায় ব্যক্তি বা যুবকের পক্ষে তাহা সুখজনক হইতে পারে।

সংসারের সকলই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং সাংসারিক সুখ-দুঃখও অচির-স্থায়ী।

আজ যাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিষণ্ণ হই, কাল তাহারই প্রীতিপ্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণে আনন্দ লাভ করি। ফলতঃ, নিরবচ্ছিন্ন সুখী কি দুঃখী লোক জগতে অতি বিরল।

সুখ বা সুখের আশা সকলেরই হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতি হীন দরিদ্র বিষম ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, যাহার এ জগতে আপনার বলিতে কিছুই নাই, তাহাকে দেখিয়া মনে করিতে পার, বুঝি, এই ব্যক্তি আপনার দুঃখময় জীবনের অবসান সততই কামনা করিতেছে ; কিন্তু যদি কেহ উহার প্রাণবিনাশে উদ্যতখড়্গ হয়, দেখিবে, সে প্রাণপণে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিবে। অবশ্যই কোন সুখের আশাবন্ধ তাহার জীবনের অবলম্ব হইয়া রহিয়াছে।

আবার দুঃখানুভূতিও আপামর সকলেরই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। তোমার দৃষ্টিতে যাঁহাকে আজন্ম সুখী দেখিতেছ, যিনি মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গের ভোগ-সুখ অনুভব করিতেছেন মনে কর, সেই অসামান্য সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে কোনরূপ দুঃখ বা দুঃখের স্মৃতি তাঁহার চিত্ত বিক্ষোভিত করিতেছে। একটি গল্প বলিতে হইল। কোন রাজা তদীয় সন্তানের মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনরূপে প্রবোধ দিতে না পারিয়া এক দিন তাঁহার সুচতুর মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার একটি মুক্তার বাগান আছে, ইচ্ছা করিলে তাহা পরিদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রাতঃকাল ভিন্ন উহা দেখান যাইতে পারে না। মন্ত্রীর উদ্যানে এক সার্ষপ ক্ষেত্র ফলিত হইয়াছিল ; হৈমন্তিক প্রভাতে শিশির বিন্দু ক্ষেত্রোপরি উপচিত হইয়া অনতিপ্রখর প্রাতঃসূর্য্যের কিরণপ্রভায় ঝলমল করিতে করিতে মুক্তাফলের ন্যায় পরিলক্ষিত হইত। দূর হইতে ঐ শোভা রাজাকে প্রদর্শন করতঃ মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! এ জন্মে যে কেহ কখন কোন শোকদুঃখের অধীন হয় নাই, একমাত্র সেই ব্যক্তি উহার সমীপস্থ হইতে কিংবা ঐ মুক্তাফল আহরণ করিতে পারিবে। রাজা, ঐরূপ ব্যক্তি কেহ আছে কি না জানিবার জন্য রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিলেও এতদবস্থ কাহাকেও পাওয়া গেল না। তখন মন্ত্রী রাজাকে বুঝাইলেন যে, যখন জগতের সকলেই শোকদুঃখের অধীন, তখন স্বীয় শোককে মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী একটি অবস্থা ভাবিয়া উহা সংবরণ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

সুখের অর্জ্জন ও দুঃখের বর্জ্জন জীবের প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইলেও

ধীর বুদ্ধির ত্রুটিতে বা অসাবধানতার ফলে কৃত কর্ম্মের জন্ত জীবকে ক্লেশ-ভোগ করিতে হয়। অতএব, সুখ ও দুঃখ অনেকটা নিজ কর্ম্মের ফলাফল। সুপথে চলিয়া সৎকর্ম্ম করিলে সুখ ও কুপথে চলিয়া কুকর্ম্ম করিলে দুঃখ হয়, ইহা অতি সাধারণ নীতিসূত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যাহারা কুপথে চলিয়া কুকর্ম্ম করে, তাহারা নিজের বিকৃত বুদ্ধিতে ঐ কর্ম্মে সুখলাভ করিবে ভাবিয়াছিল, কারণ, পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুখ প্রাপ্তিই মানবের সমুদয় ক্রিয়াঁর উদ্দেশ্য। বুদ্ধির বিকৃতিতে জীবের দুঃখ হয়, এতদ্দৃষ্টেই বা পাশ্চাত্য পুরাণের মতে বুদ্ধি-বৃক্ষের ফলাস্বাদনে দুঃখের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।*

এতদ্ব্যতীত সুখ-দুঃখ কিয়ৎ পরিমাণে নিয়তির উপরও নির্ভর করে। নিয়তি বা অদৃষ্ট কেবল যে প্রাচীন জগতেই মান্য হইত এমন নহে; অধু-নাতন দার্শনিকগণের মধ্যেও উহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, সদুদ্দেশ্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহার ফলে কর্ম্মকর্ত্তার ও সাধারণের সুখ ধ্রুব; কিন্তু হঠাৎ সমস্তই যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, প্রাচীনতম পদকর্ত্তার সঙ্গে বলিতে হইল—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥"

শাশ্বতিক সুখলাভ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্ত যদিও আবহমান কাল হইতে মানবগণ নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা পাইতেছে, তথাপি এযা-বৎ উহার কোন উপায় কি কৌশল আবিষ্কৃত হইল না। চিন্তাশীল দার্শনিক-গণ জগৎকে দুঃখময় জ্ঞান করিয়া,কিসে সুখ উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন; ভাবুক কবিগণ নানা ভাষায় নানা ছন্দে উহারই অনুশীলন করিয়াছেন; এবং পারমার্থিক সাধুগণেরও উহাই সাধনার বিষয়। কিন্তু যতদিন জগতে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—এই প্রবাদ থাকিবে, ততদিন এই সমস্যার সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত সুদূর-পরাহত। পরন্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সুখ ও দুঃখের মাত্রা যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়া উক্ত প্রহেলি-কাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে।

এখন প্রকৃত সুখী কে, এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

---

* ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যকেই যথাক্রমে দুঃখ ও সুখের নিদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল। লেখক।

একবার বকরূপী ধর্ম্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির মহারাজকে ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসীচ স বারিচর মোদতে ॥"

দিনান্তে একবার যে ব্যক্তি শাকমাত্র আহার করে অথচ ঋণজালে জড়িত হয় না, ও (ধন লোভে) দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে না, সেই ব্যক্তি সুখী। ফলতঃ, যদি অভাবই দুঃখের মূল বলিয়া ধরা যায়, তবে যে ব্যক্তির কোন অভাব বোধ নাই, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট আছে, সেই একমাত্র ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী।

সুখের মূল সন্তোষ ও দুঃখের মূল অভাব। নিদান স্থির হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সন্তুষ্টির অনুশীলন ও অভাবের দূরীকরণ সুখলাভের ও দুঃখাপনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়। স্থির করিয়া বলিলেও ঐ দুইটি একই কথা ; যেহেতু সুখ ও দুঃখ উভয়ের মধ্যে এমনই সম্বন্ধ যে, একের আবির্ভাবে অপরের তিরোধান সূচিত হয়।

আমরা সচরাচর যে সকল উপভোগের সামগ্রীকে সুখের উপাদান বলিয়া মনে করি, উহারা অনেকেই কিন্তু সন্তোষের প্রধান অন্তরায় ও অভাবের প্রকৃত জনক। উহারা যত প্রশ্রয় লাভ করিবে, সন্তোষ ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে এবং উহাদের অনুবন্ধী নূতন নূতন অভাবের আবির্ভাব হইতে থাকিবে। ঋষিশাপে রাজা যযাতির অকাল বার্দ্ধক্য হইয়াছিল। একে যৌবন কাল, তাহাতে আবার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতা ; রাজার এমন অবস্থায় বার্দ্ধক্যের উদয়ে মনে হইল—হায়, জন্মের মত সুখ-ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম,—এমন কেহ কি নাই যে কিয়দ্দিন আমার জরাভার বহন করে, ইতিমধ্যে আমার ভোগসুখলালসা চরিতার্থ করিয়া লইতে পারি ? তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র যযাতির জরাভার অঙ্গীকার করিলেন। রাজা দীর্ঘকাল যৌবনলীলায় সুখভোগ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে বুঝিলেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োভূয়োঽভিবর্দ্ধতে ॥"

—ঘৃতাহুতিতে যেমন অগ্নি উদ্দীপিত হয় মাত্র, নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ উপভোগ দ্বারা বিষয়লালসা নিবারিত না হইয়া কেবল পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষাই সুখভোগের অন্তরায় ; কারণ আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই অভাব, অর্থাৎ দুঃখের নিদান, জড়িত থাকে। সুতরাং ভোগ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান অপেক্ষা দমনের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। ইহাতে ভোগসুখের অভিলাষের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সন্তোষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সন্তোষই ধৃতি, তিতিক্ষা, দম, শম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলেরই নামান্তর বা ভাববিশেষ মাত্র। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উহারই অনুশীলনার্থ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সন্তোষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে কীদৃশ অবস্থা হয় ? আমরা উহার কি বলিব, কি বুঝিব ? যেহেতু, আমরা কখন সুখের ভাবে উৎসিক্ত, আবার কখন দুঃখের তাড়নায় উদ্বেজিত ! শুনিয়াছি, যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু পতিত হইলে অচিরেই তাহা পড়িয়া যায়, এক কণাও উহাতে লাগিয়া থাকিতে পারে না, ঐরূপভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে, তদ্রূপ দুঃখাকর ভাব ক্ষণকালের জন্যও, অধিকার লাভ দূরে থাকুক, প্রবেশলাভ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

সন্তোষ সাধনের আর একটি প্রকৃষ্টতর উপায় আছে। ধনজন প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ের উপর চিত্তের প্রবণতা জন্মিলে, উক্ত নশ্বর বস্তুর ভাবাভাবের উপর জীবের সুখ-দুঃখ অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। পরন্তু, অবিনশ্বর পদার্থ কিছু যদি থাকে, তৎপ্রতি প্রেম জন্মাইতে পারিলে এক চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, দুঃখ তাহার নিকটেও কদাপি আসিতে পারে না। ফলতঃ ভগবদাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ যে কি এক অনির্ব্বচনীয় অবিমিশ্র সুখলাভ করিয়া থাকেন, তাহা কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতির বিষয়।

উপরে সুখলাভ ও দুঃখাপনোদনের যে যে উপায় উল্লেখিত হইল, তাহা কেবল কয়েকটি স্থূলতম কথা মাত্র। পরন্তু, উহাতে কেবল আভ্যন্তর, অর্থাৎ মানসিক সুখ ও দুঃখের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে, ভৌতিক সুখ দুঃখ, অর্থাৎ শারীরিক ভোগ ও ক্লেশ, সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, একের অবস্থান্তরে অপরেও অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা সাধনা-রাজ্যে কিছুমাত্র প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, অন্তর্জগতের সংগ্রামে যিনি জয়লাভ করিয়াছেন, অনায়াসে কর্ম্ম করিয়া-

ছেন, তাঁহার বাহ্যপ্রকৃতিকে পরাজয় করিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না। *

উদ্বেলিত সুখ ও দুঃখের বাহ্য বিকাশ হাস্য ও ক্রন্দন। জগতের এমনই লীলা, সদ্যোজাত শিশুও এই সুখ-দুঃখের অধীন, নতুবা তাহারও হাসি-কান্না দেখিতে পাইব কেন? এই সদ্যোজাত "সাহিত্য সেবকে" সুতরাং প্রথমেই এই সুখ ও দুঃখের কাহিনী গাহিতে হইল। সহৃদয় পাঠকের নিকট তজ্জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

আমি।

'আমি' সর্ব্বনাম পদ। ধন্য বৈয়াকরণের পাণ্ডিত্য! সংসারের সকলই 'আমি'—বোধ হয়, সেই অর্থে সর্ব্বনাম হইয়া থাকিবে; নতুবা, যে 'আমি'র প্রতাপে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল কম্পমান, তাঁহাকে বিশেষ্য, মহা বিশেষ্য অথবা বিশেষ্যস্য বিশেষ্য বলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু বৈয়াকরণ 'আমি'কে সর্ব্বময় করিয়াছেন; সুতরাং 'আমি' সাধারণ হইয়া পড়িয়াছেন—যাহা সাধারণ, তাহা ত আর বিশেষ হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, 'আমি' সর্ব্বময় হইলেও, 'আমি' সাধারণ নহেন—'আমি' এক জন মহা অসাধারণ পুরুষ; সুতরাং 'আমি'কে বিশেষ্য বলিবে না কেন, তাহা ত বুঝিলাম না। পক্ষান্তরে, আমি করি, আমি খাই, আমি যাই, সকল কার্য্যেই 'আমি'—এই অর্থে 'আমি' সাধারণ অথবা সর্ব্বনাম হইলেই বা আপত্তি কি? মহা গোলযোগ! 'আমি' কি পদ, স্থির করা মহা বিপদ!

আমি কোন্ লিঙ্গ? আমি যখন মহাবল পরাক্রান্ত মহামহিম বীরেন্দ্র সিংহ, তখন অবশ্য পুরুষ। আবার যখন তোমার পাচিকা, পরিচারিকা, শ্রীচরণ-সেবিকা শ্রীমতী ভানুমতী দাসী, তখন স্ত্রীলিঙ্গ। তাহার পর যখন

---

* এতদ্বিষয়ে ভবিষ্যতে কিছু আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

চীন-জাপানে তুমুল সংগ্রাম, কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে তাহার স্থিরতা নাই, তখন আমি ক্লীবলিঙ্গ। সে দিন আর্য্য সমিতির অসাধারণ অধিবেশনে যখন স্বদেশোদ্ধার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করি, তখন আমার অমানুষী গলা-বাজি, মেজের উপর সবলে মুষ্ট্যাঘাত, মুখের ভঙ্গী, চোখের জ্যোতিঃ, বুকের ছাতি প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই বলিয়াছিল, আমি একজন অদ্বিতীয় পুরুষ। আবার সেই আমি যখন 'নাকে-কাণে খৎ দিয়া', হাতে ধরিয়া পায়ে পড়িয়া, আগুন অহম্মুখিতার জন্য মাফ্ চাহিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম, তখন সকলেই বলিল, আমি পুরুষ নহি, আমি স্ত্রীরও অধম। তাহার পর সে দিন মুঙ্গের গমন কালে আমার পার্শ্বের গাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটী ছিল, গাড়ীর চৌকিদার সাহেব যখন তাহার উপর অত্যাচার করেন, তখন আমি নিস্তেজ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলাম বলিয়া সকলেই আমাকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া স্থির করিয়াছিল। ফলতঃ, কে কোন্ লিঙ্গ, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। যাহারা সন্তান প্রসব করে তাহাদিগকে লোকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে; কিন্তু বল দেখি, লাক্ষণেয় সেন সন্তান প্রসব না করিয়াও স্ত্রীলিঙ্গ কি না? পক্ষান্তরে, দুর্গা-রাণী সন্তান প্রসব করিলেও তাঁহাকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না বলিয়া স্ত্রী বলিতে কে সাহস করিবে? বল দেখি রাণী ভবানীকে পুরুষ না বলিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরুষ বলিব কি না? তোমরা পাঁচ জনে যাহা বল না কেন, আমি ত লিঙ্গ নির্ণয়ে হারি মানিলাম।

তাহার পর আমি কোন্ পুরুষ? ব্যাকরণের মতে আমি অদ্বিতীয় উত্তম, তুমি (কে তাহা জানি না, বোধ হয় গৃহিণী) মধ্যম, আর আর সকলেই অধম অথবা অধমাধম পুরুষ। কি গোলযোগের কথা! কি বিসদৃশ ব্যাপার! যিনি চোরের সর্দ্দার, লম্পটের অগ্রগণ্য, মিথ্যাবাদীর মহা গুরু, তিনি যখন আমিত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি হন উত্তম পুরুষ, আর যখন ভক্ত চূড়ামণি, পরোপকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঋষিতুল্য মহাপুরুষ আমিত্ব বর্জ্জিত হন, তখন তিনি অধম পুরুষ হইয়া থাকেন! তদ্ভিন্ন হরির মা, যাহাকে দেশ শুদ্ধ লোকে স্ত্রীলোক বলিয়া জানে, সে যখন আমিত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সেত পুরুষ হইয়া পড়েই,—পদের অন্বয় করিবার সময়ে সকল স্ত্রীলোকেই পুরুষ হইয়া যায়। ব্যাকরণের কি বেজায় বেয়াদবী! ফলতঃ, 'আমি'র যখন লিঙ্গ নির্ণয় হইল না, তখন পুরুষত্ব স্থির করা বড় কঠিন কথা।

কারকত্বে 'আমি' কর্ত্তা; কিন্তু শাস্ত্রে বলে, "তোমার কর্ম্ম তুমি কর, মা, লোকে বলে করি আমি।" তাহা হইলে আর 'আমি'র কর্ত্তৃত্ব কোথায় রহিল? "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি;" সুতরাং তুমি না করাইলে আমিত কিছুই করিতে পারিনা! বানর নাচে সত্য, কিন্তু বানরওয়ালা নাচায়; যতক্ষণ সে না নাচায়, ততক্ষণ ত বানর নাচিতে পারে না! এমত অবস্থায় বানরওয়ালাকে কর্ত্তা না বলিয়া বানরকে কর্ত্তা বলিবার কোন কারণ দেখি না। তথাপি আমি ইহা করিতেছি, আমি উহা করিব, আমি তাহা করিয়াছি, ইত্যাদি অহং জ্ঞানে সমস্ত জগৎ বিভোর হইয়া রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য! প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহার কর্ম্ম তিনি আমাদিগকে যে রেখার মধ্যে চালিত করেন, তাহা অতিক্রম করিয়া এক পদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। এ কথা কিন্তু আমরা বুঝি না, এবং বুঝি না বলিয়াই সংসারে এত দুঃখ, এত হাহাকার, এত বিরোধ, এত বিসম্বাদ। আমাদিগের অহঙ্কার এতই প্রবল যে, তাহাতে একটু ফুলের আঘাত সহ্য হয় না; তুমি আমার আমিত্বের এক চুল সরাইবার চেষ্টা করিলে তোমার সহিত লাঠালাঠি বাধিয়া যাইবে। খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সুখ-সম্পদ সকলই আমি লইতে চাহি; দান-ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যও আমিত্বের ক্ষুধা নিবারণের জন্য। সংসারে যাহাকে লোকে ভাল বলে, যাহাতে মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, সে সমস্তই আমি করি; আর যাহা মন্দ, যাহা নিন্দনীয়, তাহা তুমি কর—আমি করিলেও তোমার স্কন্ধে তাহার কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। ফলতঃ, আমি যে কি প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; এ সংসারে আসিয়া 'আমি' মহাশয়কে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু 'আমি' মহাশয়ের এতই মহিমা যে, তাঁহাকে চিনিতে পারাই, বোধ হয়, মনুষ্য-জীবনের সার কার্য্য, তাঁহার সহিত আলাপই, বোধ হয়, জীবনের উদ্দেশ্য। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, 'আমি' কে চিনিতে পারিলাম না! 'আমি'র স্বরূপ কি, বা কি উপায়ে তাঁহাকে জানা যায়, তাহার কিছুই স্থির হইল না। সংসারে আসিয়া 'আমি' 'আমি' করিয়া মরি, কিন্তু 'আমি' কে, তাহা জানি না—ইহা অপেক্ষা আর গুরু প্রহেলিকা কি হইতে পারে? এ ঘোর রহস্যের মর্ম্ম কি প্রকারে উদ্ঘাটিত করি, তাহার ত উপায় দেখি না। 'আমি'কে চিনে এমন লোক সংসারে থাকে না; সুতরাং মধ্যবর্ত্তী হইয়া 'আমি'র সহিত আলাপ করাইয়া দেয়

কে? কাঁটার দ্বারা লোকে যেমন কাঁটা বাহির করে, জল দিয়া যেমন জল বাহির করা যায়, সূর্য্যের দ্বারাই যেমন সূর্য্যকে দেখি, তেমনই 'আমি'র সাহায্যে কি 'আমি'র সহিত পরিচয় হয় না? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে আর 'আমি'কে চিনিবার উপায় দেখি না, 'আমি,' 'আমি' করিয়াই চিরকাল ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

বচনে 'আমি' এক, তাহা অভ্রান্ত সত্য। কেবল এক নহে—একমেবা-দ্বিতীয়ং, কারণ আমার উপর কথা কহে, এমন সাধ্য কাহার? 'আমি' পুঁটীরাম, খুদীরাম, মুচিরাম হইলেও এ বিশ্ব সংসারের রাজরাজেশ্বর—আমার উপর কাহারও বচন চলে না; সুতরাং 'আমি' একবচন। এ সংসারে আমি একা বলিয়া এক বচন হইলেও গৃহে গৃহিণীর নিকট আমি দ্বিবচন; কেন না তিনি ব্যতিরেকে আমি 'শুধুই মদন!' কিন্তু আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, আরক্তিম হরিণ-লোচনে যখন গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া তিনি আমার প্রতি সরাগদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাঁহার সুমধুর বাক্য বিন্যাসের হারমণি ফ্লুটের পর্দ্দা যখন উদারা মুদারা গ্রাম ছাড়িয়া তারায় দাঁড়ায়, অথবা যখন তাঁহার বাঁশী অসিতে পরিণত হয়, তখন আমি একেবারে বচন শূন্য হইয়া পড়ি। স্থানান্তরে, প্রয়োজন পড়িলে তোমার কাছে একবচন, অন্যের কাছে অন্য বচন; এই প্রকারে দ্বিবচন এবং বহুবচনও হইয়া থাকি; সভা-সমিতিতে আমার কেবলই বচন সার। সুতরাং 'আমি' কোন্ বচন তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

বাকী এক্ষণে 'আমি'র ক্রিয়া। যখন 'আমি'র কর্তৃত্বই প্রতিপন্ন করিতে পারিলাম না, যখন সংসারের সহিত 'আমি'র সম্বন্ধ নির্ণয় হইল না, তখন ক্রিয়া নির্ণয় কি প্রকারে হয়? 'আমি'র অকার্য্য ত সংসারে দেখি না, সকল কর্ম্মই 'আমি' করিয়া থাকেন—বোধ হয় কর্ম্মভোগের জন্যই সংসারে আসা। পক্ষান্তরে, কোন কার্য্যেই 'আমি'র কর্তৃত্ব নাই, অথচ তাঁহাকে ফলভোগ করিতে হয়—এ রহস্য ভেদ করা আমার কর্ম্ম নয়।

আসামের ইতিবৃত্ত।

ভূমিকা।

অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকটেই আসামের বিবরণ এখন পর্য্যন্ত, অপরিজ্ঞাত। অন্যের কথা দূরে যাউক, আসাম সম্বন্ধে তৎপার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গদেশবাসীর জ্ঞানও অনেক স্থলেই নিতান্ত অস্ফুট। বঙ্গসন্তান অন্যবিধ প্রাচীন কুসংস্কার অনেক পরিমাণে বর্জ্জন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আসামের অন্যতম প্রধান জনপদ কামরূপ সম্বন্ধে, মোহ-মন্ত্র-সিদ্ধা মায়াবিণী ডাকিনী-গণের রঙ্গস্থল বলিয়া, তাঁহাদিগের চিরাগত অন্ধ সংস্কার অদ্যাপি অনেক ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে,—তাঁহাদিগের এখনও ধারণা, কামরূপে দিবাভাগেও সিংহ গর্জ্জিয়া থাকে এবং বিদেশী পুরুষ তথায় পদার্পণ মাত্রেই ভেড়া হইয়া যায়! যথায় বিংশতি বিভিন্ন জাতির বাস এবং অন্যূন ষট্‌ত্রিংশ ভাষার প্রচলন, সেই বিস্তৃত আসাম রাজ্যকে তাঁহারা একভাষী একই জাতির বসতিস্থল ভাবিয়া থাকেন। আমরা প্রাচীন ব্রিটেনবাসী কেলট্ জাতির কাহিনী অক্লেশে বর্ণন করিতে পারি এবং বলটিক্-সাগর-কূলে জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক উপদ্রবের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিয়া থাকি, কিন্তু স্বদেশের এই বিস্তৃত ভূভাগের ও তত্রত্য অধিবাসীবর্গের কোন সংবাদই অবগত নহি;—অসভ্য হটেণ্টটের ইতিবৃত্ত বা স্যাণ্ডুইচ্ দ্বীপপুঞ্জের অধীশ্বর কালাকাউয়ার আত্মকাহিনী জানিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া উঠি, কিন্তু স্বদেশস্থ ঐ সমস্ত জাতির তথ্য জানিতে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র কৌতূহল জন্মে না। জনসাধারণ নাগা, শিংপো, আবর বা খাসিয়ার নাম পর্য্যন্ত জানেন কি না সন্দেহ; আর যাঁহারা কখন শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও, বোধ হয়, ঐ সকলগুলিই একার্থবাচক শব্দ মাত্র। পরন্তু, পাঠার্থী প্রত্যেক হিন্দুবালকের নিকট 'উডন' বা 'থর' তাহার গৃহদেবতার ন্যায় সুপরিচিত, কিন্তু টেবুই বা সাল্‌জঙের নাম নিতান্তই অপরূপ পদার্থ।

যাহাই হউক, বিশাল ব্রহ্মপুত্রের পুণ্যসলিলবিধৌত, ভারতের উত্তর-পূর্ব

প্রান্তস্থ এই প্রদেশ, বাস্তবিক, বিশেষ আলোচনার বিষয়। ইহার একদিকে গগনভেদী সুবিশাল শৈলমালা,অতলস্পর্শ উপত্যকাভূমি,কলনাদী নির্ঝরশ্রেণী, এবং মহামূল্য পাদপরাজিপরিবৃত ও বিবিধ বনজন্তুবিচরিত বিজন বনস্থলী প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে; অন্যত্র, স্বচ্ছসলিলা কূল-প্লাবিনী স্রোতস্বিনী এবং অক্ষয় খনিজ পদার্থ পরিপূর্ণ ও শস্যশ্যামল উর্ব্বর ভূমিসমন্বিত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রকৃতির সুষমা বিস্তার করিতেছে। প্রকৃতির এই বিচিত্রতাময় বিনোদক্ষেত্র বহুকাল হইতে বিভিন্নভাষী ও বিভিন্ন আচারপরায়ণ নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল। ইহার মধ্যে উষ্ণপ্রধান নিম্নভূমি সকলে কৃষিপরায়ণ এক শ্রেণীর বাস; তাহাদিগের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য-ভব্য। অতিরিক্ত অহি-ফেন সেবনে, এবং বিগত শতাব্দীর গৃহ-বিগ্রহ-জনিত প্রবল পেষণে, তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষা অনেকাংশে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ব্রিটীশ-শাসন-প্রবর্ত্তিত বাণিজ্য-প্রথা-বলে তাহাদিগের জড়তা ও উদ্যমহীনতা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতেছে এবং শ্রমকুশল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে তাহারা ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতেছে। পক্ষান্তরে, দক্ষিণস্থ অধিত্যকাভূমির শক্তিসঞ্চারী নাতি শীত নাতি উষ্ণ প্রকৃতির ছায়ায় এক দল শ্রমসহিষ্ণু সমরপ্রিয় জাতি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে; ইহারা গোচারণ ও পশুপালন নিরত এবং প্রজাপরতন্ত্র স্বায়ত্ব শাসনে নিয়ন্ত্রিত। অন্যত্র, উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তর্ব্বর্ত্তী পর্ব্বতমালার চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমাবৃত প্রস্তরভূমে, মৃগয়াজীবন কতিপয় জাতির বসতি; ইহারা নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল ও জিঘাংসা-পরায়ণ এবং প্রতিনিয়ত কলহ-বিগ্রহ দ্বারা পরস্পরের শোণিত-পিপাসা নিবারণে ব্যাপৃত।—আসামের এইরূপ বিভিন্ন জাতির মধ্যে আমরা মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। এস্থলে, ভূগর্ভস্থ মৃৎপঞ্জর অবলম্বন না করিয়া, সজীব মনুষ্য-সমাজ কর্ত্তৃক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাদিগের পরস্পর বিভিন্নমুখী অবস্থাপরম্পরা—ইতিবৃত্ত-লেখক এবং শাসনাধিনায়ক—উভয়েরই সমভাবে আলোচনার বিষয়।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আসামরাজ্য আবহমান কাল হিন্দুরাজার অধীন ছিল। ভারতের অন্যত্র প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন জনপদ সকলও একে একে মুসলমান শাসনের করতলস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আসামের নৃপতিকুল ইস্লামধর্ম্মী অরাতিবর্গকে ঘোর নির্যাতন পূর্ব্বক দেশ হইতে বহিষ্কৃত

করিয়া দিয়াছিলেন। তুর্ব্বক নামা জনৈক মুসলমান সেনানায়ক এবং তদীয় সহযোগী নবাব মুশলালখাঁর শির বিজয়ী আহম নৃপতির রাজধানী গড়গাঁওয়ে নীত, এবং অদূরবর্ত্তী কোন শৈলোপরি বিজয়কেতন স্বরূপ নরকঙ্কালমালায় মধ্যে গ্রথিত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট ও পলায়নাক্ষম যে সমস্ত মুসলমান সেনা আহম হস্তে বন্দী হয়, তাহাদিগকে অতঃপর ঘোর ঘৃণিত ব্যবসায় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। মড়িয়া নামক ইহাদিগের এক সম্প্রদায় কাল সহকারে সম্পূর্ণ স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া তাহাদিগের চিরন্তন ত্বকচ্ছেদ-প্রথা উঠাইয়া দেয়, মৃতের অগ্নিসংস্কার করে,* অধিক কি— বরাহ মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে থাকে। আসামের এই সমস্ত মুসলমান এতই ঘৃণার্হ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও, "অসমীয়া মুসলমান" বলিলে নিতান্ত গ্লানিসূচক বোধ হইত।¶ উপরিতন আসামবাসী মুসলমানগণের অদ্যাবধি, হিন্দুদিগের ন্যায়, গোঁসাই (গোস্বামী) দীক্ষাগুরু আছেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেই আপনাপন গোঁসাইয়ের শরণাগত হইয়া থাকে। ও দিগে আহমরাজ্যের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মদেশাগত বিজয়ী শান্ ভূপতিগণ বিজিতের ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত আসাম রাজ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই প্রবল প্রতাপ, এবং বর্ষে বর্ষে কত অনার্য্য গো-খাদক ম্লেচ্ছও ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে—আহম কর্তৃক আসাম-বিজয়ের পূর্ব্বে—এতাদৃশ শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর প্রদেশের প্রত্যয়যোগ্য কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। বিভিন্নভাষী ও বিভিন্ন প্রকৃতিস্থ অগণন অসভ্য জাতির মধ্যে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে আমরা বৃথাই প্রয়াস পাইয়া থাকি। প্রকাণ্ড প্রাচীন দুর্গ সকলের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে আমরা বিমোহিত হই, কিন্তু কোন্ সময়ে বা কোন্ কারুকর্ম্মার স্থাপত্যকৌশলে তাহা গঠিত হইয়াছিল তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। যে বিশ্বকর্ম্মার রচনা-কৌশলে শ্রীক্ষেত্র, বারাণসী, এলোরা ও তত্তুল্য বিশ্ববিমোহন অন্যান্য দেব-মন্দির গঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অপরূপ অট্টা-

* Robinson's Assam, page 264. Census Report of Assam, 1881, page 101.

¶ Dr. M'Cosh's Topography of Assam, 1837, page 24. Robinson's Assam, page 264.

লিকা সমূহও সেই মহাপুরুষের রচিত বলিয়া আসামবাসীর ধারণা; দুঃখের বিষয়, অতীতের সাক্ষ্যসূচক ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত প্রস্তর বা ইষ্টকরাশি ভিন্ন অধুনা তাহার অন্য কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। কালের আবর্ত্তনে কত নৃপতিকুলের ও সদ্বংশসম্ভূত মহানুভবের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতিষ্ঠিত কত সুবিস্তীর্ণ সরোবর বিজন অরণ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া যেন তাঁহাদিগের চির সমাধির পরিচয় দিতেছে।—ঐতিহাসিক তত্ত্বপিপাসুর পক্ষে আসামের বাহ্য লক্ষণ এইরূপ তমসাচ্ছন্ন ও নিরাশা-প্রদ। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রাচীন আসামের তথ্য নিরূপণের আশা আমরা একেবারেই পরিত্যাগ করিব?—এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানবের চিন্তাশক্তি, নগ্ন চক্ষুর সম্মুখীন ইহজগৎ পরিহার করিয়া, আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণাতীত প্রদেশে—সুদূর গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষে কক্ষে—পরিভ্রমণ করিতেছে,আর এই ভগদত্ত ও শিশুপাল এবং নীলাম্বর ও ধর্ম্মপালের রাজ্য সম্বন্ধে কিছুই স্থির হইল না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? তাহা হইলে প্রাচীন মিশরের চিত্রানুলেখন বিদ্যা এবং আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের (Cuneiform) প্রস্তরাঙ্কন পদ্ধতি চিরদিন মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর থাকিত। প্রত্যুত, আসামেতিহাসের প্রকৃত তত্ত্বলিপ্সু চিন্তাশীল পাঠক ঘোর অন্ধকার মধ্যেও, মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার বিদ্যুচ্চমকবৎ, ক্ষীণালোক দেখিতে পাইবেন, এবং তদ্দ্বারা আপন লক্ষ্যপথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে পারিবেন। প্রত্যয়-জনক বিবরণ অভাবে, ঐরূপ ক্ষীণালোক সাহায্যেই আমরা পরবর্ত্তী প্রস্তাব সমূহে প্রাচীন আসামের অস্পষ্ট ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম রেখা যথাসাধ্য অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিব।

চিত্রপট দর্শনে।

[বর্দ্ধমানে কোন সম্রান্ত লোকের গৃহে একখানি চিত্রপট দেখিয়াছিলাম—এক কারাগৃহের পর্য্যঙ্কোপরি একটী সুন্দরী রমণী অর্দ্ধ-শয়ানাবস্থায় অবস্থিত,—দূরে গৃহ-দ্বার উন্মোচন করিয়া একজন মোগল-বেশী পুরুষ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া রমণীর দিকে অগ্রসর হইতেছে, রমণী তাহার প্রতি ভ্রূভঙ্গি সহ-

কারে তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একখানি তীক্ষ্ণ তরবারী লইয়া আপন হৃদয়ে বিদ্ধ করিতেছেন।—এই কবিতাটী সেই চিত্র অবলম্বনে লিখিত হইল।]

১

কে তুমি রমণী-মণি এ ভাবে বসিয়া,
ছিন্ন-ভিন্ন কেশ-পাশ,
স্খলিত অঙ্গের বাস,
পাগলিনী প্রায় কেন র'য়েছ চাহিয়া ?

২

সুধার-আধার ওই রক্তিম-অধরে
কেন সে মধুর-হাসি,
না বর্ষে অমৃত-রাশি,
থাকে কি চন্দ্রিকা কভু ছাড়ি সুধাকরে ?

৩

কেন কেন ওই দীপ্ত-দিনমণি মত
বদনে কিরণ ঝরে,
যেন সৃষ্টি নাশ তরে,
কেন বা নয়নে বহ্নি হ'তেছে নির্গত ?

৪

সতেজে গর্ব্বের-ভরে গ্রীবা বাঁকাইয়া,
সু-তীক্ষ্ণ কৃপাণ ধরি,
দৃঢ়-মুষ্টি বদ্ধ করি,
কি হেতু হানিতে হৃদে লয়েছ তুলিয়া ?

৫

তুমি কি গো অভাগিনি ভারত-রমণী ?
দারুণ বিরহানলে,
ও হৃদয় সদা জ্বলে,
হারায়েছ তুমি কি গো পতি-গুণ-মণি ?

৬

বৈধব্য-যাতনা মরি অসহ্য যাতনা—
আর না সহিতে পারি,
হ'তে পতি-সহচরী,
জীবন-আহুতি দিতে করেছ কামনা ?

৭

কিম্বা কি প'ড়েছ কোন দুরাচার-করে ;
তাই এ কৃপাণ লয়ে,
সতীত্ব-বিনাশ ভয়ে,
আত্ম-নাশে ফেল তারে নিরাশ-সাগরে ?

৮

ধন্য তুমি ধরামাঝে রমণীর সার !
ধন্য এ ভারত-ভূমি,
যথা আবির্ভূতা তুমি,
ভারত-রমণী বিনা এত তেজ কার ?

৯

কেরে তুই দুরাচার পাপ-পরায়ণ ?
প্রসারিয়া দুই বাহু,
যাস্ রে দুর্ব্বৃত্ত-রাহু,
গ্রাসিতে এ বিশ্ব-জন-মস্তক-রতন !

১০

থাক্ থাক্ পাপমতি রয়েছিস্ যথা !
তোর ও কঠিন-করে,
স্পর্শিলে এ কলেবরে,
এখনি শুখাবে এই স্বর্ণ-ময়ী লতা !

১১

দূরে যা—দূরে যা পাপি না পশিবি ঘরে।
তোর পাপ বায়ু বায়,
অগ্নি-তাপে পুষ্প-প্রায়,
এ চারু-প্রতিমা ম্লান হবে চির তরে !

১২

জানিস্ না কভু কিরে বিমূঢ় অজ্ঞান!
ভারত রমণী গণে,
সতীত্ব পরম-ধনে,
এ ছার জীবন হ'তে করে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান!

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

"সর্ব্বত্যাগ ধর্ম্ম, নাথ, করিলে প্রচার।"

সকলের বিরাম আছে, বিশ্রাম আছে,—নাই কেবল এক জনের। যে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে কাল অবিরাম প্রবাহে ছুটিয়াছে, ছুটিতেছে। কাহার দিকে, কিসের জন্য?—সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই জান। আর এই বিশ্ব?—কালের পশ্চাতে সেও ছুটিতেছে; সেও বুঝি বিরামহীন, বিশ্রামহীন! দুই জনে শিশুর মত উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। শত বাধা, শত বিঘ্ন, উহাদের পদতলে ভাঙ্গিয়া গেল—চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে বিলীন হইল, তথাপি বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। গ্রহদল কক্ষভ্রষ্ট হইল; ধূমকেতু, ভীষণ অগ্নিমুখী উল্কারাশি, পবনপথে ছুটিতে লাগিল; দিগন্তভেদী ভীম রবে বজ্র গর্জ্জিল; অনন্ত আকাশে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হইল; ভীম কল্লোলে অম্বুরাশি বিমান-স্পর্শ করিতে উথলিয়া উঠিল; প্রলয়ের পূর্ণ রঙ্গ প্রকট হইল;—আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, হে ঈশ্বর!—সকলেই পরাস্ত, পরাজিত, পরাভূত! কাল ছুটিয়া চলিল; বিশ্বও ছুটিয়া চলিল;—কুরুক্ষেত্র মহাহব, ভারতের অমর স্মৃতি, অতীতের বক্ষে অঙ্কিত হইল।

বিদেশী পাঠক, ভারতযুদ্ধের যদি সবিশেষ জানিতে চাও, তোমাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অমৃত কাব্য মহাভারত পড়িতে বলিব। আর, স্বদেশী,—বিদেশীর মত অজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে যদি লজ্জিত না হও, তবে তোমাকেও ঐ অনুরোধ।

মন্থর পবনে পাণ্ডবের বিজয়কেতু হস্তিনার প্রাসাদ-চূড়ায় মৃদু মৃদু সঞ্চ-রিত হইতেছে। স্বর্গীয় প্রভাব বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মনস্বিনী গান্ধারী হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া সেই অন্ধযুগলের শোক তিমির বিদূরিত করিয়াছে। প্রশান্ত পৌরব দম্পতী শতপুত্রহা পাণ্ডুতনয়গণকে স্নেহ ক্রোড় প্রদান করিয়া গঙ্গা-দ্বারবনে তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন। শান্তির কোমল ছায়া দিন দিন জনস্থান পূর্ণ করিলেও, পতিপুত্রহীনা ললনাগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তরব, বাতায়ন-পথ-নিঃসৃত হইয়া এখনও পথিকের হৃদয় চমকিত করিতেছে। এখনও নিশা-সমাগমে, কোথাও অলিন্দ বেষ্টিত ছাদে প্রকোষ্ঠমুক্ত কোন রমণী, আলুলায়িত কেশে, স্খলিত বেশে, মুক্ত আকাশের দিকে নয়ন মেলিয়া, হা প্রাণেশ্বর, হা প্রিয়তম, ইত্যাদি গভীর মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, উষ্ণনেত্রাসার-সলিলে স্বর্গস্থ নাথের পাদোদক প্রদান করিতেছে। কোথাও বা কোন জননী প্রিয়পুত্রের নিধনে, হা নয়নানন্দ, হৃদয়ের চন্দন, কোথায় আছ বলিয়া, মুহু-র্মুহুঃ কাতর হইতেছে। সমীরণ হস্তিনার আকাশে এখনও শোকধ্বনি প্রবাহিত করিতেছে।

রাজা যুধিষ্ঠির, রাজকার্য্যে নিযুক্ত; কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্ফূর্ত্তি নাই, প্রীতি নাই। মর্ত্ত্য জীবের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া, যুধিষ্ঠির মর্ত্ত্য ভূমির মমতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; রাজ্য সম্পদ তাঁহার নিতান্ত অপ্রিয় হইয়াছে। আর্য্য ধৃতরাষ্ট্র, জননী গান্ধারী ও জননী কুন্তীদেবীর চরণ দর্শনের জন্য তিনি গঙ্গাদ্বারবনে উপনীত হইলেন। আশা মিটিল; পাবকরূপী সেই পবিত্র শরীরীত্রয়ের দর্শনে, স্পর্শনে ও সহবাসে তাঁহার প্রাণ স্নিগ্ধ হইল, শীতল হইল। একদিন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, তাত, হস্তিনায় যাইতে আর আমার অভিলাষ হয় না; যদি অনুমতি করেন, অবশিষ্ট জীবন এই আশ্রমে থাকিয়া অতিবাহিত করি। উত্তরে প্রজাগণের অকল্যাণ ঘটিবে শুনিয়া, ও ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে, তিনি হস্তিনায় পুনরাগত হইলেন। পুরু-ষোত্তম কৃষ্ণ ও মহামতি ভীষ্মমুখনিঃসৃত অমৃতময় বাক্য সকল তাঁহার মানসে নিয়ত প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি দিনযামিনী নিত্য পথের সহায় ধর্ম্মের গভীর আলোচনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা ব্রহ্মধ্যানে ব্রহ্মোপাসনায় ত্রিসন্ধ্যা পুলকিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে একদিন ঋষিবর নারদের মুখে শুনিলেন যে, গঙ্গাদ্বার-বনবাসী কুরুবৃদ্ধগণের জীবনান্ত হইয়াছে। তাঁহার জননী আকুল কুন্তলা কুন্তীদেবী

অনশনে, অশয়নে, কোথা তাত যুধিষ্ঠির—কোথা ভীম, কোথা রে বিজয়,—কোথা নকুল, কোথা বাপ সহদেব বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, শত বীর প্রসবিনী গান্ধারী ও শতবীর জনক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত ঘোর দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির মায়াসঙ্কুল সংসারসাগরের পরপারে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম দেশে মমতার যে লেশমাত্রও ছিল, আজ আসক্তির সেই শেষ বিন্দু তীব্র বৈরাগ্যানলে পুড়িয়া ভস্ম হইল,—জন্মের মত অদৃশ্য হইল। সেই পুণ্যশ্লোক পুরুষসিংহ ইহপরকালের আশ্রয়, সর্ব্বলোক স্বামী শাশ্বত বিভুর পদকমল চিন্তা করিতে লাগিলেন। পার্থিব কার্য্যভার হইতে সত্বরে অবসৃত হইয়া, নিত্যাশ্রয়, নিত্যানন্দের উদ্দেশে যাত্রা করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুরসম ভ্রাতৃচতুষ্টয় জীবনের সঙ্গিনী লক্ষ্মীরূপিনী দেবী দ্রৌপদী, কাহারও সহবাসে আর তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটে না। আত্মা-পাখী বিপুল বলশালী হইয়াছে; ব্রহ্মসকাশে যাইতে চাহে। জড়ের কি শক্তি যে সে তাহাকে ধরিয়া রাখিবে?

অশ্বমেধের পর, কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া দ্বারকায় যাইবার কালে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "নরেন্দ্র! আমি চলিলাম। আমি যোগনেত্রে দেখিয়াছি, লোকান্তর বাসের সময় নিকটা-গত, আমাদিগের পৃথিবীর কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। তোমরা যোগযুক্ত হও; অমৃত নিকেতনে যেন তোমাদের প্রিয়ানন দেখিয়া আমার আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়।" কৃষ্ণের সেই শেষবাক্য, যুধিষ্ঠিরের আত্মাকে মহাদেবের ঐশ্বর্য্য যোগানন্দরসপানে সুখী করিয়াছে। দিব্যজ্যোতিতে তাঁহার দেহ অতুল শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির এক্ষণে বীতরাগ, বীতশোক, বীতজ্বর; শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত, পবিত্র। অরুণোদয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া রাজর্ষি যোগাসনে আসীন। স্তিমিতলোচন; গভীর অতলস্পর্শ ধ্যানসাগরে আত্মা ডুবিয়াছে। কি ধনের তরে? যোগী, তুমি জান; ভোগী কি জানিবে? আজ তাঁহার প্রাণসখা কৃষ্ণের জলদ কান্তি সেই অনন্ত পুরুষে মিলিত হইতে দেখিলেন; বিস্মিত হইলেন না। যুধিষ্ঠির অনন্তের সহিত কৃষ্ণের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী জানিতেন। কৃষ্ণ যে সামান্য মনুষ্য নহেন, তাহা যুধিষ্ঠিরের প্রত্যেক অনুষ্ঠান লোকমণ্ডলে প্রচার করিয়াছে। পৃথিবীতে আসিয়া যাঁহার অলৌকিক, অমানুষিক শক্তি পাপের দলন, পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিল, যাঁহার প্রেমের উৎস উৎসারিত হইয়া নরনারীর

শুষ্ক হৃদয়ে প্রেম বিলাইল—সমগ্র ধরাকে সুখী করিল, তিনি যে সামান্ত মনুষ্য, ইহা কি সম্ভব? কল্পনা, ক্ষমা কর; এ প্রত্যয়ে বিরত হও। অভিমান, অসত্য, প্রত্যবায়ে নিক্ষেপ করিও না।

ধ্যানান্তে যুধিষ্ঠির প্রিয়ানুজ অর্জ্জুনের মুখে কৃষ্ণের বনগমন ও বৃষ্ণিকুলের বিনাশ বৃত্তান্ত শুনিলেন। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন "কাল এই সৌর-জগতকে প্রকাশিত করিয়াছে; কালই ইহাকে হরণ করিবে। অর্জ্জুন, আমি জনস্থান পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া দেবী দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় তাঁহার অনুগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা রাজাসন, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার সকল তুচ্ছ করিলেন। যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী সেই পঞ্চ-পাণ্ডব ও যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী, যেখানে "নাহি বৈর হিংসা আর, নাহি দম্ভ অহঙ্কার" সেই অক্ষয় আনন্দধামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সংসার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ভূতলে যাহার অঙ্গ প্রকৃতির অতুল শোভা প্রকাশিত করিয়াছে, যুগে যুগে যাহার কন্দর যোগী, ঋষি, তপস্বীকে আলয় দান করিয়াছে, তাঁহারা সেই শৈলরাজ হিমালয়ের শিখরে উপনীত হইয়া সমাহিত হইলেন। প্রিয়তমা দয়িতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়, ধর্ম্মের সেই দুর্গম পথে বিচরণ করিতে করিতে যোগভ্রষ্ট হইলেন; তাঁহাদের জীবনবিন্দুচয় দেব-লোকে প্রস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প। তিনি বীরমদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর শত শত পরীক্ষা তাঁহার সম্মুখীন হইল। যোগবলে বলীয়ান যুধিষ্ঠির সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই পুণ্যশ্লোক নরপতির পবিত্র আত্মা স্বর্গরাজ অতি সমাদরে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। যুধিষ্ঠির, জীবনের সাধ, হরিচরণে মিলিত হইলেন; তাঁহার প্রাণের আশা পূর্ণ হইল। পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে স্বর্গরাজ্যে উৎসব হইল। দিগন্ত মেঘ রাগে গাইল—

"সর্ব্বত্যাগ-ধর্ম্ম, নাথ, করিলে প্রচার।"

দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

একাদশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-জগতে কবি জগৎরাম রায়ের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিতেন কি না, সন্দেহ। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত কাব্যের কথা অনেকেই অবগত নহেন। * ১২৩০ সালের বন্যায় কবির বাস্তুভূমি, ভুলুইগ্রাম, দামোদরের অতল গর্ভে বিলীন হয়, সঙ্গে সঙ্গে কবির ও তদ্রচিত কাব্যের নামও বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। শুভক্ষণে স্বর্গীয় শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় সরকারি কার্য্যোপলক্ষে বাঁকুড়ার বিজন প্রান্তরে গমন করিয়াছিলেন, তাই জগৎরামের নাম জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। ১২৯১ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে তদানীন্তন প্রকাশিত 'পাক্ষিক সমালোচক' নামক সাময়িক পত্রে উক্ত শিবদাস বাবু কর্ত্তৃক ৺ জগৎরাম রায় ও তদ্রচিত কাব্যের বিষয় প্রথমে বর্ণিত হয়; পরে তিনি কবির রচিত অদ্ভুত রামায়ণের 'ভরত-সংবাদ' নামক অংশ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। এই 'ভরত-সংবাদ'ও খণ্ডশঃ উল্লিখিত 'পাক্ষিক সমালোচক' নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশ কালে উক্ত পত্রের সম্পাদক-সমিতি বড়ই দুঃখ সহকারে বলিয়াছিলেন, "যদি বঙ্গভাষার উচ্চশ্রেণীর এই প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের ধ্বংস হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিব, বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক বিদূরিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব।"—কার্য্যতঃ সেই কলঙ্ককালিমাই বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে আজি পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। কবি জগৎরামের সমগ্র কাব্য সাহিত্য জগতে সম্মান লাভ করা দূরে থাকুক, শিবদাস বাবু প্রকাশিত 'ভরত-সংবাদ'টুকুর সংবাদও 'শিক্ষিত' বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্প লোকেই রাখিয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে, সম্প্রতি, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের এই প্রাচীন কবির কীর্ত্তি

---

* বিগত বৈশাখ মাসের "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়" শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, "রামমোহনের রামায়ণ" উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং বীরভুম ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে গীত রামরসায়ন ব্যতীত বঙ্গদেশে "আরও একখানি রামায়ণ আছে।" এতদ্বারা বোধ হয়, জগৎরাম রচিত রামায়ণের বিষয় তিনিও অবগত নহেন।

বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিঘোষিত করিতেছেন *; আজি, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া, আমরাও সেই কবিকাহিনীর আলোচনা করিতে বসিয়াছি।

প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অতএব জগৎরাম কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ' তাঁহাদিগের দ্বারা অচিরে সংগৃহীত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। সম্প্রতি, তাঁহারা কৃত্তিবাসের অকৃত্রিম মূলগ্রন্থ সমুদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত; এ চেষ্টা নিতান্ত শ্লাঘনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, বর্ত্তমান পদার্থের সংস্কারের পূর্ব্বে লুপ্ত পদার্থের উদ্ধার-চেষ্টা অধিকতর সমীচীন বোধ হয়;—যে ভাবেই হউক, বটতলা ও গুপ্ত-প্রেসের কৃপায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ কবিতারসলিপ্সু পাঠকের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি-সাধন করিতেছে, কিন্তু জগৎরামের কল্পনাপ্রসূত কবিতাপ্রসূন বাঁকুড়ার কঙ্করপ্রান্তরে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে; এরূপ অবস্থায় কৃত্তিবাসের কাব্য-সংস্কার অপেক্ষা জগৎরামের কাব্যোদ্ধার অধিকতর মনোযোগ সাপেক্ষ বোধ হয়। যাহাই হউক, 'সাহিত্য-পরিষদে'র হস্তে জগৎরামের রামায়ণ উদ্ধারের ভারার্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। 'সাহিত্য-সেবকে'র শক্তি অতি ক্ষুদ্র; এই ক্ষুদ্রশক্তির সাহায্যে আমরা উপস্থিত কবির 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' প্রকাশে চেষ্টিত হইয়াছি। ভগবানের কৃপা এবং সহৃদয় পাঠকবর্গের সহানুভূতি থাকিলে আমাদিগের চেষ্টা সফল হইবে, এরূপ সম্পূর্ণ আশা করা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' সম্বন্ধেই দুই চারি কথার উল্লেখ করা যাইবে।

স্বর্গীয় শিবদাস বাবু স্বীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন, অনেক অনুসন্ধানেও তিনি কবির বংশধর কাহাকেও প্রাপ্ত হয়েন নাই; জনৈক "কৃষ্ণবর্ণ কৃষকাকৃতি মধ্যবয়স্ক" ব্রাহ্মণ জগৎরামের প্রপৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু কতিপয় প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়ায় সেই ব্যক্তিকে প্রতারক বলিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। পক্ষান্তরে, বলরাম বাবু ভুলুই গ্রামে গিয়া, কবির "অধস্তন পঞ্চম পুরুষ," শ্রীযুক্ত রামনয়ান রায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহস্থিত মূল 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র মধ্যে, রায় মহাশয়ের নির্দ্দেশমত, কবির ও তদীয় সুযোগ্য পুত্রের হস্তাক্ষর পৃথগ্ভাবে দর্শন করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বাবু স্বচক্ষে যাহা

* দাসী, ৪র্থ ভাগ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

দেখিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, কবির স্বহস্তলিখিত সেই মূলগ্রন্থ দেখিবার সুযোগ আমাদিগের কখন ঘটে নাই। তবে, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অনেকের গৃহেই এই গ্রন্থের পুঁথি আছে এবং অদ্যাবধি শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে তাহার পূজা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর কোন পুঁথি অবলম্বন করিয়া আমরা 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাবড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নায়েক মহাশয় বক্ষ্যমান পুঁথির স্বত্বাধিকারী; 'সাহিত্য-সেবকে' প্রকাশের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সেই পুঁথি আমাদিগের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। "সাত নকলে আসল নষ্ট"—পূর্ব্বাপর প্রচলিত এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা আমরা এস্থলেও স্পষ্ট দেখিতে পাই; বলরাম বাবু এবং স্বর্গীয় শিবদাস বাবু তাঁহাদিগের প্রবন্ধ মধ্যে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমাদিগের সংগৃহীত পুঁথির সঙ্গে তাহার কোন কোন স্থলের পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম বাবুর উদ্ধৃত অংশগুলি কবির স্বহস্তলিখিত মূল পুঁথির অনুযায়ী ধরিলে, আমাদিগের হস্তগত পুঁথি ভ্রমপূর্ণ বলিতে হইবে; কিন্তু ভাব ও ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদিগের পুঁথির পাঠই, অনেকস্থলে, পরিশুদ্ধ বোধ হয়; যাহা হউক, কাব্য-প্রকাশের সঙ্গে তত্তৎ স্থলের পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র বিষয় কি, অনেকেই, বোধ হয়, অবগত নহেন; * অতএব গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ হয়। গ্রন্থারম্ভে কবি স্বয়ং ইহার সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন—

"ষষ্ঠী কল্প ষষ্ঠী দিনে, প্রথম দিবস গানে,
সপ্তমী বিধান দ্বিতীয়তে।
অষ্টমী তৃতীয় দিবা, তার গান সীমা যেবা
গাইবে পরম আমোদেতে॥
নবমী চতুর্থ দিনে দিবা নিশি জাগরণে,
বিজয়া দশমী পঞ্চরাত্র।
পঞ্চদিনে সঙ্গে গান, তেঁই হ'ল অভিধান,
দুর্গাপঞ্চরাত্র সুপবিত্র॥"

* 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র কার্য্য-সম্পাদক মহাশয়, বস্তুতঃই সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন,—"আপনার দুর্গাপঞ্চরাত্রি কিরূপ গ্রন্থ তাহা অবগত নহি।" এই 'আপনার' কথায় তাঁহার এতৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর বোধ করি, আর বুঝাইতে হইবে না যে, ষষ্ঠ্যাদি কল্প হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত দুর্গোৎসবের পঞ্চদিনের ধারাবাহিক বিবরণই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। এস্থলে, এই দুর্গোৎসব বাসন্ত কিম্বা শারদীয়— সন্দেহ জন্মিতে পারে; কবি পরক্ষণে তাহারও সদুত্তর দিয়াছেন—

"দেবীপূজা মহীতলে আছিল বসন্ত কালে;
আশ্বিনে পূজন যে বিধানে, *
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র পূজা কৈলা পদদ্বন্দ্ব,
সে বিধান শুন সর্ব্বজনে।"

রাবণ নিধন হেতু শ্রীরামচন্দ্রের এই দুর্গোৎসবের ব্যাপার বাল্মীকি-বিরচিত মূল রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। কবি কৃত্তিবাস তদ্রচিত রামায়ণ কাব্যে, সম্ভবতঃ কালিকা পুরাণের উপর নির্ভর করিয়া, এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। অতএব 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র কল্পনায় জগৎরামকে কৃত্তিবাসের অনুসরণকারী বলিতে হইবে। অনুসরণকারী হইলেও, কৃত্তিবাসের কল্পনায় যে অস্বাভাবিকতা দোষ লক্ষিত হয়, জগৎরাম যত্ন পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বলরাম বাবু তদীয় প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাণভট্ট ও তৎপুত্র বিরচিত কাদম্বরীর ন্যায় পিতা-পুত্রের সম্মিলিত রচনায় এই কাব্য পরিসমাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠ সহোদর জীতরায়ের অনুজ্ঞাক্রমে কবি জগৎরাম এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন—

"জ্যেষ্ঠ জীতরায় মতে, পঞ্চরাত্রি দুর্গাপ্রীতে,
রচয়ে প্রার্থয়ে জগত্রাম।"

পরে ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অষ্টমীর গান সমাপন করিয়া নবমী ও দশমীর

---

* আশ্বিনে দেবীপূজার বিধান শ্রীরামচন্দ্র কৃত দুর্গোৎসবের বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে——

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যাচ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্তো ধন ধান্যসমন্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥"
—চণ্ডী। বাদশ মাহাত্ম্যে ১২শ ও ১৩শ শ্লোক।

'পালা' রচনা করিতে স্বীয় পুত্র রামপ্রসাদকে অনুমতি দেন। নবমীর পালা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ এই ঘটনার পরিচয় দিয়াছেন—

"ষষ্ঠী আর সপ্তমী অষ্টমী সে অপূর্ব্ব।
নবমী দশমী এই পঞ্চদিন পর্ব্ব॥
পঞ্চদিন গান মধ্যে শুন বিবরণ।
তিন দিবসের গান করিলা রচন॥
ষষ্ঠী আর সপ্তমী অষ্টমী সুশোভন।
এ তিন দিনের গান করিলা বর্ণন॥
নবমী দশমী দুই দিবসের গান।
রচনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান॥"

জগৎরাম স্বয়ং প্রারব্ধ গ্রন্থের উপসংহার না করিয়া পুত্র রামপ্রসাদের উপর শেষ দুই পালার রচনা-ভার কেন সমর্পণ করিয়াছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে তাহার কোন হেতু নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে, পিতার সমকক্ষ না হইলেও, রামপ্রসাদ যে কাব্য-রচনায় যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন, বক্ষ্যমান কাব্যের শেষোক্ত দুই সর্গেই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অধুনা, অনেক কালী-নামাত্মক সঙ্গীতে দ্বিজ রামপ্রসাদের ভণিতি দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তাহা ভক্তপ্রধান কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচিত কি না তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ আছে; জগৎরামের পুত্র রামপ্রসাদ রায় ঐ সমস্ত সঙ্গীতের রচয়িতা কি না, কে বলিতে পারে? যাহা হউক, উপস্থিত, সে প্রশ্নের বিচার নিষ্প্রয়োজন।

'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার নির্ণয় পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখা যায়। কাব্যের উপসংহার ভাগে স্পষ্টই লেখা আছে—

"ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুভদিনে॥
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ গুরুবারে।
কৃত্তিকা তারকা যোগ সৌভাগ্য সুন্দরে॥
কাব্য দুর্গাপঞ্চরাত্রি গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল।
সভাজনে শান্ত মনে হরি হরি বল॥"

এস্থলে প্রথম গোলযোগ 'রন্ধ্র' লইয়া। স্বর্গীয় শিবদাস বাবু এই রন্ধ্র অর্থে শূন্য (০) ধরিয়া ১৬০২ শকে এই কাব্যের রচনা-কাল স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরাম বাবু কবির 'অদ্ভুত রামায়ণে'র রচনা-কাল নিরূপণার্থ পুঁথির শেষ পৃষ্ঠা উন্মোচন পূর্ব্বক দেখিতে পান—

"সপ্তদশ শতাব্দ বরষ যুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
* * *
দ্বিজ জগত্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।
রাম ধ্বনি কর, পাপ-তাপ হ'ক শীর্ণ॥"

ইহাতে বুঝা যায়, ১৭১২ শকাব্দে * 'অদ্ভুত রামায়ণ' কাব্য সমাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা এই দুই গ্রন্থের রচনা-কাল মধ্যে ১১০ বৎসরের ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব—পুত্রের রচিত গ্রন্থের ১১০ বৎসর পরে পিতা অপর গ্রন্থ রচনা করিলেন, এরূপ হইতেই পারে না। অতএব, শিবদাস বাবুর গণনা নিশ্চয়ই ভ্রমপূর্ণ। অতঃপর, 'রন্ধ্র' অর্থে দ্বার (ছিদ্র) ধরিলে, সর্ব্বজনবিদিত 'নবদ্বার' মতে 'রন্ধ্র' শব্দ দ্বারা ৯ বুঝাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা ১৬৯২ শকে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র সমাপ্তি কাল প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে ঐ দুই গ্রন্থের রচনা-কাল মধ্যে মাত্র বিংশতি বর্ষের ব্যবধান থাকে; ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু এ গণনাপক্ষেও এক অন্তরায় দেখা যায়। রামপ্রসাদ নবমী পালারম্ভে লিখিয়াছেন—

"পিতা জগত্রাম মোর রামপরায়ণ।
যেঁহ কাব্য করিলা অদ্ভুত রামায়ণ।
তাঁ'পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম।
দুর্গাপ্রীতে কাব্য কৈলা অতি অনুপাম॥"

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, 'অদ্ভুত রামায়ণ' পরিসমাপ্তির পরে জগৎরাম 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু উপরিলিখিত গণনামতে দেখা গিয়াছে, 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' সমাপনের বিংশতি বৎসর পরে 'অদ্ভুত রামায়ণ' সম্পূর্ণ হয়। এখন কোন্ কথা সত্য, নির্ণয় করা দুরূহ। বলরাম বাবুর অধীনে কবির উভয় গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তিনি গ্রন্থদ্বয়ের রচনা-কাল ঘটিত এই পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধানে বাক্যমাত্র ব্যয় করেন নাই কেন, বুঝা সুকঠিন। ভরসা করি, পরবর্ত্তী প্রস্তাবে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া তিনি আমাদিগের এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কৌতূহল দূরে করিবেন। উপস্থিত, ১৬৯২ শকেই 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র রচনা-কাল স্থির করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই।

জগৎরামের জীবনী সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন সংবাদই আজি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বলরাম বাবুর প্রবন্ধে দেখা যায়, তিনি কবির জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য স্বয়ং ভুলুইগ্রামে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রবন্ধ মধ্যে তৎসংগ্রহের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কবির জন্মভূমি ভুলুই গ্রাম সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয়—শিবদাস বাবু এবং বলরাম বাবু—উভয়ের প্রবন্ধেই পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কত কাল হইতে এবং কি সূত্রে ঐ গ্রামে এই কীর্ত্তিকুশল রায়বংশের বাস, তাহা জানিবার উপায় নাই। কবির

* 'শতাব্দী'র আধুনিক অর্থ ধরিলে ১৬১২ বুঝাও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

বংশাবলীর বিবরণও নিতান্ত দুর্লভ; বক্ষ্যমান কাব্যে তাঁহার জনক জননী এবং সহোদরবর্গের কেবল পরিচয় পাওয়া যায়—

"রঘুনাথ রায় তাত, শোভা মাতা গর্ভজাত,
এক মনঃপ্রাণ ছয় ভাই।
রায়জীত, জগন্নাথ, মাধব, রাধাকান্ত নাম,
রামকান্ত, রাম গোবিন্দাই॥"

আর ইতিপুর্ব্বেই তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদের পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন কবির বংশপরম্পরাগত অন্য কোন কাহিনী জানিতে পারা যায় না। জগৎরামেরা ছয় সহোদরে সৌভ্রাত্রসূত্রে পরস্পর বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন, উপরি-উদ্ধৃত কবিতাই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ; এবং কবি স্বয়ং জ্যেষ্ঠ সহোদর জীতরায়ের পরম আজ্ঞাবহ ছিলেন, এই কাব্য-রচনা-প্রসঙ্গে পুর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাতে তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, কালসহকারে, ঐ ছয় সহোদরের মধ্যে কে কোথা বাস করেন, এবং কবির বর্ত্তমান বংশধর,বলরাম বাবু কথিত,রামনয়ান রায় মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র—জানিতে পারা যায় নাই। উপরিলিখিত নামগুলিতে কবির বংশে রামরূপী বিষ্ণুপরায়ণতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু, মঙ্গলাচরণ পর্ব্বে, কবি-কথিত

"এ গোষ্ঠী তোমার দাস, দুর্গে দুঃখ কর নাশ,
সেবে যেন প্রতি বংশক্রমে।"

এই কবিতার্দ্ধ পাঠে তাঁহাদিগকে শক্তি-উপাসক বলিয়া সন্দেহ জন্মে। যাঁহার উপাসকই হউন, কবির চরিত্রে, অধুনাতন। শাক্ত বৈষ্ণবের ন্যায়, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের চিহ্ন আদৌ লক্ষিত হয় না; তাঁহার বিবেচনায়—

* * *

"নমস্য সকলে হন অসীম অনন্ত॥
সর্ব্ব চরাচর মুর্ত্তি এক নারায়ণ।
অতেব একত্রে বন্দি সভার চরণ॥

* * *

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী কোটী অগণন।
তাথে অধিষ্ঠান দেব-দেবী যত জন॥
তার কর্ত্তা হর্ত্তা যেঁহ এক নিরঞ্জন।
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়ে তাঁহার চরণ॥"

আমরাও সেই পরাৎপর পুর্ণব্রহ্মের পাদপদ্মে প্রণতি পুরঃসর 'সাহিত্য-সেবকে' কবির 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গীয় পাঠকের যেরূপ চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, বর্ত্তমান কাব্য তাঁহাদিগের তদ্রূপ প্রীতি সাধন করিলে আমাদিগের যত্ন সফল বোধ করিব, এবং কবির জীবনী যথাসাধ্য সংগ্রহ পুর্ব্বক সমগ্র কাব্য একাকারে প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রকৃত ধার্ম্মিক কে ?

(১)

পৃথিবীতে প্রকৃত ধার্ম্মিক পাওয়া কঠিন। যিনি সন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান ধারণায় তাঁহার জীবনের অধিক সময় যাপন করেন, অনেকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান দেখিয়া কাহাকেও ধার্ম্মিকের পদে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না। প্রথমতঃ পবিত্র মন লইয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইতে হয়। যাহার মন অপবিত্র, তাহার কি প্রকারে প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ মনকে একাগ্র করা আবশ্যক। নতুবা, উপাসনার সময়ে মন বিষয় চিন্তায় এরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে যে, ঈশ্বরের দিকে সে গমন করিতে পারে না। আমরা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে মন, বাক্য এবং কার্য্যে যে সকল পাপ করিয়াছি সেই সমুদয় ধ্বংস করিবার জন্য একটী প্রার্থনা আছে। অনেকে হয় ত বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, অদ্য যে প্রার্থনা করা গেল তাহার দ্বারা গত দিবসের পাপ বিনষ্ট হ'ল; এবং এইরূপে প্রতিদিন প্রার্থনা করিতে বিগত পাপ ধ্বংস হইতে লাগিল। সুতরাং, পাপের জন্য আর আমাদের কোন প্রকার চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা একটী বিষম ভ্রম। আমাদের উচিত যে, প্রতিদিন যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, রাত্রিতে তাহার আলোচনা করি, এবং যে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে তাহা পুনরায় না করি তৎপক্ষে যত্নবান হই। এবম্প্রকার চেষ্টা করিতে করিতে আমরা ক্রমে ক্রমে পবিত্রতা লাভ করিতে পারি এবং তাহা হইলে, আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবার যোগ্য হই। আমরা নিজে পবিত্র হইবার জন্য চেষ্টা করিলে, ভগবান আমাদের প্রতি সদয় হয়েন, এবং আমাদের মনকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করেন। আমরা নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা কখনই শ্রবণ করেন না। "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"। ভগবান আমাদের মনের ভাব জানিতেছেন। আমরা যদি আমাদের কলুষিত মনকে পবিত্র করিবার ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তিনি আমাদের সম্মুখের বিঘ্ন বাধা

সকল দূর করিয়া দেন। মনকে ঈশ্বরের উপাসনার উপযোগী করিবার জন্য যেমন পবিত্রতা সঞ্চয় করা আবশ্যক, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ানুরাগকে খর্ব্ব করা বিহিত। যিনি যে বিষয়ের অধিক আলোচনা করেন, সেই বিষয়ক চিন্তা তাঁহার মনের উপর আধিপত্য প্রকাশ করে। যিনি পুত্র কলত্রের চিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, উপাসনার কালে, তাহাদের মূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে। যাঁহার মন পার্থিব সুখের প্রতি সর্ব্বদা প্রধাবিত হয়, উপাসনার সময়ে সেই বিষয়ক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাকে পর্য্যাকুল করিয়া তুলে। এ সম্বন্ধে গুরু নানক ঘটিত একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিতেছি। একদা নবাব দৌলত খাঁ লোদি, গুরু নানক এবং কাজিকে সমভিব্যাহারে লইয়া নমাজ করিবার জন্য জুম্মা মস্‌জিদে গমন করিয়াছিলেন। কথা ছিল যে তাঁহারা একত্রে নমাজ করিবেন। জুম্মা মস্‌জিদে উপনীত হইয়া তাঁহারা দণ্ডায়মান হইলেন। নবাব এবং কাজি রীতিমত নমাজ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নানক তাঁহাদের সহিত যোগ না দিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে পর, নবাব ক্রোধভরে নানককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তুমি আমাদের সহিত নমাজ করিলেনা কেন? নানক ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আমি কাহার সহিত নমাজ করিব? নবাব বলিয়া উঠিলেন, কেন আমাদের সহিত। তখন নানক বলিয়া উঠিলেন যে আপনারা ত নমাজ করেন নাই। আপনি কান্দাহারে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন, এবং কাজি, তাঁহার গৃহস্থিত শিশুটীর তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। আপনাদের শরীর এখানে উপস্থিত থাকিয়া প্রকাশ্যে নমাজ করিতেছিল বটে, কিন্তু আপনাদের মন ত এখানে ছিল না। মনই ত উপাসনা করিয়া থাকে। শরীর স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে? নমাজের সময়ে নবাব কান্দাহারের ঘোড়ার ব্যবসা বিষয়ক কথার আলোচনা করিতেছিলেন, এবং কাজি তাঁহার একটী শিশুকে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, পাছে সে নিকটস্থ কূপে পতিত হয় এই চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল।

অহঙ্কার ধর্ম্মপথের একটী কণ্টক স্বরূপ। এই কণ্টকের দ্বারা অনেক উপাসকের মন বিদ্ধ। ইহাকে উত্তোলন করিতে না পারিলে কেহ প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যাঁহারা পাপী বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদের সহিত কথোপ-

লাপ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। আবার নিজে যে সকল সদনুষ্ঠান করেন, সেই সমুদায়ের সহিত অপর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্যের তুলনা করিয়া অহঙ্কারে উৎফুল্ল হয়েন, এবং আপনাকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। কিন্তু, কেহই ধার্ম্মিক বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন না। বাহ্য ক্রিয়া কলাপের দ্বারা কেহ ধার্ম্মিকের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। পৃথিবীতে কি কেহ পাপ শূন্য আছেন যে তিনি অপরকে ঘৃণা করিতে পারেন? মন, বাক্য এবং কার্য্যে মনুষ্যকর্ত্তৃক যে কত প্রকার পাপের অনুষ্ঠান হয় তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে জঘন্য কার্য্য করিল, সে লোকের কাছে ঘৃণার পাত্র হইল। কিন্তু, যিনি লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত, তিনি যে অপ্রকাশ্য ভাবে কত মত অন্যায় কার্য্য করেন, তাহা কে জানিতে পারে? সে সকল প্রকাশ পাইলে, তিনি সাধারণের নিকট অতি হেয় বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ফল কথা এই যে, কাহারও অপরকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিবার অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টের জীবনী হইতে একটী বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি :—

একদিন প্রাতে মহাত্মা ইশুখ্রীষ্ট জেরুসালেমের মন্দিরে আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময়ে, ইহুদী জাতির মধ্যে দুইটী প্রধান শ্রেণীভুক্ত কএকজন ব্যক্তি, একটী রমণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল— প্রভো! এই রমণীটী ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, মুশা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে প্রস্তরাঘাত দ্বারা ইহার জীবন নাশ করা উচিত। এ সম্বন্ধে, আপনার কি আদেশ তাহা বলুন। কি উত্তর দিবেন, খ্রীষ্ট তাহা ভাবিতে লাগিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য তাঁহাকে বারম্বার উত্তেজনা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, খ্রীষ্ট গাত্রোত্থান করত বলিয়া উঠিলেন—যিনি কখন কোন পাপ করেন নাই তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই স্ত্রীলোকটীর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করুন। এই আদেশটী শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অবশেষে, তাহারা একে একে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। খ্রীষ্ট যখন দেখিলেন যে সকলেই চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি স্ত্রীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—কৈ কেহই ত তোমাকে দোষী বলিতে সাহস পাইল না। স্ত্রীলোকটী প্রত্যুত্তর করিল—হাঁ প্রভু! ইহা শুনিয়া খ্রীষ্ট বলিলেন—আমিও তোমার প্রতি দোষারোপ করিলাম

না। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। আর কখনও পাপ করিও না। ফলতঃ অপরকে দোষী বলিবার পূর্ব্বে নিজ নিজ ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আবার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যে ব্যক্তি অতীব কদাচারী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, তাহারও এমন দুই একটী গুণ থাকিতে পারে, যাহা বিখ্যাত ধার্ম্মিক ব্যক্তিতে নাই। এমন দেখা গিয়াছে যে, কত ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিজ নিজ বাটীতে বসিয়া আছেন, আর কোন কদাচারী ব্যক্তি রোগীর কাছে বসিয়া তাহার সেবা করিতেছে, এমন কি স্বহস্তে তাহার মল মূত্র পরিষ্কার করিয়া দিতেছে, কখন শ্মশানে গিয়া শবদাহ করিতেছে। কখন বা মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের কাছে বসিয়া তাহাদের শোকাপনোদনের চেষ্টা পাইতেছে। নিম্ন বিবৃত বৃত্তান্তটীর দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, কেহই ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না :—

হোসেন নামে একজন মুসলমান সাধক ছিলেন। একদা তিনি কোন নদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন কাফ্রি একটী স্ত্রীলোককে তাহার নিকটে বসাইয়া একটী বোতল হইতে কি ঢালিয়া পান করিতেছে। হোসেন আপনাকে ছোট বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কিন্তু, এই ব্যক্তিটীর ব্যবহার দেখিয়া তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন—এ ব্যক্তি কি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? না, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? এ ব্যক্তি যে একটী স্ত্রীলোকের সহিত বসিয়া সুরা পান করিতেছে। সুতরাং এ ব্যক্তি কদাচারী। তাঁহার মনোমধ্যে এবম্প্রকার আন্দোলন হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার নয়নগোচর হইল যে, একখানি নৌকা তরঙ্গাকুল নদীতে নিমগ্ন হইয়া গেল, এবং কএকজন আরোহী জলে পড়িয়া প্রাণ যায় প্রাণ যায়, রক্ষা কর রক্ষা কর, বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ইত্যাকার হাহাকার রব কাফ্রিটীর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে জলে ঝাঁপ দিল, এবং অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব সহকারে তাহাদের মধ্যে ছয় জনকে রক্ষা করিল। ইহার পর, কাফ্রিটী হোসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'আমি ছয় জনের জীবন রক্ষা করিলাম, তুমি আমার ন্যায় এক জনকে উদ্ধার কর'। হে মুসলমানদিগের আচার্য্য! আমার সমক্ষে যে স্ত্রীলোকটী বসিয়াছিলেন তিনি আমার জননী। আর বোতল হইতে যাহা পান করিতে দেখিয়াছিলে তাহা জল। তুমি অন্ধ কি চক্ষুষ্মান আমি ইহা পরীক্ষা করিতেছিলাম, দেখিলাম যে তুমি অন্ধ। কাফ্রির নিকট হইতে এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া,

হোসেন অপ্রতিভ হইলেন। তিনি তখন তাহার চরণে নিপতিত হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে কাফ্রি! তুমি এই কএক ব্যক্তিকে নদী হইতে উদ্ধার করিলে, আমাকেও অহঙ্কাররূপ নদী হইতে রক্ষা কর। এই ঘটনার পর হইতে হোসেন কাহাকেও আপনাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিতেন না।

ধর্ম্মাভিমান ত্যাগ করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি ধর্ম্মপথের পথিক, তাঁহাকে সাধারণের প্রিয় হইতে হইবে। যে ব্যক্তিকে কদাচারী বলিয়া জানেন, তাহাকে বন্ধুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া, তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায় আচরণের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। তাহাকে বিনয়ের সহিত বলিতে হইবে, ভাই! আজ তোমার মন কুপথে গমন করিয়া তোমাকে কলঙ্কিত করিয়াছে। আমি তোমার বন্ধু হইয়া, তোমার ভ্রাতা হইয়া, তোমার কাছে আসিলাম, প্রার্থনা এই যে, তুমি তোমার কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর। ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা পরস্পর ভ্রাতা। দেখ ভাই! আমি যেমন তোমার কাছে আসিয়া তোমাকে বিহিত পরামর্শ দিলাম, আমার ত্রুটী দেখিলে, তুমিও আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিও। সংসারে আমাদের এই ভাবেই চলা উচিত। যেহেতু কাহার কখন পতন হয় তাহার স্থিরতা নাই। ফল কথা এই যে, আমাদিগের পরস্পর পরস্পরকে কুপথ হইতে সুপথে আনিবার চেষ্টা করা উচিত। কেহ কোন মন্দ আচরণ করিলে, তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করা বিহিত নহে। তাঁহাকে, সদুপদেশ দিয়া, সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। যদ্যপি, ইহার জন্য তাঁহার দুর্ব্বাক্য শুনিতে হয়, তাহাও আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতে হইবে।

ভ্রান্তি।

"চিত্তের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ"ই, বোধ হয়, "ভ্রান্তি" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। আর্য্য দার্শনিকগণের লক্ষণানুসারে "সত্যে মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যায় সত্যজ্ঞান,—এক কথায়, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতীতি"র নামই ভ্রান্তি। আমরাও সেই লক্ষণানুসারে ভ্রান্তিকে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভ্রান্তির সহিত মানবমাত্রেরই চিরন্তন পরিচয়,—ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভ্রান্তি মানবজীবনের সহচরী। অতি শৈশবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তি আমাদিগের অন্তরে আবির্ভূতা হইয়াছে, এবং সেই অবধি কখন লক্ষিত ভাবে, কখন বা অলক্ষিত ভাবে, আমাদিগের অনুসরণ করিতেছে। যদি কখন হৃদয়ে একটু সত্যের আলোক প্রকাশ পায়, এবং সেই আলোকের রেখা অবলম্বন করিয়া চলিতে প্রবৃত্ত হই, ভ্রান্তি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়া থাকে, অথবা মরীচিকার জাল বিস্তার করিয়া আমাদিগকে গন্তব্য পথ হইতে ভিন্নদিকে লইয়া যায়। আমরা তাহার হস্তের ক্রীড়নক,—তাহার ইঙ্গিতে উঠিতেছি, বসিতেছি, হাসিতেছি, কাঁদিতেছি। তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আমাদের সর্ব্বদা পদস্খলন ঘটিতেছে,—পুনঃ পুনঃ পতনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে,—প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

বস্তুতঃ, জগতের যত অত্যাহিত সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে, তৎসমুদয়েরই মূলে এই ভ্রান্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়।—"রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনঃ।"—রাগদ্বেষাদি সমুদয় দোষই ভ্রান্তিজ্ঞানের ফল। যে জঘন্য পাশববৃত্তির প্ররোচনায় যুবরাজ পেরিস কর্ত্তৃক (গ্রীক রাজপত্নী) হেলেনা অপহৃত হইয়াছিলেন ও যাহার ফলে ট্রয় সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়াছে; যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায় বীরাগ্রণী জুলিয়স সীজার রোম নগরীকে অভ্যুদয়ের পরাকাষ্ঠায় অধিষ্ঠিত করিয়াও অবশেষে বন্ধুগণের হস্তে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত হইয়াছিলেন; যে জিগীষাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া রণপণ্ডিত নেপোলিয়ন, পরিণামে ঘোর অপরাধীর ন্যায়, সুদূর সেণ্টহেলেনাদ্বীপে কারারুদ্ধ অবস্থায় জীবনের অবশিষ্ট দিন দারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; যে গর্ব্বাতিশয্যে ভুবনবিজয়ী লঙ্কাধিপতি রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যে অপ্রতিহত মানভরে মহাবীর কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন; যে অতিবিশ্বাস প্রবণতায় কান্যকুব্জে পৃথ্বীরাজের পতন ও গৌড়ে লাক্ষণেয় সেনের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছিল;—তৎ সমস্তই ভ্রান্তিসম্ভূত।

আবার অতি দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড হইতে জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত, নিরক্ষর বর্ব্বর হইতে জ্ঞানবান সুপণ্ডিত পর্য্যন্ত, ভিক্ষাজীবী অসহায় দরিদ্র হইতে সুখসম্পদ সম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্‌ পর্য্যন্ত—সকলেই ন্যূনাধিক ভ্রান্তির অধীন। ভ্রান্তির আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, এরূপ লোক সংসারে বিরল। ভ্রান্তির হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশে অনেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে

ছুটিয়া গিয়াও, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই, প্রভু কর্তৃক পলায়মান ক্রীতদাসের ন্যায়, ভ্রান্তি হস্তে ধৃত ও পুনঃশৃঙ্খলিত হইয়া অধিকতর বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছেন। তাই মানব অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, "To err is human"—ভ্রান্তি মনুষ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"—মুনিগণও ভ্রমের অতীত নহেন।

আবার বাল্যকালাবধি ভ্রান্তির সহিত একত্র অবস্থান হেতু তাহার প্রতি আমাদিগের যেন একটী অন্ধ অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না,বরং একাকী চলিতে যেন একটু সঙ্কোচের ভাব—ভীতির ভাব—আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই আমাদিগকে কেহ ভ্রান্তির হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে আসিলে আমরা অনেক সময়ে ফিরিয়া দাঁড়াই,—ভ্রান্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়াই বিগ্রহক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। মানুষের ভ্রান্তির প্রতি এই প্রকার অনুরাগের আরও কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।—

১। ভ্রান্তি যেমন একদিকে সর্পের রূপ ধারণ করিয়া দংশন করে, অপর দিকে তেমনই বিষবৈদ্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অনেক সময়ে বিষের নিরাকরণ করে। মনুষ্যের হৃদয়ে যখন এরূপ জ্বালা উপস্থিত হয় যে, সংসারের কোন বস্তু তাহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারে না, ভ্রান্তি তখন তাহার কুহকের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে এবং মোহ-মদিরার ধারাবর্ষণ করিয়া তাপ অপনোদন করিয়া থাকে।

২। সংসারের উপভোগ্য বিষয় নিচয়ের স্বাদুতা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে হইলে ঐ বিষয়গুলিকে একবার ভ্রান্তির রসে ডুবাইয়া লইতে হয়,—একবার ভ্রান্তিচূর্ণের একটী লেপ দিয়া লইতে হয়। পার্থিব যাবতীয় সুখই পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক, একটু ভ্রান্ত হইয়া যাওয়ার—অর্থাৎ, বস্তুর স্বরূপ বা যাথার্থ্য বিস্মৃত হইয়া তাহাতে কল্পিত পদার্থের গুণ আরোপ ও নিজের তন্ময়ত্ব স্থাপন করার—প্রয়োজন হয়। নতুবা উপভোগ অতি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সঙ্গীত শ্রবণ করিবার সময় যদি গায়কের মুদ্রাদোষ, এমন কি তাল রাগিণী, প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা যায়, তাহা হইলে সঙ্গীতের পূর্ণ মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। রঙ্গালয়ে গিয়া যদি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হওয়া না যায়, এবং পটে অঙ্কিত নদীপর্ব্বত,অরণ্য-প্রান্তর,রাজপথ প্রভৃতিতে বস্ত্রখণ্ডের বুদ্ধি

থাকে ও তাহাতে চিত্রকরের তুলিকার চিহ্ন অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে রঙ্গালয়ে পরিতৃপ্তির আশা বৃথা। যেহেতু, কয়েকখানি বস্ত্রখণ্ডে চিত্রকরের হস্তনিবেদিত কতকগুলি বর্ণের সমাবেশ দর্শন করিয়া, সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত কয়েকটী মনুষ্যের যথাক্রম উক্তি শ্রবণ করিয়া, আর কতটুকু আমোদ অনুভব করা যাইতে পারে?—বস্তুতঃ, যে প্রকার ইহা একটী দার্শনিক সত্য যে,বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ব্যতীত কোন বিষয়েরই অনুভূতি জন্মিতে পারে না, সেই প্রকার ইহাও সত্য যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা অনুভূতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে, তখন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার সহিত অনুভূতির বিপরীত অনুপাত ঘটে (the sensation varies inversely as the perception)। সুতরাং মানব যখন সুখানুভূতির দাস, তখন তাহার সাধন ভ্রান্তির অধীন কেন না হইবে?

৩। সংসারতত্ত্ব আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমাদিগের অত্যাবশ্যক সত্যজ্ঞান সকল ভ্রান্তির পরিণতি। ভ্রান্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন একটী অনিষ্ট বা অশান্তিতে উপস্থিত হইলে তাহাকে অসত্য বা অপ্রশস্ত বলিয়া বুঝিতে পারি ও তাহা হইতেই সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা জন্মে, এবং সেই স্পৃহার ফলেই তত্ত্ব সকল লাভ করিতে সমর্থ হই। তাই একটী সাধারণ কথা প্রচলিত আছে,—"যেখানে ঠেকিবে, সেইখানে শিখিবে।" যেমন অভাব মানবের দুঃখের সর্ব্বপ্রধান হেতু হইলেও, উহাকে উদ্ভাবনের প্রসূতি—মানবের উন্নতির মূল—বলা যাইতে পারে, তেমনই ভ্রান্তিমূলক "ঠেকিয়া শিখা" প্রণালীটী অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ও বিপজ্জনক হইলেও, তাহা হইতেই সত্যান্বেষণের চেষ্টা ও তাহার ফলস্বরূপ তত্ত্বসকলের আবিষ্ক্রিয়া হইয়া থাকে। আবার যেমন অভাব না থাকিলে আমরা প্রাচুর্য্যের উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, এবং তজ্জনিত সুখও অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম না, তেমনই ভ্রান্তি না থাকিলেও আমরা সত্যজ্ঞানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতাম না। যেমন অভাবের উপস্থিতি সুখের পরিপন্থী, তেমনই ভ্রান্তির বিদ্যমানতা সত্যজ্ঞানের বিঘ্ন। যেমন অভাবের পরিপূরণেই সুখ, তেমনই ভ্রান্তির নিরশনেই সত্যজ্ঞান লাভ। সুতরাং উভয়ের কোনটী হইতে কল্যাণলাভ করিতে হইলেই তাহার প্রতিকারের প্রয়োজন।

ভ্রান্তির নিরশন ও প্রতিকারের উপায় বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ফুলের তোড়া।

কেন, বল, ফাঁকি দিয়ে পালা'ল আমায় ?

(১)

কেন, বল, ফাঁকি দিয়ে পালা'ল আমায় ?—
তা'রে যে যতন ক'রে
রাখিনু হৃদয়ে ধ'রে,
আপন পরাণ খানি বিকাইয়ে দিনু তা'র পায় ;—
তবু কেন ফাঁকি দিয়ে পালা'ল আমায় ?

(২)

প্রেমের প্রতিমা খানি !—শঠতা সে শিখিল কোথায় ?
মু'খানি সোহাগ মাখা,
কি যেন অমিয় ঢাকা,
স্বরগের সুধা ক্ষরে বুকে মুখে গায় ;—
দীঘল নয়ন দু'টী,
অমৃত-ভাণ্ডার লুটি',
চলকিয়ে পড়ে যেন আপন প্রভায় ;—
সরলতা মূর্ত্তিমতী !—ছলনা সে শিখিল কোথায় ?

(৩)

এত যে সোহাগরাশি,—ভালবাসা-ভালবাসি,—
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,—পবিত্র বন্ধন,—
সে কি তবে নিশার স্বপন ?
এত হাসি, এত কথা, এত গান গাওয়',
একটু আড়াল হ'লে ফিরে ফিরে চাওয়া,—
সে কি শুধু শঠতা গোপন তরে
কারুণ্যের শুভ্র আবরণ ?—
সে কি শুধু ফুল দিয়ে ঢাকা
বিষাক্ত কণ্টকাকীর্ণ জীর্ণ আস্তরণ ?

স্বপনের ছায়া।

সুদূর প্রবাসে শু'য়ে মরণের কোলে,
বাসনা জড়িত ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়
আপনার চিন্তাক্লিষ্ট ছায়া-কায়া-খানি
(আপনার জনে) ভালবাসা-উপহার দেয় যবে আনি',—
স্বপ্ন, কিম্বা মায়া, কিম্বা মতির বিভ্রম,
কিম্বা এ মুরতি-গড়া ঘুমে জাগরণে,
ভাবিয়ে আকুল প্রাণে আঁখি পালটিতে,
স্বপনের স্মৃতি সম স্বপনের ছায়া
ভেঙ্গে যায়, চুরে যায়, টুটে যায় মায়া!

সাধ।

আমি কেন হই নি, গো, নিশার সমীর?—
কুঞ্জের একটি পাশে লুকা'য়ে লুকা'য়ে
শুনিতাম প্রেমিকের প্রেম-আলাপন,—
খুলিয়া দিতাম টিপে-টিপে প্রেমিকার মুখের বসন!
তাড়াতাড়ি অমনি সে আঁচোর কুড়া'য়ে নিত,—
রাঙা-রাঙা হাত খানি নেড়ে আমারে তাড়া'য়ে দিত!

প্রাচীন আসামে আর্য্য-প্রভাব।

"ভগবান ভবানীপতি অসংখ্য প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদের কর্ত্তৃক এই স্থানেই (কৈলাসাচলের উত্তরাংশে মৈনাকাদ্রির সমীপস্থ হিরণ্ময় শৃঙ্গশালী মণিময় এক উন্নত পর্ব্বতে) শুশ্রূষমান হইয়াছিলেন।"

—মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়।*

* মহাভারত হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র রায়ের বঙ্গানুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

হিন্দুকুশ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আর্য্যগণ সিন্ধুনদের তীরে (১) উপনীত হইয়া এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে সরস্বতী নদীতীরে (২) এবং সরস্বতী অতিক্রম করিয়া ক্রমে পবিত্রসলিলা গঙ্গানদীর শ্যামল উপকূলে (৩) উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ভারতের এই "সুজলা সফলা" স্বর্ণক্ষেত্র কৃষ্ণকায় কদাকার জাতিসমূহের আবাসভূমি। এই সকল শস্যশালী উর্ব্বর ভূমিতে তাঁহারা উপনিবেশ সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়া আদিম অধিবাসীদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন (৪)। ধনুর্ব্বাণ লইয়া

(১) ১ মণ্ডল। ১২৬ সূক্ত। ১ ঋক্। ২৯৬ পৃষ্ঠা।
৫ ,, ৫৩ ,,। ৯ ,,। ৭৬২ ,,। } ঋগ্বেদ,—রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ। [ঋগ্বেদ পাঠ ও তাহার উল্লেখ সংস্কৃত-সাহিত্য-পারদর্শী ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পায়। তবে শ্রদ্ধাস্পদ দত্ত মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরাও বাঙ্গালা ভাষায় উহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিতেছি।]

(২) ৩ ম। ৪২ সূ। ৫ ঋ। ৫২১ পৃ। ঐ, ঐ।

(৩) ৫ ম। ৫২ সূ। ১৭ ঋ। ৭৬০ পৃ।
৬ ম। ৪৫ সূ। ৩১ ঋ। ৮৭০ পৃ। } এক এক স্থানে বহুকাল বাস করিয়া ক্রমশঃ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, আর্য্যগণ সিন্ধুনদ হইতে অনবরত ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে গঙ্গার উপকূলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

"আর্য্যগণ ক্রমে সরস্বতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন"। ইত্যাদি।

—ঋগ্বেদ, বঙ্গানুবাদ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা, ফুট-নোট।

(৪) "হে ইন্দ্র! আমরা শত্রুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তুমি আমাদিগের এই সমস্ত স্তুতি দ্বারা আমাদিগের সৈন্য সকলকে রক্ষা করিয়া সংগ্রামে শত্রুকোপ বিধ্বস্ত কর। এই সমস্ত স্তুতি দ্বারা তুমি আর্য্যের জন্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান দাসদিগকে বিনষ্ট কর।"

—৬ ম। ২৫ সূ। ২ ঋ। ৮৪৮ পৃ।

"আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যুজাতি আছে; তাহারা যজ্ঞ কর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রুসংহারকারি! তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা কর।"

—১০ ম। ২২ সূ। ৮ ঋ। ১৪৩৩ পৃ।

"বৃত্রহন্তা ও গাভীগণের স্বামী (ইন্দ্র) আমাদিগকে গাভী দান করুন, কৃষ্ণদিগকে দীপ্তিযুক্ত তেজঃ দ্বারা বিনাশ করুন..."

—৩ ম। ৩১ সূ। ২১ ঋ। ৫৩৮ পৃ।

"ইন্দ্র দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন সাধন (আয়ুধ দ্বারা) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

—৪ ম। ৩০ সূ। ২১ ঋ। ৬৪৬ পৃ। ইত্যাদি।

আদিম জাতিদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। (৫) তাহাদিগকে উর্ব্বর ক্ষেত্র ও নদীতটবর্ত্তী জনপদ হইতে বিদূরিত করিয়া বাহুবলে তাহার অধীশ্বর হইলেন।(৬) আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল ; কেহ কেহ পলায়ন করিয়া দুরারোহ পর্ব্বতে আশ্রয় লইল ; অবশিষ্ট সকলে আর্য্যদিগের দাস হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল আদিম জাতির দুর্দ্দশার আর শেষ রহিল না। তাহারা রাক্ষস, দস্যু, দাস,—অবশেষে ত্রিবর্ণ-সেবক শূদ্র-নামে অভিহিত হইয়া অতি দীন-ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিল। গঙ্গাযমুনার সমতল ক্ষেত্রে আর অনার্য্যের অধিকার রহিল না।(৭)

আর্য্যগণ এইরূপে ভারতের আধিপত্য লাভ করিয়া নানাদিকে ক্ষমতা বিস্তার করিতে লাগিলেন। বহু শতাব্দী ভারতে বাস করিয়া জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। আদিম অধিবাসীগণ আর্য্যদিগের সংঘর্ষণে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইল, সভ্য হইল,—রাক্ষসত্বের পরিবর্ত্তে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল।—আর্য্যদিগের সেই বিজয়নিশান জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্ম লইয়া কোন্ সময়ে যে এই পর্ব্বতাকীর্ণ অরণ্যানীবেষ্টিত আদিম জাতিসেবিত দুর্গম আসাম প্রদেশে (৮) উড্ডীন হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা

---

(৫) ৬ ম। ৪৬ সূ। ১১। ঋ। ৮৭৬ পৃ।

(৬) "হে মিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি! বসুগণ তোমাতে বল স্থাপিত করিয়াছেন, তোমার কর্ম্ম সেবা করিয়াছেন। তুমি আর্য্যের জন্য অধিক তেজঃ উৎপন্ন করতঃ দস্যুগণকে স্থান হইতে নির্গত করিয়াছ।" (অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আর্য্যগণ অনার্য্য বর্ব্বরদিগকে তাহাদিগের প্রাচীন প্রদেশ সমূহ হইতে নিঃসারিত করিয়া সেই সেই প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।)

—৭ ম। ৫ সূ। ৬ ঋ। ৯৩৪ পৃ।

(৭) বহুশতাব্দীর পর যযাতি বলিতেছেন (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৮৭ অধ্যায়), পুত্র, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ তোমার অধিকারভুক্ত। তুমি পৃথিবীর মধ্যস্থলের রাজা এবং যাবতীয় অন্ত্য প্রদেশ তোমার ভ্রাতাদিগের অধীন।

(৮) মহাভারত এবং পুরাণ প্রভৃতিতে এই দেশ কামরূপ, নরকদেশ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, প্রভৃতি নামে বর্ণিত হইয়াছে। আসাম নামটী আধুনিক। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আহম জাতি কর্ত্তৃক এই দেশ জয়ের পর হইতেই ইহার নাম আসাম হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। চুকাফার সময়ে এই দেশ সম্পূর্ণরূপে আহমদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। আহম অর্থ অজেয় বলিয়া বোধ হয়।

সুকঠিন। তবে, আর্য্যগণ যে অতি প্রাচীন কালে কামরূপে আসিয়াছিলেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সপ্তসিন্ধু হইতে গঙ্গা যমুনার উপকূল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার ও সনাতন আর্য্য হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতেই বৈদিক সময় শেষ হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই আর্য্যগণের আসাম আগমনের ও এদেশ জয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং এই সময়ে আসামে অনার্য্যের পরাক্রম অনেকটা খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল। দানব ও দস্যুগণ আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিতেছিল।(৯)

মহাভারতের সময় কামরূপাধিপতি আসামের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন এবং তথায় আর্য্যধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মে কামরূপাধিপতি অন্যান্য আর্য্য রাজাদিগের তুল্য ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি যে সমস্ত উপঢৌকন দ্রব্য সহ উক্ত সভায় গমন করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় যে, আসাম রাজ্যে তখন জ্ঞান ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাভারতের বহু পূর্ব্বেই আসামবাসী অনার্য্যগণ আর্য্যদিগের সংস্পর্শে না আসিলে, এবং তাহাদিগের নিকট জ্ঞান, ধর্ম্ম ও রীতিনীতি শিক্ষা না করিলে, সেই সময়ে আসামে আর্য্য-তেজ ও আর্য্য-বলের এতাদৃশ উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যাইত না।

ইক্ষ্বাকু কুলতিলক দিগ্বিজয়ী রঘু ভারতের নানা দিগ্দেশ জয় করিয়া অবশেষে আসামে উপনীত হয়েন। কামরূপাধিপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া হস্তী প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন। তথা হইতে লৌহিত্য মহানদ অতিক্রম করিয়া কৌণ্ডল্য দেশে (১০), এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বর্ব্বর জাতিদিগকে পরাভূত করিয়া অবশেষে কাম্বোজ দেশে উপস্থিত হয়েন এবং তত্রত্য খশ জাতিকে জয় করেন।

আর্য্যগণ, পৌরাণিক সময়ে, আসামে যে সমস্ত অসুরদিগকে জয় করেন,

(৯) "বারুণীসভায় পৃথ্বীজেতা নরক রাজ দিব্য পরিচ্ছদধারী মাল্যচান কিরীট যুক্ত ও মনোহর কুণ্ডলাদি দিব্যালঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া সভা মধ্যে ধর্ম্মপাশধারী উগ্রতেজা প্রচেতার উপাসনায় ব্যাপৃত ছিলেন।"

—সভাপর্ব্ব, ৯ম অধ্যায়।

(১০) সদীয়ার অন্তর্গত বর্ত্তমান কুণ্ডীল নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদায় কৌণ্ডল্য রাজার অধিকৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

তন্মধ্যে নরক ও শাম্বই প্রধান।(১১) নরকের মৃত্যুর পর ভগদত্তই আসামের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে আসামে আর্য্যগৌরব ও আর্য্যধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার মত পরাক্রমশালী রাজা আসামে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীর হইতে আসামের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাঁহারই অধীনে ছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করেন। সভাপর্ব্বে উল্লেখ আছে—"মহারাজ! লোক প্রসিদ্ধ দিব্য সেই অদ্ভুত মণি যিনি মস্তকে ধারণ করেন, যিনি মুরু ও নরক দেশের শাসনকর্ত্তা, যিনি পশ্চিম প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়া বরুণের ন্যায় আধিপত্য করিতেছেন, অপরিমিত বলশালী ত্বদীয় পিতৃসুহৃদ সেই যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভূপতি ভগদত্তও সতত তাঁহার (যুধিষ্ঠিরের) প্রিয়ানুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন"।(১২)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যিনি প্রধান নায়ক, দ্রোনাচার্য্য যাঁহার গুরু, গাণ্ডীব যাঁহার ধনুক, কিরাত রূপী পশুপতি যাঁহার সহিত সংগ্রামে সন্তুষ্ট, মধুসূদন যাহার সখা সেই সাব্যসচী অর্জ্জুনের সহিত ও ভগদত্ত দিগ্বিজয় সময়ে অষ্টাহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।—"মহা ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন যুদ্ধে তাহাদিগকে (শালক দ্বীপস্থ নরপতিদিগকে) নির্জ্জিত ও করপ্রদ করিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ আক্রমণ করিলেন। ভগদত্ত নামে মহাবল নরপতি ঐ দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি চীন ও অন্যান্য সাগর তীরস্থ যোদ্ধ্‌গণের সহায়তায় অর্জ্জুনের সহিত ক্রমশঃ অষ্টাহ যুদ্ধ করিয়া হাস্য বদনে অর্জ্জুনকে কহিলেন,—হে মহাবীর, তুমি বাসবাত্মজ। সংগ্রামস্থলে এরূপ বিক্রম প্রকাশ করা তোমার উপযুক্ত কর্ম্মই হইয়াছে। আমিও শচীসখ বাসবের বন্ধু যুদ্ধ বিষয়েও কোন মতে তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন

---

(১১) কৃষ্ণ বলিতেছেন, "দেখ, আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি শুনিবামাত্রই দুরাত্মা (শিশুপাল) দ্বারকাধামে উপস্থিত হইয়া উক্ত পুরী দগ্ধ করিয়াছিল।"

—সভাপর্ব্ব, ৪৫ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "তুমি মৌরব পাশ, নিসুন্দ ও নরক নামক অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর গমনের পথ নিঃশঙ্ক করিয়াছ।"

—বনপর্ব্ব, ১২ অধ্যায়।

(১২) সভাপর্ব্ব, ১৪ শ অধ্যায়।

নহি। কিন্তু সংগ্রাম স্থলে তোমার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিলাম না। হে তাত! আমার সহিত তোমার এরূপ যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় কি বল? আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই সম্পন্ন করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, কৌরব শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, সত্যসন্ধ ও যাগশীল; তাঁহার অভিপ্রায় এই যে তিনি অন্যদুর্ল্লভ সাম্রাজ্য লাভ করেন। আমরা তাঁহারই আদেশ ক্রমে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছি। আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করিলেই কার্য্যসিদ্ধ হয়। আপনি আমার পিতৃসম বিশেষতঃ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আপনি আমার পিতৃবৎ পূজ্য, অতএব আমি আপনাকে আদেশ করিতে পারি না। আপনি প্রীতি পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কর প্রদান করুন। ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তিনন্দন! তুমি আমার যেরূপ প্রণয়াস্পদ, ত্বদগ্রজ যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ; অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব। এতদ্ব্যতীত আরও কি করিতে হইবে বল, আমি তাহাতেও সম্মত আছি।"(১৩) তৎপর রত্নরাজি প্রভৃতি নানাবিধ উপহার দ্রব্য লইয়া সমস্ত ম্লেচ্ছগণের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব বাসর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের বীজ।

প্রবোধচন্দ্রের বাড়ীখানি অতি বৃহৎ—অট্টালিকা বলিলেও বলা যায়। বাটীটি তিন মহল। প্রথম মহলে প্রকাণ্ড পূজার দালান। দালানের চারিদিকে চকবন্দী। বাটীর সম্মুখে সুনীল আকাশের ন্যায় শ্যামল শষ্পদল পরিপূর্ণ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। উহার এক পার্শ্বে পূর্ব্বে বকুবটী বন ছিল,—১২৭১ সালের ভীষণ বাত্যায় তাহার বৃক্ষগুলি সমস্তই সমূলোৎপাটিত হইয়াছে। কেবল একটীমাত্র অশোক তরু ধরাতলে শায়িত হইয়া যেন জ্ঞাতিগণের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে!—দ্বিতীয় মহলটী সৌষ্ঠবশূন্য; ইহাতে গৃহাদি কিছুই নাই,

---

(১৩) সভাপর্ব্ব, ২৬। ৩৪ অধ্যায়।

কেবল উভয় পার্শ্বে কয়েকটী ঘরের ভিত্তি মাত্র দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, গৃহস্বামী বাটীর এই অংশটী নির্ম্মাণ করিতে করিতে কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণবশতঃ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।—ইহার পর অন্দরমহল। এই মহলটীও চকবন্দী। চতুর্দ্দিকে দ্বিতল গৃহ।—তাহার পর খিড়্‌কীর বাগান ও পুষ্করিণী। বাটীটি প্রবোধচন্দ্রের পিতামহ ৺কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, একমাত্র সন্তান, প্রবোধের পিতা সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। পাঠক! আজি যে বাটীকে শব্দহীন, মনুষ্যহীন, সমাধিভূমিস্থ গৃহের ন্যায় ভয়াবহ শূন্যময় দেখিতেছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা এরূপ ছিল না। তখন দাসদাসীর গণ্ডগোলে, বালক-বালিকার হাস্যরোলে, সর্ব্বদা কোলাহলময়ী থাকিত। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল অধিক দিন এ শোভা সহিতে পারিল না, সে অচিরাৎ প্রবোধচন্দ্রের পিতার এই সুখের হাট ভাঙ্গিয়া দিল,—সোনার পসরা কাড়িয়া লইল! করাল কালের পীড়নে এইরূপ কত সুখের হাট ভঙ্গ হইয়াছে, কত সোনার পসরা অপহৃত হইয়াছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

প্রবোধচন্দ্রেরা তিন সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে প্রবোধ সর্ব্বকনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ দুই জনেরই বিবাহ হইয়াছিল, প্রত্যেকের দুই তিনটী করিয়া সন্তানও হইয়াছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া গণ্ডগোল করিয়া খেলা করিত, প্রবোধচন্দ্রের পিতা তাহা দেখিয়া হাস্য করিতেন এবং মনে মনে ভাবিতেন—এ সংসারে ইহাই সুখের চরম। কিন্তু হায়! শীঘ্রই তাঁহার এ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল!—নিষ্ঠুর কাল সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই এ সুখের রঙ্গশালা হইতে বহিষ্কৃত করিল, এবং পরে ক্রমে ক্রমে প্রবোধচন্দ্রের উভয় সহোদর ও তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রগুলিকে পর্য্যন্ত আপনার করাল কবলে কবলিত করিল। কেবল প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার জননী উৎসবগৃহের প্রভাতকালীন দুই একটী নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ দীপশিখার ন্যায় সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে মিট্‌-মিট্‌ করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্র তখন নিতান্ত বালক। তাঁহার জননী উপর্য্যুপরি এই নিদারুণ শোক তাপে একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন,—ভাবিলেন অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই, তিনি মরিলে বালক প্রবোধচন্দ্রের কি দশা হইবে?—কে তাহার মুখপানে চাহিবে?—এই ভাবনা তাঁহার মনে প্রবল হইল। সুতরাং সেই ভীষণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তিনি প্রবোধচন্দ্রের মঙ্গলকামনায় মনোনিবেশ করিলেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রবোধচন্দ্র গ্রামের নিকটস্থ একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত হইলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে তথাকার পাঠ সমাপন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অতঃপর কলিকাতায় গিয়া যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী পরীক্ষাতেও কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। ইহার পরেই তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার পক্ষে এক বিষম ব্যাঘাত সংঘটিত.হইল।—তাঁহার পৈতৃক যে বিষয়াদি ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দে দিনযাপন হইত। কিন্তু উপযুক্ত তত্বাবধারণের অভাবে সমস্তই বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল।—হয়ত কোন স্থানে দুই তিন বৎসরের খাজানা বাকী পড়িয়া আছে,—আদায় হয় না; হয়ত কোন মহলের ভূমিখণ্ড তত্রত্য জমিদার মহাপ্রভু গ্রাস করিয়া ফেলিলেন; হয়ত কোন কর্ম্মচারী খাজানার টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিয়া বসিল; এইরূপ নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধা উপস্থিত হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য, নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও, প্রবোধচন্দ্রকে কলিকাতার পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইল। ইংরাজি শিক্ষাও সুতরাং তাঁহার এইক্ষণে শেষ হইল। অতঃপর তিনি বাটী আসিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শৈশবাবধি তিনি ঐ দেবভাষার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন; বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তাঁহার সে ইচ্ছা সম্যক্ প্রকারে ফলবতী হইতে পারে নাই,—এক্ষণে বাটী বসিয়া বিষয়াদির তত্বাবধারণ এবং হেমলতার পিতা শিবদাস ভট্টাচার্য্যের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শিবপ্রসাদ ঐ অঞ্চলের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় একজন বিশেষ পারদর্শী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্রবোধচন্দ্রকে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্রও অসামান্য বুদ্ধি প্রভাবে অচিরেই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শিবপ্রসাদ আপন তনয়ের ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতেই হেমলতার সহিত প্রবোধের প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। তখন হেমলতার বয়স দশ বৎসর মাত্র। প্রথম আবির্ভাবে এই প্রণয় পরিণামবোধশূন্য বালহৃদয়ের সরল ভালবাসা মাত্র—শারদ চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল, বায়ুবিক্ষোভশূন্য সরসী সলিলের ন্যায় নিষ্কম্প ও তরঙ্গবিহীন, নব প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মবৎ অ-কীটদষ্ট! কিন্তু ক্রমে ক্রমে, দিনে দিনে, সে কিরণে ছায়া পড়িল,—সে সলিলে তরঙ্গ ছুটিল,—সে কুসুমে কীট প্রবেশ করিল!—প্রবোধচন্দ্র পড়িতেন, হেমলতা কাছে বসিয়া শুনিত। আরও দুই

তিনটী যুবা তাহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিত, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবোধচন্দ্রের পড়া শুনিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। প্রবোধচন্দ্র আবৃত্তি করিতেন, বালিকা আপন বামহস্তের উপর স্বীয় ক্ষুদ্র শরীরভার বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় একমনে শুনিত, আর সেই অনুপম মুখখানির প্রতি নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত। শিবপ্রসাদ এ সকল দেখিতেন, দেখিয়া হাসিতেন। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নাই যে, সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রণয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র যূথিকাও যে তাহার সেই ক্ষুদ্রতম হৃদয়ে মধু ধারণ করে, ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝেন নাই!

এই সময় প্রবোধচন্দ্রের মাতা পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। একটী বউ আসিলে তাঁহার সাংসারিক অনেক বিষয়ে সাহায্য হয়,—বিশেষতঃ, তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সে প্রবোধচন্দ্রের ক্রোড়ে একটী সন্তান দেখিয়া মরিতে পারিলে তাঁহার এ দগ্ধ জীবনেও একটু শান্তিলাভ হয়, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রের বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। দুই চারি স্থান হইতে সম্বন্ধও আসিল। কিন্তু বিবাহের নাম হইলেই প্রবোধচন্দ্র একটা না একটা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বসিতেন। তিনি জানিতেন যে ইহাতে তাঁহার মাতাকে অত্যন্ত অসুখী করা হইতেছে; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে হেমলতার মোহন ছবি অলক্ষ্যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মুছিয়া অপর কোন মূর্ত্তিকে স্থান দিতে পারিতেন না,—তিনি মনে মনে বলিতেন, "মা'র অসুখ দুই দিনের জন্য, কিন্তু আমি যে চিরজীবনের জন্য অসুখী হইব।"

বিধাতাই বলিতে পারেন, এই প্রণয়-বীজের কোথা পরিণতি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নান্তে।

প্রবোধচন্দ্র আজ অসময়ে শয্যাগত। সন্ধ্যা সমাগম হইতে না হইতেই 'অসুখ হইয়াছে' বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন। অন্য দিন তিনি আহারান্তে মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া মাতাকে শ্রবণ করান, এবং তদনন্তর আপন কক্ষে বসিয়া ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া নিদ্রা যান। আজ এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহার মাতা সহজেই উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু গাত্র পরীক্ষা করিয়া জ্বরের লক্ষণ বোধ না হওয়ায় অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত

মনে ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন,—অন্যবিধ প্রশ্নের দ্বারা নিদ্রার বিঘ্ন হইলেন না।

প্রবোধচন্দ্র শয়ন করিলেন বটে,—কিন্তু নিদ্রার জন্য নহে; নির্জ্জনে নিস্তব্ধভাবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া তিনি সেই অতীত সুখস্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই কৌমুদী-প্লাবিত সুখ সন্ধ্যা, সেই কলনাদিনী জাহ্নবী, এবং তৎপরে সেই সুবর্ণপ্রতিমা সদৃশ বালিকার অনুপম রূপমাধুরী ও সুধাময় হাস্যরাশি—একে একে সকলই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যেন সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য তিনি এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তৎপরে, বসন্ত সমাগমে প্রথম মলয়-মারুত-হিল্লোলের ন্যায়, বালিকার সেই হৃদয়োন্মাদ-কারী প্রণয়ালাপ মনে পড়িল,—তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল,—অন্তরের অন্তরে যেন সেই বায়ু প্রবাহ সঞ্চারিত হইতে লাগিল! পরক্ষণেই বালিকার সেই রোদন,—তাঁহার হৃদয় মধ্যে মস্তক রাখিয়া সরলা বালিকার সেই নিরাশ নিপীড়িত হৃদয়ের বাহ্য বিকাশসূচক উত্তপ্ত অশ্রুদাম—মনে হইয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না; আবার না ভাবিয়াও থাকিতে পারেন না,—হৃদয় যেন শূন্য হইয়া যায়! কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অবস্থান করিয়া পরিশেষে তাঁহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল। তাঁহার সেই স্বপ্নময়ী সরলার প্রতি পাপিষ্ঠ শ্যামাচরণের দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়িল,—ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল,—তিনি উন্মত্তের ন্যায় সবেগে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার অবসন্ন হইয়া শয্যাতলে শয়ান হইলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল, এবং অবিলম্বে নিদ্রার সঞ্চার হইল। কিন্তু এ নিদ্রা তাঁহার তৃপ্তিকর হইল না,—এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া তিনি নিশাশেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

প্রবোধচন্দ্র স্বপ্নাবেশে দেখিলেন,—যেন বিমল চন্দ্র-কর-বিধৌত বাসন্তী যামিনী, সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ, সুখসেব্য বসন্ত-সমীরণ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। এহেন সুখময়ী রজনীতে তিনি আর হেমলতা যেন একখানি অপূর্ব্ব তরণী আরোহণ করিয়া ভাগীরথী বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছেন। নৌকাখানি রাজহংসীর ন্যায় নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে, ধীরে ধীরে চলিতেছে। উপরে নৈশাকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া অজস্রধারে অমৃত-কিরণ বর্ষণ করিতেছে, নিম্নে জাহ্নবী বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা আলোক-

ফণা মস্তকে করিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে! হেমলতা তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রকৃতির এই মনোমোহন ছবি অবলোকন করিতেছে এবং কত কথা বলিতেছে, তিনিও যেন উচ্ছ্বসিত সুখের তরঙ্গ হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না,—বিহ্বল চিত্তে বালিকার সেই সুবিমল মুখারবিন্দের প্রতি অনিমিষলোচনে চাহিয়া আছেন,—তাহার সেই মৃদু-মধুর স্বর্গীয় প্রেমগান শুনিতে শুনিতে যেন আপনা-হারা হইয়া যাইতেছেন! কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এ সুখ-সম্ভোগ ফুরাইল।—কোথা হইতে নিবিড় কাল-মেঘ আসিয়া সহসা সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—চন্দ্র ডুবিয়া গেল,—নিমেষ মধ্যে প্রকৃতির সেই অতুল্য রূপরাশিতে ঘন কালিমাচ্ছায়া পতিত হইল। প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল,—জাহ্নবী বক্ষে ভীষণ তরঙ্গ ছুটিল,—নৌকা ডুবু ডুবু হইল,—দেখিয়া হেমলতা সভয়ে তাঁহাকে দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল ;—পলকের মধ্যে নৌকাও ডুবিল।

প্রবোধচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিলেন না,—যেন কোন মোহিনী মায়ায় তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল। আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত অবস্থায় লোকের যেরূপ অস্ফুট চৈতন্যের সঞ্চার হয়, তৎকালে তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। তিনি নিস্পন্দভাবে, মুদ্রিত নয়নে, বিস্ময়-বিমুগ্ধ মনে, ছায়াবাজির ন্যায় পুনরায় দেখিতে লাগিলেন,—যেন নৌকা ডুবিবামাত্র তাঁহারা উভয়ে সেই উন্মত্ত তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া সাঁতার দিতেছেন। কিন্তু বহুক্ষণ এ সুখও ভোগ করিতে পাইলেন না,—প্রবল তুফানে তাঁহাদিগের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি হেমলতাকে আর দেখিতে পাইলেন না। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই প্রবল বায়ুতরঙ্গ তাঁহার চীৎকারধ্বনি কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল,—তিনি হেমলতার কোন উত্তর পাইলেন না।

তখন প্রবোধচন্দ্র প্রাণপণে সেই উদ্ধত তরঙ্গাবলীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইতস্ততঃ হেমলতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার উদ্দেশ পাইলেন না। এমন সময় একটী প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে নদীগর্ভে চাপিয়া ধরিল, আবার যেন কোন ঐশী শক্তিবলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া উপরে উঠিলেন, উঠিবামাত্র অপর এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাঘাতে একটী ক্ষুদ্র সুরম্য দ্বীপে আসিয়া নীত হইলেন। তখন তুফান

ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। সুদূর আকাশ প্রান্তে বিজলী-চমকবৎ যেন একটী অনতিস্ফুট ক্ষীণ জ্যোতিরেখা দেখা দিল। তিনি বিভ্রান্ত নয়নে সেই আলোকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা দেখিলেন, এক যুবাপুরুষ সেই আলোকের মধ্য হইতে বহির্গত হইল, এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক অপূর্ব্ব দেবকন্যা তাহা হইতে নির্গত হইয়া যুবকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক সহাস্যে তাহার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে, সেই আলোক ও সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দম্পতি তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। তিনি নিষ্পন্দ নয়নে চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই দেব-কন্যা তাঁহারই হেমলতা! তিনি উন্মত্ত ভাবে ব্যাকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলেন,—সে শুনিতে পাইল না। তিনি অধীরচিত্তে সেই যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার হেমবতাকে তুমি কোথায় লইয়া যাও?" যুবা তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঈষদ্ধাস্যে হেমলতাকে লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রমে সেই আলোক আরও সুস্পষ্ট হইল। প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার হেমলতা একখানি শুভ্র মেঘখণ্ডের উপর বসিয়া একটী পূর্ণশশী কোলে করিয়া হাসিতেছে,—কত সোহাগ করিতেছে,—তাহার রূপের বিভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছে! তিনি উন্মত্ত হৃদয়ে চীৎকার করিয়া আবার তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু এবারও হেমলতা শুনিতে পাইল না। দেখিতে দেখিতে সে দৃশ্যও কোথা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে সেই আলোক আরও নিকটে আসিল,—আরও উজ্জ্বল হইল। প্রবোধচন্দ্র আবার চাহিয়া দেখিলেন,দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।—দেখিলেন, তাঁহার হেমলতা ছিন্নভিন্ন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগলিনীর ন্যায় ইত-স্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—তাহার সেই অনুপম রূপরাশিতে যেন ঘোর কালিমাচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল,—তিনি উদ্ভ্রান্ত মনে উচ্চৈঃস্বরে আবার তাঁহাকে ডাকিলেন। এবার যেন হেমলতা শুনিতে পাইল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া বিকট চীৎকার পূর্ব্বক উন্মা-দিনীর ন্যায় তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন, সে ছুটিতে ছুটিতে যে মেঘখানির উপর পা দিতেছে,তাহা হইতেই যেন অজস্র-ধারায় বারিবর্ষণ হইতেছে। তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যেন তাহা বৃষ্টি নহে,—হেমলতার অশ্রুধারা!

হেমলতা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই বিক্ষিপ্ত মেঘমালার উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে সহসা যেন পদস্খলিত হইয়া একেবারে নিম্নস্থ নদীগর্ভে পতিত হইল। পড়িবার সময় তাহার ভয় বিজড়িত ঘোরতম আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রবোধচন্দ্রও ভয়াবরুদ্ধকণ্ঠে অব্যক্ত চীৎকার করিয়া তাহাকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ছুটিলেন; কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলেন যে, এক জটাজূটধারী নবীন সন্ন্যাসী সহসা কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়া হেমলতার হস্তধারণপূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে তাহাকে তীরে উত্তোলন করিলেন। প্রবোধচন্দ্র বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন,সেই সন্ন্যাসীর অবয়বের সহিত তাঁহার নিজ অবয়বের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে!

হেমলতা তীরে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার নিকটে আসিয়া, উচ্চ হাসি হাসিয়া, অঙ্গুলিসঙ্কেত পূর্ব্বক তাঁহাকে কি দেখাইয়া দিল। তিনি বিস্মিত নয়নে সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—পর্ব্বত প্রমাণ এক ভীষণ অগ্নিস্তূপ ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!—সর্পফণাসদৃশ তাহার ভয়ঙ্কর শিখারাশি লক্-লক্ করিয়া গগনস্পর্শ করিতেছে। প্রবোধচন্দ্রকে দেখিবামাত্র হেমলতা বিকট চীৎকার করিয়া সেই দিকে ছুটিল। প্রবোধচন্দ্রও তাহাকে ধরিবার জন্য তীরবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন; কিন্তু হেমলতা চকিতের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া সেই জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইল,—দেখিয়া প্রবোধচন্দ্র উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

এই চীৎকারে তাঁহার মায়া-নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, রজনী প্রভাতপ্রায়,—উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া অস্তোন্মুখ চন্দ্রের মলিন রশ্মি প্রবেশ করিতেছে, জাহ্নবীর কুলু-কুলু-ধ্বনি অদূরে অস্পষ্ট ভাবে শুনা যাই-তেছে,—সুস্নিগ্ধ প্রভাত-সমীর ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। তিনি উন্মত্ত মনে গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া দ্রুত পদে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার অন্তরে সেই ভীষণ স্বপ্ন এখনও যেন প্রত্যক্ষবৎ জাগিতে লাগিল!

দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

ষষ্ঠীপালা।

গণেশ বন্দনা।

সমাদর করি করী-বদনে, পুটপাণিতে প্রণমি চরণে।
ত্রিলোচন তাত মাতা শ্রীউমা, যাঁহার গুণ গণনে অসীমা।
বেদে বিভাবিছে বিঘ্ন রাজেতে (১) দেবদেব যেঁহ দেব মাঝেতে।
অতুল রাতুল শীতল পদে, ভ্রমরা ভ্রমরী ভ্রমে আমোদে।
বর শশধর নখর শোভা, সুমধুর স্বর নূপুর-প্রভা।
পরিধান লাল দুকূল পটে, ঘাঘর ঘুংঘুর কি কটিতটে।
নাভি গভীর তুন্দিল (২) জঠরে, তুলসী-মাল ললাম সে উরে।
দন্ত পাশাঙ্কুশ শ্রীহরিনাম, ক্রমে চতুর্ভুজ কি অনুপম।
বিবিধ বলয় বাহু বিশালে, গ্রীবাভাগে কিবা মাণিক দোলে।
একরদন সে গজবদনে, অতি শোভা করি'ছে ত্রিনয়নে।
গণ্ডে বিমণ্ডিত সিন্দুর শোভা, শিরে শশধর সুচারু প্রভা।
প্রভাত-ভানু-জিত তনুরুচি, নিরবধি হৃদি ধ্যানেতে শুচি।
সুন্দর ইন্দুরে যাঁহার গতি, হেন হেরম্বে অদন্তে (৩) প্রণতি।
জয় গণেশ বলে যাত্রাকালে, অষ্ট সুসিদ্ধি (৪) তার করতলে।

---

(১) শাস্ত্রে যিনি বিঘ্ন বিনাশন বলিয়া কীর্ত্তিত।—শাস্ত্রার্থে 'বেদ' শব্দের ব্যবহার ৬৪ পৃষ্ঠায় ৭ম টীপ্পণী দেখুন।

(২) তুন্দিল জঠরে=স্থূলোদরে।

(৩) অদন্তে=সবিনয়ে।

(৪) অষ্টসিদ্ধি—১। অণিমা (স্বেচ্ছানুসারে নিজ শরীরকে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা); ২। লঘিমা (ঐ ঐ লঘু করিবার ক্ষমতা); ৩। প্রাপ্তি (সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা); ৪। প্রাকাম্য (ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা); ৫। মহিমা (স্বেচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা); ৬। ঈশিতা (সর্ব্বত্র প্রাধান্য স্থাপনের ক্ষমতা); ৭। বশিতা (সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা); এবং ৮। কামাবসায়িতা (আপনার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা)।

বিবিধ বিঘ্ন-বিভঞ্জন যিনি, মোপামরে কৃপা করুন তিনি।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি মূকে পটুতা, যাঁর কটাক্ষেতে হয় সর্ব্বথা।
অসাধ্য সাধন সে জন করে, গজানন চা'ন নয়নে যারে।
নিজ গুণে গণনায়ক চাও, অকৃতী অধমে অভয় দাও।
দীন হীন আমি সদা অশুচি, কাব্য করণে করি অভিরুচি।
মোর রসনাতে করিয়া কেলি, দুর্গাপঞ্চরাত্রি কর পাঁচালী।
ছন্দ বিছন্দ নানাবিধ ভাষা, কাব্য করি নাথ পুরাহ আশা।
ভুলুই-ভবন শিখর-ভূমে, হৃদি ভাবি নবঘন শ্রীরামে।
রঘুনাথ-সুত জগত গায়, পার্ব্বতী-নন্দন রাখিহ পায়।

পার্ব্বতী বন্দনা।

জয় পার্ব্বতী, হর দুর্গতি, প্রণতি তব ও চরণে।
সেই সে ধন্য, পরম পুণ্য (৫) যে লক্ষে তব শরণে॥
মুক্তিদাত্রী, শিখর পুত্রী, নাস্তি তব মা উপমা।
তব চরিত্র, কে হেন পাত্র, জানিবে বেদে যে অসীমা॥
মূল প্রকৃতি, নাস্তি আকৃতি, (৬) পরম জ্যোতিরূপিণী।
এ সব সৃষ্টি, সে তব দৃষ্টি, সচরাচর ব্যাপিনী॥ (৭)
বিহীন-কর্ণ, শুনহ বর্ণ, দৃগ্‌বল হীন নয়না।
রসনা-রহিত, স্বাদ বিদিত, হীণচরণে গমনা॥ (৮)

---

(৫) পুণ্য=পুণ্যবান।

(৬) নাস্তি আকৃতি=নিরাকারা। সাধনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় "অধ্যাত্মযোগ" দ্বারা সাধকের অন্তরে নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ভক্ত রামপ্রসাদ সেই অবস্থা লাভ করিবার জন্য কাতর প্রাণে বলিয়াছিলেন,—"এমন দিন কি হ'বে তারা। যবে * * * ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ, ওরে শত শত সত্য বেদ,—তারা আমার নিরাকারা।" বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় জীবের জীবত্ব থাকে না—ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

(৭) সচরাচরব্যাপিনী—(ভক্ত রামপ্রসাদের) "মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।"

(৮) বিহীণ কর্ণ...হীনচরণে গমনা—কর্ণবিহীণা হইয়াও তুমি বর্ণ (স্তব, ভাষা) শুনিতে পাও, হীনময়না হইয়াও দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্টা, রসনাবিরহিতা হইয়াও স্বাদগ্রাহিণী, চরণহীনা হইয়াও গমনশীলা। যথা, অন্নদা মঙ্গলে—"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।"

সলিলে স্নিগ্ধ, অনলে দগ্ধ, রবিতে প্রখর কিরণা।
চন্দ্রে শীতল, সে তুমি সকল, অগণিত গুণবরণা ॥ (৯)
জগতবন্দ্য, তুমি অনিন্দ্য, হরি-হর-বিধি-পূজিতা।
অতি অধর্ম্মী, আমি কুকর্ম্মী, মোর কেহ নাই শুন মাতা ॥
করুণা-নেত্রে, চাও কুপুত্রে, হে ত্রিনয়নী একবার।
তারা-নাম-ভার, (১০) রাখ এইবার, আমি সে ক'রেছি সার ॥
না জানি তন্ত্র, পূজন মন্ত্র, যন্ত্র (১১) বিহীন পূজা।
দেখিয়া পামর, মোর দুঃখ হর, দয়া কর দশভুজা ॥
তব চরিত্র, পঞ্চরাত্র, গান শুনিয়া কর দয়া।
হবে সাপক্ষ, কর কটাক্ষ, কাতরে বিতর পদছায়া ॥
জগত রায়, এ বর চায়, তব শীতল চরণে।
তব ও মূর্ত্তি, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি (১২), হয় সেই যেন মরণে ॥

চরাচর বন্দনা ও গ্রন্থ-সূচনা।

গুরু গজানন গৌরী গঙ্গা গঙ্গাধরে। বিষ্ণু বিধি বাসবে বন্দিব যোড়করে ॥
শশী সূর সমীর শমন হুতাশনে। বিষ্ণুর বণিতা বাণী বন্দি দু'চরণে ॥
অরুণ বরুণ তারা গ্রহতে প্রণাম। সাষ্টাঙ্গে সাদরে নতি সর্ব্ব পুণ্যধাম ॥
চতুর্দ্দশ ভুবন (১৩) সে সপ্তম বারিধি। (১৪) ভূধর সহিত ভূমি যত নদ-নদী ॥
এককালে বন্দি চতুর্ব্বিংশ অবতার (১৫)। তার পর অসংখ্যাবতারে নমস্কার ॥

---

(৯) স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধতা; দগ্ধ=দাহিকা শক্তি; শীতল—শৈত্য; গুণবরণা=গুণরূপা, গুণবিশিষ্টা।

(১০) ভার—গুরুত্ব; মাহাত্ম্য।

(১১) যন্ত্র—শক্তিপূজার আধার, গুপ্তার্থ রেখাময় চিহ্নাদি।

(১২) স্ফূর্ত্তি—বিকাশ, আবির্ভাব।

(১৩) চতুর্দ্দশ ভুবন—ভু,ভুব, স্বর্, মহ, জন, তপ, সত্য, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।

(১৪) সপ্ত বারিধি—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, জল।

(১৫) চতুর্ব্বিংশ অবতার—পুরাণে অসংখ্য অবতারের উল্লেখ আছে, কবি জগদ্রামও পরবর্ত্তী পংক্তিতেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে (শ্রীমদ্ভাগবতের, ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়ে) প্রধানতঃ, দ্বাবিংশ অবতারেরই প্রসিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্মা, বরাহ, নারদ,নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভদেব, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্যাস, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ও কল্কী। কবি জগদ্রাম এতদ্ভিন্ন অপর কোন্ দুই অবতারকে শ্রেষ্ঠ

ভগবান-ভক্তগণে ভাবে করি নতি। যে সবার মানসে বিলসে রমাপতি॥
মুনি যোগী পদদ্বন্দ্ব বন্দি সুমানসে। ভূদেব ব্রাহ্মণে নতি অশেষ বিশেষে॥
পঞ্চপিতা (১৬) সপ্তমাতা (১৭) বন্দি এককালে। কাকুতিতে নতি মোর করি পদতলে॥
পৃথকে প্রণামেতে প্রচুর হবে গ্রন্থ। নমস্য সকলে হ'ন অসীম অনন্ত॥
সর্ব্ব চরাচর মূর্ত্তি এক নারায়ণ। অতেব একত্র বন্দি সবার চরণ॥
সর্ব্বদেব সর্ব্বদেবী যক্ষ দানবেতে। পিশাচ ডাকিনী সিদ্ধ সাধ্য ভূত প্রেতে॥
গন্ধর্ব্ব গরুড় নর পন্নগ বেতালে। উত্তম মধ্যম কি প্রাকৃত (১৮) ভূমণ্ডলে॥
জীব জন্তু আদি করি স্থাবর জঙ্গমে। সকলেরে সমাদরে আমার প্রণামে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী কোটী অগণন। তাথে অধিষ্ঠান দেব দেবী যত জন॥
তার কর্ত্তা হর্ত্তা যেঁহ এক নিরঞ্জন। প্রদক্ষিণে প্রণমিয়ে তাঁহার চরণ॥
সকলে প্রার্থনা মোর করহ করুণা। রাম নাম অন্তে যেন জপয়ে রসনা॥
দুর্গাপঞ্চরাত্রি গান অতি অনুপম। যে বিধানে দুর্গাপদ পূজিলা শ্রীরাম॥
তার বিবরণ শুন পরম মোদেতে। সীতাহারা হ'য়া রাম আছেন পর্ব্বতে॥
সীতার উদ্দেশ দিলা পবন-নন্দন। হনুমানে পুনঃ জিজ্ঞাসিলা সনাতন॥
সে কথা শ্রবণ কর পরম মধুর। দুর্গাপঞ্চরাত্রি গায় জগত ভূসুর॥ (১৯)

স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ।

(১)

যে সকল মহাপুরুষ স্ত্রীজাতি হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেন এবং স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করিতে নিষেধ করেন, ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, কিন্তু তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত নহি—

আবিরা চতুর্ব্বিংশ অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন, নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ভাগবতকারের মতে পূর্ব্বোক্ত অবতার সকলের মধ্যে কেহ ভগবানের অংশ, কেহ বা বিভূতি ; কেবল শ্রীকৃষ্ণাবতারই সর্ব্বশক্তির হেতু সাক্ষাৎ নারায়ণ। কবি জগদ্রাম কথিত "সর্ব্বচরাচর মূর্ত্তি এক নারায়ণ" কথাতেও সেই মতেরই আভাস পাওয়া যায়।

(১৬) পঞ্চ পিতা—জনক, শ্বশুর, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, উপনয়নকর্ত্তা।

(১৭) সপ্তমাতা—জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী, পৃথিবী।

(১৮) প্রাকৃত—অধম, নীচ।

(১৯) ভূসুর—ভূদেব, ব্রাহ্মণ।

বোধ হয়, জগতের পৌণে ষোল আনা অথবা ততোধিক ব্যক্তিই নহে। আমরা এই জানি যে, একা পুরুষ অসম্পূর্ণ, সৃষ্টির একাঙ্গ মাত্র। যেমন প্রকৃতি বিরহিত পরম পুরুষ ধারণার অতীত, জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য একটা অন্ধকারময় অস্থায়ী অপরিস্ফুট ভাব মাত্র, তেমনই স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষ একটা কি-জানি-কেমন পদার্থ,—পুরুষ বিরহিত স্ত্রীর পক্ষেও ঐ কথা বরং কিছু অধিক মাত্রায়। জগৎ সংসার প্রতিপন্ন করিতেছে যে, স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের আশ্রয় ও অবলম্বন, উভয়ের সম্মিলনেই সৃষ্টির সমন্বয়,—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেকে বিধাতার সৃষ্টির আধখানা মাত্র—অসম্পূর্ণ, অকর্ম্মণ্য, আধখানা। প্রত্যেকে এক একটী নারিকেল মালা—উভয়কে একত্র না করিলে নারিকেলের আকার সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান জন্মান অসম্ভব, স্ত্রী পুরুষকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিলে জীবসৃষ্টির জ্ঞানও তদ্রূপ। "তুমি সে শ্যামের, শ্যাম সে তোমার"—ইহাই সংসারের নিয়ম, নতুবা রাধা বিরহিত শ্যাম "শুধুই মদন"। কেবল পুরুষই এই সৃষ্টির কর্ত্তা হইবেন, অথবা স্ত্রীজাতিই একাধিপত্য করিবেন, বিধাতার যদি এমন ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে উভয়ের একজনকে সৃষ্টি করিতেন এবং এমন করিয়া সৃষ্টি করিতেন যে তাহা হইতেই সন্তানোৎপন্ন হইত ও সংসার ধর্ম্ম সকলই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। সে অবস্থা যে কি ভয়ানক, কি শুষ্ক, কি অন্ধকারময়, হইত তাহা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে—সূর্য্যহীন দিবস বা চন্দ্রশূন্য রজনী হইতেও তাহা ভয়ানক। বলাধিক্য বশতঃ সমাজের শৈশবকাল হইতে পুরুষ স্ত্রীজাতির উপর আধিপত্য করিয়া আসিলেও তিনি সংসারের রাজরাজেশ্বর নহেন। বিশ্বস্রষ্টা এ সুন্দর সংসার তাঁহাকে একা উপভোগ করিতে দেন নাই—সকল কাজেই একজন সহযোগী সহভোগী দিয়াছেন। সে সহযোগী, সে সহভোগী, স্ত্রী। বাইবেলে বর্ণিত স্ত্রীজাতির সৃষ্টি অতি সুন্দর, অতি হৃদয়গ্রাহী কল্পনা। ঈশ্বর পুরুষ সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইল না—যেন অঙ্গহীন রহিল, সুতরাং তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য পুরুষের সহযোগী করিয়া স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন। স্ত্রী সৃষ্টির উপকরণ হইল পুরুষের বামাঙ্গ এবং হৃদয় পার্শ্বস্থ অস্থি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকল কার্য্যেই পুরুষ কর্ত্তা, স্ত্রী তাঁহার সঙ্গিনী ও সহকারিণী; পুরুষ কঠোর কর্ম্ম, স্ত্রী কোমল হৃদয়—স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া কঠোর মধুর বা কড়ি-কোমল হইয়া সংসারে সাম্য ও সমন্বয় ঘোষণা করিতেছে। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত "যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র

গৌরী” বাক্য আরও সুন্দর, আরও প্রস্ফুট, আরও বিস্তৃত,—কিন্তু যাঁহারা শিব ও গৌরীর রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম, কেবল তাঁহাদিগের পক্ষে। স্ত্রীর সহিত পুরুষের যখন এমন সম্বন্ধ, তখন যাঁহারা সেই স্ত্রীজাতির মুখাবলোকন করিতে নিষেধ করেন, তাঁহারা যে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন—তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল পুরুষ মোক্ষ অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে স্ত্রীজাতি হইতে দূরে থাকা একটা পন্থা হইতে পারে সত্য, কিন্তু মোক্ষাভিলাষিনী স্ত্রীই বা পুরুষের মুখাবলোকন করিবেন কেন ?

মনুষ্যের জীবনে এমন সময় আসে না, যে সময়ে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। উভয়ের সম্বন্ধ কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী সমাজে যেমন স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ অস্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, স্ত্রী পুরুষের প্রকৃত সম্বন্ধ তেমন নহে—উভয়ের সম্বন্ধ ইহ-পরকালের। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রী বা পুরুষ গ্রহণ ও বর্জ্জন ইতর জন্তুর পক্ষে হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে উভয়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন—ইতর জন্তুর মধ্যেও এই সম্বন্ধ অনেক স্থলে কখন বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায় না। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পরেও স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং যাহাতে সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য উভয়ের ব্রত নিয়ম ও অবশেষে সহমরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু এমন বিশ্বাস করেন না যে, ইহজন্মে যে স্ত্রী-পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিল, পরজন্মে তাহারা পৃথক্ হইয়া যাইবে। এই জন্য হিন্দুর বিবাহ কেবল সমাজ বন্ধন নহে, ইহা ধর্ম্মবন্ধনের প্রধান গ্রন্থি। স্ত্রী পুরুষ একত্র না হইলে যেমন সৃষ্টির অভিব্যক্তি ও প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ উভয়ের আধ্যাত্মিক মিলন না হইলে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত ও বিকসিত হয় না। হিন্দু ইহা বুঝেন, এবং বুঝেন বলিয়াই বিবাহ তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব-প্রধান সংস্কার ;—জগতের আর কোন জাতির মধ্যেই বিবাহ বন্ধন এত দৃঢ় ও পবিত্র নহে। ইচ্ছা হইল স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ করিলাম, ইচ্ছা হইল ত্যাগ করিলাম, অথবা একের স্থানে অন্যকে বসাইলাম,—এ নিয়ম তৈজস পত্রের পক্ষে প্রযুজ্য হইতে পারে, মনুষ্যের পক্ষে নহে ;—জগতের মধ্যে হিন্দুই কেবল এ কথা বুঝিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে বিবাহ ধর্ম্মবন্ধন নহে—ধর্ম্মমন্দিরে যাহাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহারা ধর্ম্মমন্দিরের অবমাননা করে। তথায় বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র, প্রকৃত বিবাহের ব্যক্তি-

চার ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃত বিবাহ কেবল সামাজিক বন্ধন নহে—সামাজিক অপেক্ষা পারলৌকিক বন্ধনই বিবাহের মহত্তর উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিশ্লেষ করিলে আমরা চারিটী স্থূল বিভাগ দেখিতে পাই—সকল প্রকার সম্বন্ধই এই চারি বিভাগের অন্তর্গত। সে চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ যথা ক্রমে এই—(১) প্রাকৃতিক বা যৌন, (২) সাংসারিক বা সামাজিক, (৩) মানুষিক এবং (৪) আধ্যাত্মিক। আমরা একে একে এই চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সমাজ গঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী-কালের কোন ইতিহাস নাই—থাকা সম্ভবও নহে। কোন কালে মনুষ্য আর পাঁচ জনের সহিত মিলিত না হইয়া একাকী বাস করিত কিনা, অথবা পুরুষ কেবল আর পাঁচ জন পুরুষের এবং স্ত্রীলোক আর পাঁচ জন স্ত্রীলোকের সহিত একত্রে থাকিত কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই। যে সময় হইতে [illegible]রম্ভ করিয়া মনুষ্যের ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা সভ্যতার সময়— [illegible] ও মনুষ্য স্থষ্টির প্রথম যুগের মনুষ্যে অনেক প্রভেদ। অস [illegible] প্রকৃতি কি প্রকার ছিল তাহা জানিতে হইলে কত [illegible]। অবলম্বন করিয়াই তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তর্ক [illegible]জের মূল অনুসরণ করিতে হয়, আর কতকটা বর্ত্তমান [illegible]মান অসভ্য জাতির প্রকৃতি দেখিয়া অথবা অসভ্য জাতির আচার ব্যবহারের বর্ণনা পাঠ করিয়া জানিতে হয়। মনুষ্য স্থষ্টির প্রথম অবস্থায় তাহার অনেকটা পশু প্রকৃতি ছিল, সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত তাহা লোপ পাইয়াছে; কিন্তু ইতর জন্তু স্থষ্টির প্রথমে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে—বোধ হয়, চিরকাল তদ্রূপই থাকিবে। এমত অবস্থায় পশু প্রকৃতির আলোচনা করিলেই জানা যায়, তাহাদিগের ন্যায় মনুষ্যও কোন কালে একাকী অথবা কেবল আপন জাতির সহিত বাস করে নাই। একাকী বাস করা জীব-প্রকৃতি নহে—মনুষ্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া যে এ নিয়মের অন্যথা করিবে, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। নিকৃষ্ট জীবেই যখন অল্পবিস্তর সামাজিকতা দেখিতে পাওয়া যায়,তখন যে মনুষ্যে সে বৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি, সেই মনুষ্য যে স্থষ্টির প্রথম যুগ হইতেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, তাহাতে আর সংশয় নাই। এক এক দলে কেবল যে পুরুষ বা স্ত্রীলোকই থাকিত, এমন অনুমানের পক্ষেও কোন যুক্তি নাই; কারণ, যাহাদিগকে দেখিয়া আমরা অসভ্যযুগের মনুষ্যপ্রকৃতির বিচার করিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে এ প্রকার ব্যবহার দেখা যায় না। সুতরাং আমরা অতর্কিত রূপে বলিতে পারি, স্ত্রী-পুরুষ স্থষ্টির পর হইতেই পরস্পর একত্র সম্বদ্ধ এবং তাহা না হইলে, বোধ হয় স্থষ্টির অভিপ্রায় ব্যর্থ হইত।

যখন কোন সামাজিক নিয়ম ছিল না, কে কাহার স্বামী বা কে কাহার স্ত্রী তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল না, এবং কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া বাস করিত, তখন, এমন অনুমান অসঙ্গত নহে যে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না এবং তৎপক্ষে কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলার অভাব ছিল। কিন্ত

বাস্তবিক তাহা নহে। এই অসভ্য ও নিয়মশূন্য যুগেও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার পাত্র নির্ব্বাচিত হইত। আহার নির্ব্বাচনের প্রবৃত্তি যেমন সকল জীবে স্বাভাবিক, অর্থাৎ কোন প্রাণীকে যাহা ইচ্ছা খাইতে দিলে সে যেমন তাহা খায় না, তেমনই যৌন নির্ব্বাচনেও সকল প্রাণীর একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে—মনুষ্যের প্রণয়ে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অতি প্রস্ফুট ও পবিত্র পরিণতি। সংসারের যাবতীয় জীবই যে যৌন নির্ব্বাচন করিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করে এমন নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ জীবই, বিশেষতঃ পশু পক্ষী, এই নিয়মের অধীন। ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিবৃত্তির জন্য সম্মুখে যাহাকে পায় তাহারই সহিত সংযুক্ত হয় না—ইতর জন্তুর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ জীবই আপনার নির্ব্বাচিত স্ত্রী বা পুরুষ ব্যতীত অন্যে আসক্ত হয় না। এই যৌন নির্ব্বাচনে সৃষ্টিকর্ত্তার এক অদ্ভুত কৌশল দেখা যায় এবং সমাজ[illegible] একটা মহৎ সত্য আবিষ্কৃত হয়। সে কৌশল এই যে, যৌন নি[illegible]চেষ্ট, স্ত্রী তত নহে। পুরুষ যাহাকে আপনার যোগ্যা ব[illegible]স স্ত্রী যদি ঐ পুরুষের সহবাসে সম্মত না হয় তাহা [illegible]খ্যান করে মাত্র, কিন্তু স্বয়ং সচেষ্ট হইয়া কদাচিৎ পুরু[illegible]। কোন কোন জন্তু পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা বলবতী হইলে [illegible]দান করে এবং সম্মুখে যাহাকে পায় তাহারই সহিত সংযুক্ত হয় সত্য, কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। সাধারণ নিয়মে পুরুষ যত স্ত্রী নির্ব্বাচনে সচেষ্ট, স্ত্রী ততটা পুরুষ নির্ব্বাচনে সচেষ্ট নহে। সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নিতান্ত অযোগ্য না হইলে স্ত্রী যে কোন পুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারে—পুরুষ সক্রিয়, স্ত্রী অক্রিয়, অথবা পুরুষ কর্ত্তা, স্ত্রী কর্ম্ম। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রকৃতি যে সমান নহে, এই নৈসর্গিক ক্রিয়া হইতে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ নিয়মে পুরুষ আকর্ষণ করে, স্ত্রী আকৃষ্ট হয়,—পুরুষ চলায়, স্ত্রী চলে,—পুরুষ আশ্রয়, স্ত্রী আশ্রিতা। সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের পক্ষে আনুগত্য করা ও অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলা যে বিধাতার অভিপ্রেত তাহা এই যৌন নির্ব্বাচন ব্যাপার হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষ যে সর্ব্বথা স্ত্রীজাতির উপর পাশব বল প্রয়োগে অধিকারী—ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হয় না; কারণ এই যৌন নির্ব্বাচন ব্যাপারে পুরুষ অধিক সচেষ্ট হইলেও স্ত্রীজাতির সম্মতি সাপেক্ষ। যাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সুখসৌকর্য্য বৃদ্ধি পায় এবং সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, তাহাই বিধাতার উদ্দেশ্য। যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দিয়া তাহাদিগকে পুরুষ করিতে চাহেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত এবং তাঁহাদিগের যত্ন ও পরিশ্রম সমস্তই পণ্ড হইতেছে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত অনেক বিষয়ে স্ত্রীজাতি পুরুষের প্রতিযোগী হইতে পারে সত্য, কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় সমাজের মঙ্গল হইবে না, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা স্ত্রীকে পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই—মূলে কেহ কাহারও প্রতিযোগী নহে।

পরিশিষ্ট

শিলং সাহিত্য-সভা।

সপ্তদশ সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

সূচনা।—মঙ্গলময়ের কৃপায় 'সাহিত্য-সভা' আজি সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশে উপনীত হইল। অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সভা সাধ্যমত আপন কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করে নাই, তবে তাহা সাধারণের পরিতৃপ্তি সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা সমাগত সভ্যমণ্ডলীর বিবেচ্য।

সভার কার্য্য পরিচালনা পক্ষে অন্যতর সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র সিংহ মহাশয়দ্বয়ের যত্নের কোনরূপ ত্রুটী ঘটে নাই; অধিকন্তু, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্থানীয় Indian club এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধু সেন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সভার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। উপরি-লিখিত সকলের নিকটেই সভা অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল।

সমালোচনী শাখা।—ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক যে প্রবন্ধ রচনা ও পুস্তক সমালোচনার ব্যবস্থা ছিল, অবস্থা-সূত্রে মধ্যে তৎপক্ষে এক অন্তরায় ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, উক্ত কার্য্য নিয়ম ও দক্ষতার সহিত পুনঃ পরিচালিত হইবার উদ্দেশে, সমালোচ্য বর্ষের ৭ই এপ্রেল তারিখে "সমালোচনী শাখা" নামে সভার একটী সমিতি সংগঠিত হয়, এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন :—

১। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস, এম্, এ।
২। „ জ্ঞানরঞ্জন গুহ, বি,এ।
৩। „ পাঁচকড়ি ঘোষ।
৪। „ সিদ্ধেশ্বর রায়।
৫। „ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৬। „ বিভুপ্রসন্ন বসু।
৭। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম, এ।
৮। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ, বি,এ।
৯। „ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১০। „ চারুচন্দ্র গোস্বামী।
১১। „ নিশিকুমার ঘোষ।
১২। „ সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি,এ।
এবং ১৩। সাহিত্য-সভার সম্পাদক।

ইহাঁদিগের রচিত প্রবন্ধ সকল "জন্মভূমি," "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা" "অনুসন্ধান," "পূর্ণিমা," প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সভার এই অভিনব কার্য্য পরিচালনা পক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-সেবক।—উক্ত সমালোচনী শাখার কার্য্য প্রায় সার্দ্ধ তিন মাস কাল অল্প মাত্রায় চলে বটে, কিন্তু তাহা কোন ক্রমেই আশানুরূপ না হওয়ায়, উক্ত কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি ও সভার আন্তরিক সংকল্প সংসিদ্ধির জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্য বোধে, বিশেষ বিবেচনার পর, বিগত ১০ই নভেম্বরের সাধারণ সমিতির অধিবেশনে, সভা হইতে সাহিত্য-সেবক নামধেয় একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র প্রকাশ করা স্থির হয়। সেই "সাহিত্য-সেবকে"র প্রথম সংখ্যা আজি সাহিত্য সভার জন্মোৎসব উপলক্ষে, সমাগত সভ্যমণ্ডলী সকাশে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়া হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদ্ভূত হইতেছে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের বিবেচ্য। 'সাহিত্য-সেবকে'র উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উহার 'নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সভার একাদশ সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণীতে উল্লেখিত হইয়াছিল,—"সাহিত্য-সভা যখন স্বয়ং সাহিত্য-সমালোচনের মুখপত্র হইতে পারিবে, তখনই বুঝিব—ইহার চরম লক্ষ্য সংসাধিত হইল।"—অধুনা, 'সাহিত্য-সেবকে'র দ্বারা সেই লক্ষ্য সংসাধনের পথ উন্মুক্ত হইল,—ইহা সভার পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে, 'সেবক' যাহাতে আত্মগৌরব সংরক্ষণে ও মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে সমর্থ হয়, ভগবৎ সমীপে ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। পরন্তু, আসাম হইতে বঙ্গ সাহিত্যের অনুশীলন কল্পে এই

প্রথম ও প্রকৃষ্ট উদ্যোগ ; সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই ইহাতে সহানুভূতি ও সহায়তা বাঞ্ছনীয়।

যে সকল কৃতবিদ্য মহোদয়গণের উৎসাহ ও উদ্যোগে 'সাহিত্য-সেবকে'র আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচকড়ি বাবুই সর্ব্বপ্রধান। এই নবজাত "সেবকে"র সৌষ্ঠব কামনায় তিনি যেরূপ কায়মনোবাক্যে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্য সভা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত স্থানীয় ও বিদেশীয় লেখক ও অনুগ্রাহক বর্গ 'সেবকে'র পরিচালনা কল্পে, স্বতঃ পরতঃ, সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ; সাহিত্য-সভা ইঁহাদিগের নিকটেও বিশেষ ভাবে ঋণী।

স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য,বিদ্যাবিনোদ, এম, এ।
„ রেবতীমোহন দাস, এম, এ।
„ জ্ঞানরঞ্জন গুহ, বি,এ।
„ মনোমোহন রায়, বি, এ।
„ অশ্বিনীকুমার গুহ, বি, এ।
„ সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি,এ।
„ অভয়াশঙ্কর গুহ।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ তারিণীচরণ নন্দী।
„ তারানাথ চৌধুরী।
„ করুণাসিন্ধু সেন।
„ মুকুন্দলাল দেব।
„ দীননাথ বিশ্বাস।

বিদেশীয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী।
শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।
„ অম্বুজাসুন্দরী দাস।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল্।
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, এম-বি।
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সোম, এম্-এ, বি-এল্।
„ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এ।
„ সিদ্ধেশ্বর রায়।
„ হরিচরণ রায়।
„ অক্ষয়কুমার ঘোষ, বি-এল্।

পরন্তু, যে সকল মহানুভব 'সেবকে'র উন্নতি কামনায় অর্থানুকূল্য করিয়াছেন বা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটও সভা আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসূত্রে জড়িত। বস্তুতঃ, তাঁহাদিগের আনুকূল্য ব্যতিরেকে 'সেবকে'র

উৎপত্তি একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িত। ইহাঁদের নাম সাদরে বিবরণীর শেষে সংযোজিত হইল।

সাহিত্যের লাভ ও ক্ষতি।—বর্ষ শেষে বঙ্গসাহিত্যের লাভালাভ-নির্ণয় প্রসঙ্গ গত বৎসর 'সাহিত্য-সভা'র বিবরণীতে প্রথম উত্থাপিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে, তদনন্তর 'সাহিত্য-সেবকে'র আবির্ভাব ঘটায় অতঃপর ঐ প্রসঙ্গ 'সেবকে'রই আলোচনাধীন করা হইল। অনুসন্ধিৎসু মহোদয়গণ 'সেবকে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় উহা দেখিতে পাইবেন।

বিদ্যাসাগর পারিতোষিক।—সভার নিয়মানুসারে উহার "বিদ্যা-সাগর-স্মৃতি"-তহবিল হইতে অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের ১৮৯৩—৯৪ খৃষ্টাব্দের নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছাত্রী শ্রীমতী অহিদন্ নেছাকে, সভা হইতে প্রকাশিত, এবং সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ প্রণীত, "প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি" নামক পুস্তক, স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রবরের স্মরণার্থ পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ পারিতোষিক বিতরণের দিন যথাসময়ে সভার গোচর না করায়, এতদর্থে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার অবসর পাওয়া যায় নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎ-প্রতি দৃষ্টি রাখেন,—একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্যবর্ষে সভার এই স্বতন্ত্র রক্ষিত ক্ষুদ্র তহবিলে কেহ কিছুই দান করেন নাই।

সভ্য।—৬৪ জন সভ্য লইয়া সমালোচ্য বর্ষের কার্য্য আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে ২জন, নিয়মিত চাঁদা না দেওয়াতে, সভার নিয়মানুসারে, সভার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। অবশিষ্ট ৬২ জনের মধ্যে একজন পীড়িত হওয়ায়, ৫ জন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর গমন করাতে, এবং ৩ জন স্বেচ্ছায়, সভার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেও, পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় সভাকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, বরং নবাগত সভ্যগণ কর্ত্তৃক সভার সভ্য সংখ্যা সমধিক পরিবর্দ্ধিতই হইয়াছে।

বর্ষশেষে সমগ্র সভ্যগণের নামের তালিকা, পূর্ব্বাপর প্রথামত, পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল।

অধিবেশন।—'সাহিত্য-সেবকে'র অভ্যুদয়ে আলোচ্য বর্ষের অধি-

বেশন সংখ্যা, অন্যান্য বর্ষের তুলনায়, অনেক অধিক হইয়াছে। শ্রেণী-বিভাগ ও উদ্দেশ্য অনুসারে নিম্নে অধিবেশনগুলির এক তালিকা প্রদত্ত হইল :—

সাধারণ—

বার্ষিক উৎসব ...	...	১
সাহিত্য-সেবক ...	...	৩
কার্য্য-নির্ব্বাহক সমালোচনী শাখা	...	১
নিত্য কর্ম্ম ...	...	২
বিশেষ—		
সাহিত্য-সেবক-পরিচালন ...	...	১
ঐ সম্পাদক-সমিতি ...	...	২
	সর্ব্বসমেত	১০

উল্লিখিত অধিবেশন সমূহে সভ্যগণ নৈমিত্তিক কার্য্যে অধিকতর লিপ্ত থাকায়, সভার নিত্য পুস্তক-নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পাদকগণের সম্পূর্ণ দায়িত্বে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে।

গ্রন্থ-সংগ্রহ।—আলোচ্যবর্ষে কোন্ শ্রেণীর কতগুলি পুস্তক কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক শ্রেণীব সর্ব্বসমেত কত পুস্তকই বা এক্ষণে সভার গ্রন্থাগার পরিশোভিত করিতেছে, নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে—

শ্রেণী	আলোচ্যবর্ষে সংগৃহীত			বর্ষ শেষে সভার গ্রন্থ সমষ্টি
	ক্রীত	উপহার প্রাপ্ত	সমষ্টি	
শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুস্তক	১৪	১	১৫	১৪৭
দর্শন বিজ্ঞান ও শিল্প	১	০	১	৬৭
সাধারণ সাহিত্য	১৬	২	১৮	২১২
কাব্য	৯	২	১১	২০৮
ইতিহাস	০	০	০	৩১
জীবনচরিত	৭	০	৭	৮৭
নবন্যাস ও উপাখ্যান	১৪	৩	১৭	৩০২
নাটক ও প্রহসন	৪	২	৬	২০৯
সমষ্টি { আলোচ্যবর্ষের	৬৫	১০	৭৫	১২৯৩
সমষ্টি { পূর্ব্ববর্ষের	৮১	২৫	১০৬	১২১৮

পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় আলোচ্যবর্ষে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা অনেক ন্যূন হইলেও, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সভার সংগ্রহোপযোগী প্রায় সমস্ত নব প্রকাশিত গ্রন্থই সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার দেওয়ার নিমিত্ত সভা নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট ঋণী :—

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বসাক—দমদমা।
" শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।
" প্রসন্নচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি-এ—গৌহাটী।
" পাঁচকড়ি ঘোষ।
" জ্ঞানরঞ্জন গুহ।
" রায় যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম-এ, বি-এল—শ্রীহট্ট।

শ্রীযুক্ত তারানাথ চৌধুরী।
" শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
" নবগোপাল মিত্র।
" শিলং থিয়েটার সম্পাদক।
" কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব বিবরণী বিজ্ঞাপিত সাময়িক পত্রসমূহ ব্যতিরেকে আলোচ্য বর্ষে দাসী, ভারতী, বাসনা ও বামাবোধিনী—এই চারিখানি পত্র অতিরিক্ত সংগ্রহ করা গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই বর্ষে 'সাধনার' বিলোপ ঘটিয়াছে, 'পুরোহিত' 'অনুশীলনে' সংলিপ্ত হইয়াছেন, 'জ্যোতিঃ' একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, এবং 'অনুসন্ধানে'রও মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে।

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।—সাহিত্যানুরাগী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে" বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধুনা "বঙ্গীয় পরিষদ"র এই গুরুতম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরিষদ এ কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও, একের দ্বারা তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া একরূপ অসম্ভব। বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই আপনাপন সাধ্যমত এই কার্য্যে যোগ দান করেন,—একান্ত বাঞ্ছনীয়। 'সাহিত্য-সভার' শক্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ইহা যথাসম্ভব এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং ইতিমধ্যেই, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাবিষ্ণু ঘটক মহাশয়ের আনুকূল্যে স্বর্গীয় জগৎরাম রায় বিরচিত "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামক অতি

প্রাচীন ও মনোরম কাব্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া অনেক পরিমাণে কৃতার্থ হইয়াছে। ইহা সাধারণে প্রকাশ করিবার ভার সম্প্রতি 'সাহিত্য-সেবকে'র হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, এবং কালক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার পক্ষেও সভার বিশেষ লক্ষ্য রহিয়াছে। "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" ও তাহার রচয়িতার পরিচয় অনুসন্ধিৎসু সভ্যগণ 'সাহিত্য-সেবকে'র প্রথম খণ্ড পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

গ্রন্থ পাঠ।—আলোচ্য বর্ষে পাঠকগণ কোন্ শ্রেণীর পুস্তক কি পরিমাণে পাঠ করিয়াছেন, নিম্নবর্ত্তী তালিকায় তাহার হিসাব প্রদর্শিত হইল—

শ্রেণী।	আলোচ্যবর্ষে	পূর্ব্ববর্ষের তুলনায়	
		অধিক	অল্প
শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুস্তক	৩৫০	৬০	—
দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প	৬০	—	১৯
সাধারণ সাহিত্য	৪২১	১১৫	—
কাব্য	১২০	—	১১
ইতিহাস	৪৫	—	২৬
জীবন চরিত	১২০	১৭	—
নাটক ও প্রহসন	২২২	৫৪	—
নবন্যাস ও উপাখ্যান	১০২৪	—	২৯

আনন্দের বিষয় যে, সভ্যগণের "শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুস্তক"-পাঠ লিপ্সা অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি এখানে একটী সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় সভ্যগণের অধিকতর ধর্ম্মানুরাগ লক্ষিত হইতেছে; সাহিত্য-সভার ধর্ম্মপুস্তক মধ্যে মধ্যে এই সভায় পঠিত হইয়া থাকে। "সাধারণ সাহিত্য"-পাঠকের সংখ্যাধিক্য সভ্যগণের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধির লক্ষণ, সন্দেহ নাই। পরন্তু, 'নাটক ও প্রহসন' পাঠাধিক্যের কারণ অত্রত্য নাট্য-সমাজের কৃতিত্বের উপর অনেক পরিমাণে, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত সাধারণের গোচর করা যাইতেছে যে, শাস্ত্র ও ধর্ম্ম গ্রন্থের পুষ্টি সাধনোদ্দেশে শ্রীহট্টনিবাসী মহানুভব রায় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র

রায় বাহাদুর সম্প্রতি পঞ্চাশৎ মুদ্রা এককালীন দানে ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাকে বিশেষ উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য পালন করিতে সভার চেষ্টার ক্রটী হইবে না। রায় বাহাদুর মহাশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপ সৎকার্য্যে নিরত থাকেন, ভগবানের নিকট সভার ইহা ঐকান্তিক কামনা। এরূপ এককালীন প্রাপ্তি সভার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই।

আয় ব্যয়।—নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বিগত বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব অবগত হওয়া যাইবে।

আয়।

গতবর্ষের মজুদ—	
সাহিত্য-সভার তহবিল	১১৩৸/১০
বিদ্যাসাগর স্মৃতি তহবিল	৩৬৸৵০
আলোচ্য বর্ষের আদায়—	
এককালীনদান — সাহিত্য-সভা	৬৫৲
এককালীনদান — সাহিত্য-সেবক	৭৯৷৷০
মাসিক বৃত্তি	১৯৯৷৷০
মজুদ টাকার সুদ—	
সাহিত্য-সভা	৩৷/৫
বিদ্যাসাগর স্মৃতি	৸৶৫
উৎসব উপলক্ষে বিশেষ বৃত্তি	২২৷০
বিবিধ	১৲
মোট—	৫২২৷০

ব্যয়।

পুস্তক—	
খরিদ	৭৭৶১০
বাঁধাই	১২৲
ভৃত্যের বেতন	৩২৸৶৫
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ...	৪৷৫
ডাকব্যয় — সাহিত্য-সভা	৪৷৷৶১৫
ডাকব্যয় — সাহিত্য-সেবক	১৸৶০
মুদ্রাঙ্কন—	
ষোড়শ সাম্বৎসরিক বিবরণী ও নূতন পুস্তক তালিকা	২৩৷০
বৃত্তি আদায় ও পুস্তক আদান-প্রদানের তালিকা (বক্রী)	৫৲
সাহিত্য-সেবক পত্রিকা (আংশিক)	১০৲
বার্ষিক উৎসব	৩৮৵১০
গৃহ সংস্কার	৮৷/৫
বিদ্যাসাগর পারিতোষিক	৷৷০
'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' সংগ্রহ	১৩৷/০
বিবিধ	৩৶১০
	২৩৪৸৵০
মজুদ—	
সাহিত্য সভা	১৮২৷৶১৫
বিদ্যাসাগর স্মৃতি	৩৭৷/৫
সাহিত্য সেবক	৬৭৷৷/০
	২৮৭৷৵০
মোট	৫২২৷০

পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় দেখা যায় যে, এ বৎসর এককালীন দানের মাত্রা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিবরণীর পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত রায় বাহাদুর মহাশয়ের দানই ইহার কারণ বলিতে হইবে। মাসিক বৃত্তি পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন হইলেও আশানুরূপ বলা যাইতে পারে। "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" সংগ্রহের খরচ লইয়া এ বৎসর পুস্তকাধ্যায়ে ১০২॥০ ব্যয় হইয়াছে। "সাহিত্য-সেবক" ও "বিদ্যাসাগর" তহবিল বাদে, বর্ষ শেষে সভার নিজ তহবিলে ১৮২।৶১৫ সংস্থান রহিয়াছে,—ইহা সভার পক্ষে আশানুরূপ, সন্দেহ নাই।

উপসংহার।—অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল কথাই বোধ হয়, সংক্ষেপে বলা হইল; এখন সভা ও সভ্যগণের প্রতি বিধাতার অক্ষুণ্ণ কৃপাদৃষ্টি থাকে,—ইহাই আজিকার শেষ প্রার্থনা।

সাহিত্য-সভা;
কুইণ্টন হল।
১৩০২—১৮ই পৌষ।

শ্রীহরিচরণ সেন,
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট।

(ক)

"সাহিত্য সেবক" পরিচালনার ব্যয় সংকুলনার্থ যাঁহারা একালীন দান করিয়াছেন ও করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন—তাঁহাদের নাম।

শ্রীযুক্ত রায় ভুবনমোহন বসু বাহাদুর-সি-ই।
" রায় শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম-এ, বি-এল।
" কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া।
" দীননাথ বিশ্বাস।
" প্রকাশচন্দ্র দেব।
" সংসারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" ললিতমোহন লাহিড়ী বি-এল।
" অভয়শঙ্কর গুহ।
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" হরিচরণ সেন।
" পাঁচকড়ি ঘোষ।
" শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
" কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
" মুন্সী মহম্মদ আসান উল্লা।
" হরিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।
" প্রকাশচন্দ্র রায়চৌধুরী।
" বিপিনবিহারী সেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।
" শরচ্চন্দ্র রায়।
" করুণাসিন্ধু সেন।
" তারকনাথ রায়।
" চণ্ডীচরণ দাস।
" ভিবিরাম বড়ুয়া।
" প্রসন্নকুমার বসু।
" রাসবিহারী দাস।
" নিশিকুমার ঘোষ।
" কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
" প্রসন্নকুমার দত্ত।
" বিভুপ্রসন্ন বসু।
" কৈলাসচন্দ্র সেন।
" শরচ্চন্দ্র ধর।
" উমাচরণ দত্ত।
" নগেন্দ্রনাথ সরকার।
" শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" নবগোপাল মিত্র।
" ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায়।
" রামকানাই সেন।
" মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

শ্রীযুক্ত নবকিশোর দে।
„ মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
„ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সারদাপ্রসাদ ভঞ্জ।
„ গোপালচন্দ্র বসু।
„ রাখালদাস সোম।
„ কামাখ্যাচরণ ঘোষাল।
„ কৃষ্ণচন্দ্র দাস।
„ খড়্গাধর বড়া।
„ প্রিয়লাল বড়ুয়া।
„ ভুতনাথ দাস।
„ প্রসন্নকুমার দত্ত।
„ তারিণীচরণ নন্দী।
„ দক্ষিণাচরণ নন্দী।
„ শ্রীকৃষ্ণ দে।
„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ প্রতাপচন্দ্র বসু।
„ গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায়।
„ নিমাইচরণ ঘোষ।
মুন্সী রহমন গণি।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দেব।
„ তারানাথ চৌধুরী।
„ সতীশচন্দ্র রায়।
„ বিহারিলাল দে।
„ রাধাচরণ দাস।
„ মদনমোহন দেব।
„ দীননাথ দাস, বি-এ।
„ রাধানাথ গুপ্ত।
„ কৈলাসচন্দ্র চন্দ।
„ রাজকুমার দাস।

শ্রীযুক্ত তারিণীচন্দ্র দত্ত।
„ পার্ব্বতীশঙ্কর কর, বি-এ।
„ রাজকুমার নন্দী।
„ কাশীচন্দ্র সেন।
„ গিরীশচন্দ্র সেন।
„ কালীকিঙ্কর দাস।
„ করুণাকান্ত দাস গুপ্ত, বি-এ।
„ জ্ঞানরঞ্জন গুহ, বি-এ।
„ রামচন্দ্র দত্ত।
„ ইন্দুহরণ মুখোপাধ্যায়।
„ কমলচরণ দত্ত।
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
„ তারকনাথ দত্ত।
„ রামদয়াল শর্ম্মা।
„ গগনচন্দ্র শর্ম্মা।
„ সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি-এ।
„ প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ।
„ বাণীচন্দ্র নন্দী।
„ নকুলচন্দ্র সেনগুপ্ত।
„ রসিকলাল সুর।
„ অন্নদাপ্রসাদ সুর।
„ মাখনলাল ঘোষ।
„ কৈলাসচন্দ্র দাস।
„ নবগোপাল দত্ত।
„ রামগতি দাস।
„ রাজচন্দ্র চৌধুরী।
„ ব্রজেন্দ্রনাথ সেন।
„ কৃষ্ণলাল ঘোষ।
„ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা।
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" রামদাস ভাদুড়ী।
" গঙ্গেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" দীননাথ মুখোপাধ্যায়।
" কুশদেব বসু।
" চারুচন্দ্র গোস্বামী।
" নন্দলাল মিত্র।
" কালীকুমার চৌধুরী।
" চন্দ্রমোহন দে।
" শিবনাথ দত্ত।
" পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ।
" শরচ্চন্দ্র দে।
" নন্দকিশোর ধর।
" প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী।
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ, বি,এ।
" জগদীশচন্দ্র বসু।
" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" বিপিনবিহারী মজুমদার।
" গোবিন্দচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি-এল্।
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
" উমেশচন্দ্র দত্ত।
" শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রাধিকামোহন ঘোষ।
" রামদাস ব্রহ্ম।
" সিদ্ধেশ্বর রায়।
" সারদাচরণ দাস।
" রেবতীমোহন দাস, এম্-এ।
" কুবেরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" রত্নেশ্বর ঠাকুর।
" গঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" গঙ্গাসিংহ দাস।
" গোপালচন্দ্র সিংহ।

পরিশিষ্ট।

(খ)

বর্ষশেষে সভ্যগণের তালিকা।

(অ) সম্পাদক সমিতি।

১। শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন।
২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ।

(আ) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
২। ,, বিভুপ্রসন্ন বসু।
৩। ,, করুণাসিন্ধু সেন।
৪। ,, নিশিকুমার ঘোষ।
৫। ,, চারুচন্দ্র গোস্বামী।
৬। ,, বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী।
৭। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার।
৮। মুন্সী মহম্মদ আসান উল্লা।
৯। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ, বি-এ।
১০। ,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১১। ,, বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। ,, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম-এ।

(ই) অন্যান্য সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দেব।
২। ,, প্রিয়লাল বড়ুয়া।
৩। ,, অমরচন্দ্র পুরকায়স্থ।
৪। ,, প্রসন্নকুমার বসু।
৫। ,, বরদাচরণ মিত্র।
৬। ,, কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া।
৭। ,, শরচ্চন্দ্র দেব।
৮। ,, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।
৯। ,, গঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ ঘোষাল।
১১। ,, সদানন্দ চৌধুরী।
১২। ,, নন্দকিশোর ধর।
১৩। ,, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
১৪। ,, প্রতাপচন্দ্র বসু।
১৫। ,, প্রসন্নকুমার দত্ত।
১৬। ,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৭। ,, তারকনাথ রায়।
১৮। ,, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু।
২০। „ সারদাপ্রসাদ ভঞ্জ।
২১। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
২২। „ যোগেশ্বর বড়কটকী।
২৩। „ নন্দলাল মিত্র।
২৪। মুন্সী মহম্মদ ইলাহি বক্‌স।
২৫। শ্রীযুক্ত ইন্দুহরণ মুখোপাধ্যায়।
২৬। „ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৭। „ তারানাথ চৌধুরী।
২৮। „ দীননাথ মুখোপাধ্যায়।
২৯। „ হরিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩০। „ মথুরানাথ নন্দী, বি-এ।
৩১। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন।
৩২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩৩। „ শম্ভুরাম বড়া।
৩৪। „ সতীশচন্দ্র রায়।
৩৫। „ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৬। „ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৭। „ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।
৩৮। „ কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩৯। „ সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি-এ।
৪০। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু।
৪১। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৪২। „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
৪৩। „ রাখালদাস সোম।
৪৪। „ প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী।
৪৫। „ গঙ্গেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৪৬। „ সংসারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৭। „ কুশদেব বসু।
৪৮। „ গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। „ রামদয়াল ভট্টাচার্য্য।
৫০। „ মুকুন্দলাল দেব।
৫১। „ ললিতমোহন লাহিড়ী, বি-এল্।
৫২। „ শুভ্রেন্দুমোহন গোস্বামী।
৫৩। „ ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার।
৫৪। „ পাঁচকড়ি ঘোষ।
৫৫। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ।
৫৬। „ জ্ঞানরঞ্জন গুহ, বি-এ।
৫৭। „ দীননাথ বিশ্বাস।
৫৮। „ কৈলাসচন্দ্র সেন।
৫৯। „ লালমাধব বসু।
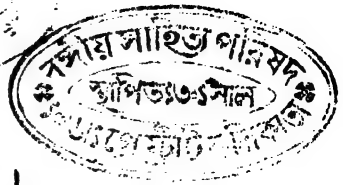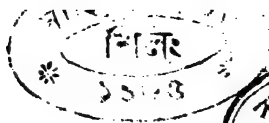
রূপ-নারায়ণ।

আসাম জঙ্গলাভূমি, এখানে বুঝি ভাল লোক জন্মে না,—এই ভ্রান্ত মত অনেককেই পোষণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আসাম জঙ্গলাভূমি হউক,—রত্নের অভাব সেখানে নাই, আসাম রত্নহীন নহে। ঘন ঘোর অরণ্যই অগুরুর আকর, গুপ্ত খণিতেই রত্ন মিলে। অদ্য আমরা ঐরূপ একটি রত্নের পরিচয় দিব। প্রাচীন বৈষ্ণবকবির অমর তুলিকায় ইহাঁর চিত্র সুচারুরূপেই চিত্রিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কামরূপ আসামের একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল, কামরূপের রাজধানীর নাম এগারসিন্দুর।* এগারসিন্দুর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত, ইহার নিকটেই ভাটাদিয়া নামক গ্রামে শকাব্দ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রূপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রূপচন্দ্র বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-তনয়; তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী, মাতার নাম কমলাদেবী।

রূপচন্দ্র পিতামাতার একমাত্র সন্তান, সুতরাং "আদুরে-ছেলে।" আদুরে-ছেলে সচরাচর যেমন হয়, রূপচন্দ্রও তেমনি হইলেন। সর্ব্বদা চাঞ্চল্য,—লেখা পড়ায় মনোযোগ নাই। রূপের বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু স্বভাব

---

* "বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতি শুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ॥
সে দেশের রাজধানী এগারসিন্দুর।
ব্রহ্মপুত্র পারে স্থিত অতি মনোহর॥
এগারসিন্দুর আর মিরজাফরপুর।
দগ্‌গদা কুটীশ্বর আর হোসেনপুর॥
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে এ সব স্থান হয়।
নানাদেশী লোক তাতে বাণিজ্য করয়॥
এগারসিন্দুর আর দগ্‌গদা স্থানে।
বাণিজ্য বিশেষ খ্যাত সর্ব্বলোকে জানে॥"
ইত্যাদি—প্রেমবিলাস।

পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। একদিন তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া ভোজনকালে রূপের অন্নে ছাইমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"তোমার ছাই ভক্ষণই উপযুক্ত।" পিতার ব্যবহারে রূপের মনে সন্তাপ জন্মিল, তিনি আর খাইলেন না, হাত ধুইয়া তখনই নিকটবর্ত্তী পণ্ডিতের বাড়ী চলিয়া গেলেন; আর বাড়ী আসিলেন না, সেই পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব প্রতিভা অসাধারণ যত্নের সাহায্য পাইল,—অল্পকাল মধ্যেই রূপের ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। তখন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য রূপ নবদ্বীপ গমন করিলেন, এবং সেইরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে অল্পকালেই ন্যায়শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

নবদ্বীপের পাঠ, যথাসময়ে সমাপ্ত হইল; নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ পূর্ব্ব-দেশীয় একটি ব্রাহ্মণ বালকের প্রতিভায় বিস্মিত হইলেন। এই সময়েই নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ তাঁহাকে "আচার্য্য" উপাধি প্রদান করেন। যখন রূপচন্দ্র নবদ্বীপে প্রতিপত্তি লাভ করেন, তখন সেখানে রঘুনাথ, রঘুনন্দন, ভবানন্দ,কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি বিরাজিত,—সে ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে, রূপচন্দ্রের নাম কাজেই গুপ্ত রহিল না, তিনি একজন বড় পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইলেন।

সাধারণতঃ তর্কশাস্ত্র পাঠে যাহা ঘটে, রূপচন্দ্রেরও তাহা হইল; রূপচন্দ্র প্রায় নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। তবে ভক্তির কোমলতায় তাঁহার মন যে একবারে মুগ্ধ হইত না, তাহা নহে। বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তি-ধর্ম্ম তখন অবহেলার মধ্যে ছিল না, তখন সমস্ত বঙ্গভূমি গৌরাঙ্গের প্রেমে টলমল করিতেছিল। নবদ্বীপের ত কথাই নাই, নবদ্বীপ গৌরপার্ষদগণে পরিপূর্ণ। বড় বড় পণ্ডিতগণ, এমন কি, রঘুনাথ প্রভৃতির গুরু স্বয়ং বাসুদেব সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত তখন গৌরাঙ্গের শরণ লইয়াছেন। তখন মহাপ্রভু বর্ত্তমান; সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তিনি নীলাচলে অবস্থিতি করিতেছেন।

নবদ্বীপের পাঠ সমাপ্ত হইলে রূপচন্দ্র বেদ অধ্যয়নের জন্য পুনা নগরে যাত্রা করিলেন। গৌরাঙ্গের নাম তখন ভারতব্যাপ্ত। রূপচন্দ্রের বড় ইচ্ছা, একবার শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়া যান। তাঁহাদেরই ন্যায় একটি ব্রাহ্মণ-তনয় কি শক্তিতে ভগবানের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছেন, একটি ব্রাহ্মণ বালক এরূপ কি শক্তি ধারণ করেন, যাহার বলে বৃদ্ধ অদ্বৈতের ন্যায় জ্ঞানী এবং প্রকাশানন্দ ও সার্ব্বভৌমের ন্যায় দার্শনিক পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, দেখিতে রূপের কৌতূহল হইবে,—বিচিত্র নহে।

রূপচন্দ্র পুনা যাইবেন, নীলাচল দিয়াই তিনি যাইতে মানস করিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের যত না আদর, রূপচন্দ্র দেখিলেন, নীলাচলে ততোধিক। এমন কি, স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার পদানত। রূপচন্দ্র দেখিলেন, নদীয়ার নবীন উদাসীন চিরপূজিত জগন্নাথের স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রূপ গৌরদর্শনে চলিলেন। রূপ যখন মহাপ্রভুকে দেখিতে গেলেন, প্রভু ভক্তগণের সহিত তখন সংকীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন, কাজেই রূপ প্রভুর সহিত আলাপ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, মহাপ্রভুকে দেখিয়া রূপের তর্কনিষ্ঠ কঠোর চিত্ত কি জানি কি কারণে আর্দ্র হইয়া গেল,—রূপ সেই কীর্ত্তনের ভাবে বিমুগ্ধ হইলেন, মহাপ্রভু যে অসীম শক্তিধর তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল,—তিনি ভূপতিত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। রূপচন্দ্রের অভিলাষ পূর্ণ হইল, তখন "অচল ব্রহ্ম" জগন্নাথ দেবকে দর্শনান্তর তিনি মহারাষ্ট্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রূপচন্দ্রের একটি শক্তি ছিল,—যাহা একবার শুনিতেন, তাহা কদাপি ভুলিতেন না। নবদ্বীপে তাঁহার "শ্রুতিধর" নামটি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে পুনানগরেও তাঁহার এই খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—অধিকন্তু, বেদ বেদাঙ্গে প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি "অধ্যাপক" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর রূপ "দিগ্বিজয়ে" বহির্গত হইলেন।

ন্যায়ের রাজধানী নবদ্বীপ ও বেদ বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ পুনানগরীতে ঈদৃশী খ্যাতি লাভ করিয়া রূপ যেখানে কোন পণ্ডিতের নাম শুনেন, তাঁহার কাছে অমনি বিচারার্থ উপস্থিত হন;—"হয় বিচার কর, নয় 'জয়পত্র' দাও।" এইরূপে তিনি বিচারে অসংখ্য পণ্ডিত পরাস্ত করিয়া অবশেষে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়াই তিনি শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর নাম শুনিতে পাইলেন। রূপ সনাতনের প্রশংসা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর বড় আনন্দ জন্মিল,—"তবে এতদিনে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলাম।" এই ভাবিয়া আনন্দভরে দিগ্বিজয়ী বৃন্দাবনের নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন তখন 'নিবিড় কাননই' ছিল।

যখন রূপচন্দ্র সনাতন গোস্বামীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। রূপ-সনাতনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন লক্ষণই দেখিলেন না। কোথায় জিগীষাপরায়ণ পণ্ডিত পাইবেন, না দেখেন

যে, রূপ ও সনাতন বিনয়ের খনি,—অভিমান মাত্র নাই, ছেঁড়া কাঁথা গায়। কিন্তু যখন আসিয়াছেন, তখন একটা কিছু করিয়াই যাইবেন, মনে করিলেন।

প্রথমতঃ ভদ্রোচিত ব্যবহার—সাদর সম্ভাষণাদি হইল। সনাতন, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলে রূপচন্দ্র কহিলেন, "মথুরায় আপনাদের খ্যাতি শুনিয়া দেখিতে আসিলাম; আপনাদের ব্যবহারে আমি যথার্থই মুগ্ধ হইয়াছি, এখন অভিলাষ—আমার সহিত কিছু শাস্ত্রালাপ করুন।" পরে কিঞ্চিৎ গর্ব্বভরে বলিলেন—"আমি নানা স্থানের পণ্ডিতগণকে দেখিয়াছি, কিন্তু বিচারের প্রতিদ্বন্দ্বী এ পর্য্যন্ত পাই নাই।"

রূপ ও সনাতন অভিপ্রায় বুঝিলেন, কিন্তু বিচার করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইল না। যিনি ভক্তির মধুময় পীযূষ আস্বাদনে বিভোর, তর্কের কটু কষায় পানীয় কেন তিনি পান করিতে যাইবেন? কাজেই—

"গোস্বামীরা কহে, বিচারে কিবা ফলোদয়?"

তখন—

"পণ্ডিত কহে, শাস্ত্র পরীক্ষা জয় পরাজয়।"

সনাতন গোস্বামী কহিলেন "ইহাই যদি হয়, ইহাতেই যদি সন্তুষ্ট হও, তবে পণ্ডিত! আমরা পরাজয় মানিলাম, বিচারের আর প্রয়োজন নাই।"

দিগ্বিজয়ী সুধু কথায় সন্তুষ্ট হইবেন কেন? বলিলেন—"যদি তাই হয়, বিচারের শক্তি আপনাদের যদি না থাকে, জয়পত্র লিখিয়া দিন, চলিয়া যাইব।" রূপ-সনাতন তখন সেই গর্ব্বিত পণ্ডিতের অভিমতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। রূপচন্দ্র মনে করিলেন যে, তাঁহার ভয়েই গোস্বামীগণ বিচারে অগ্রসর হইলেন না, বিচার না করিয়াই ভয়ে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। পণ্ডিত সঙ্গীগণের সহিত এই কথা আলাপ করিতে করিতেই যমুনার তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

শ্রীজীব * যমুনার ঘাটে ছিলেন, তিনি এই আস্ফালন-বাক্য শুনিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহার হাস্যোদয় হইল, হাসিয়াই তিনি বলিলেন "শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী আমার উপাধ্যায়, বিচারে তাঁহাদিগকে জয় করিয়াছেন, এ কথা আমার বিশ্বাস হইতেছে না।" জয়পত্র খানি পণ্ডিতের হাতেই ছিল, শ্রীজীবের কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী তাঁহাকে সেই জয়পত্র দেখাইয়া বলিলেন

* শ্রীরূপ ও সনাতনের ভ্রাতা বল্লভের পুত্র, শ্রীরূপের শিষ্য।

"এই যে জয়পত্র, দেখুন না।" শ্রীজীব বলিলেন, "তা' থাকুক, আপনি যদি আমার সহিত বিচারে জয়ী হইতে পারেন, তবে না হয় মানিয়া লইব।"

পণ্ডিতের উচিত ছিল, শ্রীজীবের সহিত বিচার না করা। কিন্তু শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে বিচার করিতে পারেন নাই,—তাঁহার বিচার-কণ্ডূতি প্রবল রহিয়াছে, জিগীষাপ্রবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই, সুতরাং বিচার আরম্ভ হইল। ঘোরতর বিচার,—ক্রমান্বয়ে ছয় দিবস হইল, তথাপি জয় পরাজয়ের কিছু জানা গেল না।* অবশেষে সপ্তম দিবসে শ্রীজীব জয়ী হইলেন।

পণ্ডিত অদ্বৈতবাদী ছিলেন, শ্রীজীব দ্বৈতবাদ স্থাপন করিলেন, শ্রীজীবের সহিত বিচারে তাঁহার মন নির্ম্মল হইল, তিনি ভক্তিধর্ম্ম স্বীকার করিলেন। † রূপচন্দ্র তখনই রূপ সনাতনের নিকট গেলেন, তখন তাঁহার আর পূর্ব্বভাব নাই; বিনীতভাবে পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনাতেও তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল না, শ্রীরূপ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে মানস করিলেন।

শ্রীরূপ রূপচন্দ্রকে দীক্ষা দিলেন না। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের আসন, সেই আসনে বসিয়া ভগবান যাহা বলেন, ভক্ত তাহা জানিতে পান। বিমল বিবেক বলে ভক্ত যাহা জানিতে পান, সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাহা সংস্থাপিত। ইহারই নাম দিব্যনেত্রে দর্শন। ভক্তের অনেক কার্য্য অনেক সময়ে তাই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরূপ বুঝিলেন যে, রূপচন্দ্রের দীক্ষাদাতা ভিন্ন ব্যক্তি—তিনি নহেন; কাজেই শ্রীরূপ গোস্বামী হইতে রূপচন্দ্র দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। ইহার আর একটি কারণ এই যে, বৈষ্ণবীমন্ত্র পাইবার যোগ্য অবস্থা রূপচন্দ্রের তখনও উপস্থিত

---

* এই বিচারের ফল শ্রীজীবকৃত "ষট্‌সন্দর্ভ।" ছয় দিবসের বিচারের মর্ম্ম ঐ পরম উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে।

† "রূপচন্দ্রের অদ্বৈতবাদ শ্রীজীব দেখিয়া।
দ্বৈতবাদ সংস্থাপিলা যুক্তি প্রমাণ দিয়া॥
বৈষ্ণব মতের তেঁহো দেখাইল প্রাধান্য।
জ্ঞানকর্ম্ম যোগ হইতে ভক্তির হৈল মান্য॥
পরাজিত রূপচন্দ্র শ্রীজীব চরণে।
দণ্ডবৎ প্রণাম কৈল আনন্দিত মনে॥"

—প্রেমবিলাস।

হয় নাই ; সে মন্ত্র পাইতে হইলে হৃদয় আরও নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। তবে রূপচন্দ্রের অত্যাগ্রহে শ্রীরূপ তাঁহার কর্ণে "হরিনাম মহামন্ত্র" দিলেন। যখন শ্রীরূপ গোস্বামী রূপচন্দ্রের কর্ণে হরিনাম দিলেন, সেই কঠোর নৈয়ায়িক পণ্ডিত যখন আগ্রহ সহকারে সেই নাম শুনিতে লাগিলেন, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল,—রূপচন্দ্রের রূপ, তাঁহার দেহ, যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ভক্তির লাবণ্য-লহরী প্রতি অঙ্গে খেলা করিতে লাগিল! গোস্বামী বুঝিলেন, হরিনামের পবিত্র শক্তিতে রূপের নবজীবন লাভের ইহাই সূত্রপাত ; নামরূপী নারায়ণ যেন জীবন্তভাবে রূপচন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দেহাভ্যন্তর আলোকিত করিলেন। * শ্রীরূপ গোস্বামী পরম পুলকিত হইলেন, নবীন শিষ্যের ভাব দেখিয়া আনন্দে—

"গোসাঞি কহে 'নারায়ণ' তবাঙ্গে প্রবেশিল।
আজি হৈতে তোর নাম রূপনারায়ণ হৈল॥"

—প্রেমবিলাস।

এই হইতে রূপচন্দ্র "রূপনারায়ণ" নামে অভিহিত হইলেন।

রূপনারায়ণ কতকদিন বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে নীলাচলে চলিলেন ;—তখন মহাপ্রভু যে কি শক্তি লইয়া অবতীর্ণ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রতি তখন ঈশ্বর-বুদ্ধি দৃঢ় হইয়াছে, কাজেই কালবিলম্ব না করিয়া নীলাচলের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু রূপনারায়ণের আশা পুরিল না ; তিনি নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন, অল্প দিন পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। রূপচন্দ্র মহাক্ষোভে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত প্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া দুঃখভার লাঘব করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! তাহাও ঘটিল না, সাগরের অভাবে নদী কি কখন প্রবাহিত হইতে পারে? নিতাই ও অদ্বৈতের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না,—রূপ নারায়ণ দুঃখের উপর দুঃখ পাইলেন।

একদিন রূপ নারায়ণ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছেন ; দৈবাৎ সেই দিবস

---

* "হেনই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটিলা।
রূপচন্দ্রে নারায়ণ প্রবেশ করিলা॥"

—প্রেমবিলাস।

"পঙ্কপল্লীর" (পাইক পাড়া?) অধিপতি রাজা নরসিংহ রায় গঙ্গাস্নানে আগমন করিলেন। সঙ্গে বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড, অপার জাঁক জমক। রাজা যখন স্নানে নামিলেন, রূপ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন।

রূপনারায়ণের প্রতিভাপ্রদীপ্ত আকার, ভক্তির মধুরিমা-মাখা শরীর, যেন ব্রহ্মণ্যের জীবন্ত চিত্র। রূপ নারায়ণকে দেখিয়াই রাজার চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল, তিনি তাঁহাকে আপন প্রাসাদে লইয়া গেলেন। নরসিংহ গুণগ্রাহী, পণ্ডিত পালক ছিলেন, তাঁহার সভায় পণ্ডিতের অভাব নাই, পণ্ডিতে পণ্ডিতে প্রত্যহ শাস্ত্রকথা হইত। রূপনারায়ণ নবাগত, তাঁহার প্রতি প্রত্যেক পণ্ডিতের তীব্র কটাক্ষ। কিন্তু শাস্ত্রকথায় কেহই রূপ নারায়ণকে পরাভব করিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বভাব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভক্তি দ্বারা মার্জ্জিত,—সে বুদ্ধি, সে যুক্তির কাছে কাহারও তর্ক খাটিত না।* এহেন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ † পণ্ডিত পাইয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ইহার পরে, যখন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গ প্রদীপ্ত, যখন (পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের অগ্রজ) সুবিখ্যাত পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ, এবং গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ ঠাকুর মহাশয়ের পদানত, যখন শূদ্র সন্তান নরোত্তম ব্রাহ্মণদিগকেও শিষ্য করিতেছেন বলিয়া বঙ্গভূমে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, তখন বহু ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় বহু পণ্ডিত ‡ ও রূপ নারায়ণ সঙ্গে রাজা নরসিংহ খেতরী আগমন করেন। কিন্তু

---

* "বিচারে রূপ নারায়ণ সবে কৈলা জয়।
রূপ নারায়ণের কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপয়॥"—প্রেমবিলাস।

† কাব্য দর্শনাদি এবং বেদ বেদাঙ্গের ন্যায় যোগশাস্ত্রেও রূপ নারায়ণের অধিকার ছিল; প্রেমবিলাস ও পদাদির রচয়িতা প্রাচীন কবি বলরাম দাস (অপর নাম নিত্যানন্দ দাস) বলেন—

"রূপ নারায়ণ যোগশাস্ত্র বহু জানে।
কিছু যোগশাস্ত্র আমি পড়িল তাঁর স্থানে॥
কোন কোন যোগ তাহা হইতে শিক্ষা কৈল।
যোগ-গুরু করি' আমি তাঁহারে মানিল॥"—প্রেমবিলাস।

কবি বলরাম রূপ নারায়ণের সমসাময়িক এবং শিষ্য। আমরা তাঁহারই কাব্য হইতে এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিলাম।

‡ ইহাঁদের কএকজনের নাম প্রেমবিলাসে আছে।

ফল বিপরীত ফলিল, পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য ভক্তির কাছে পরাস্ত হইল, রূপ নারায়ণের ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের সহিত রাজা নরোত্তমের পদানত হইলেন। বলা উচিত যে, এই শাস্ত্রবিচারের মধ্যে রূপ নারায়ণ ছিলেন না।

এতদিনে রূপ নারায়ণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, রূপ নরোত্তমের নিকট বৈষ্ণবী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী যে ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা সফল হইল,—তিনি চারিদিকে ভক্তির জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

"তাঁর সম পণ্ডিত কোন দেশে নাহি হয়।"

সুতরাং বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ রূপ নারায়ণের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাতে বিনত মস্তকে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; নরোত্তমের পদানত হইলেন। এইরূপে রূপ নারায়ণ ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে উদিত হইয়া ক্ষণিক আলোকে পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। আসাম বন্য ভূমি বটে, কিন্তু সে বনে মহামহীরুহের অভাব নাই, সে কাননে সুরভি কুসুমও ফুটে, রূপ নারায়ণ তাহার অন্যতম।

পরিণয়ে মনোনয়ন-স্বাধীনতা।

জ্ঞানময় বিশ্ববিধাতা, আপনার অনুরূপ করিয়া, মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করিবার সময় প্রত্যেককে প্রত্যেকের উপযোগী জ্ঞান দিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। জ্ঞান উন্নতির সোপান স্বরূপ। সভ্যতা বিস্তৃতির সহিত জ্ঞান-মুকুল দিন দিন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইতেছে। আমাদের জ্ঞান আছে বলিয়া, আমরা অন্যান্য জীব জন্তুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হই। ভাল মন্দ পরীক্ষা করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পাদন করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

যথাবিধি পরিচালনা করিবার জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন। মানুষের জ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষ অন্যান্য জীবাপেক্ষা উন্নত এবং সুখী। জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ সমাজ, সংসার নির্ম্মাণ করিয়াছে। মানুষের অতি

পুরাতন ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ জ্ঞানের বলে ভয়ানক অন্ধকারময় অবস্থা হইতে অবিরাম বেগে দিন দিন আলোকের দিকে—সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে মানুষের আদিম ও আধুনিক অবস্থাতে কত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়! আমরা জগতে সভ্যজাতি বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়া থাকি,—আমাদেরও পূর্ব্ব-ইতিহাস পাঠ করিলে ঘৃণা ও বিস্ময়ে মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সৃষ্ট জীব মাত্রেরই ন্যূনাধিক স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তাহারা সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে উৎসুক হইয়া থাকে। এই স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবে জ্ঞানী সজ্জনেরা সমাজ ও সংসারে কতবিধ বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে কিছুই ছিল না; অতি পুরাকালে একজন ক্ষমতাবান জ্ঞানী পুরুষ আপন সম্প্রদায় মধ্যে একটী নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। কালে সেই নিয়মটী ক্রমে ক্রমে সকল সম্প্রদায় মধ্যে প্রসারিত হয়, এবং বংশানুক্রমে নানাপ্রকারে মার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা সমাজের শাসনবিধিরূপে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তাহাই পরিশেষে আমাদিগের অবশ্য প্রতিপাল্য সামাজিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ, মানুষের আদিম ইতিহাস ধীরচিত্তে গভীর গবেষণা পূর্ব্বক চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অধুনাতন সামাজিক নিয়মাবলী সাময়িক জ্ঞানী ও প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিদিগের স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন চিন্তার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা সমাজের মধ্যে লালিত পালিত—সমাজের রক্ত মাংসে বর্দ্ধিত—হইতেছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা ভগবদ্দত্ত মহাপ্রসাদ স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া একটী কাজও করিতে পারিব না?—তাহা নহে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা সেরূপ হইতে পারে না। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সমাজের সৃষ্টি; সমাজের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া, আমরা "নিগ্রো-দাস" হইয়া সমাজে বাস করিব—ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

প্রণয় ও পরিণয় বিধাতার বিশাল রাজ্যে দুইটি আনন্দের উৎস স্বরূপ। ইহাতে কত পবিত্রতা ও কত মহান্ ভাব আছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না; অধিক কি,—ইহারই জন্য সংসারে শান্তিদেবীর অধিষ্ঠান রহিয়াছে। আজ আমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, প্রণয়, পরিণয় ও পরিণয়ের পূর্ব্বে পাত্র-পাত্রী-মনোনয়ন-প্রথার বিষয় আলোচনা করিব।

অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে কন্যা আপনাপনি দান বিষয়ে স্বীয় তত্ত্বাভিভাবকের যে কতদূর অধীন তাহার গুটি কতক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। অনেক দেশে কন্যা সম্পত্তি স্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। সম্পত্তি যেমন ক্রীত বিক্রীত হইতে পারে, এক হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইতে পারে, কন্যাও সেইরূপ ব্যবহৃত হয়। তাহাদের পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, কেহই তাহাদের প্রতি মায়া মমতা প্রদর্শন করেন না; সেই সকল অভাগিনী বালিকা যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সময়ে সময়ে তাহারা সে দেশ হইতে দেশান্তরে ক্রীত বিক্রীত হইয়া চলিয়া যায়। কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ অপরাধে নিজ পিতা মাতাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার আশায় তাহারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহারা যেরূপ পাশবিক ও আসুরিক ভাবে অত্যাচরিত ও প্রপীড়িত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা বোধ হয়, নিকৃষ্ট জন্তুদিগের প্রতি সেরূপ ঘৃণিত, জঘন্য ও নির্ম্মম ব্যবহার করি না। সময়ে সময়ে তাহারা স্বজাতির মধ্য হইতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পতিত হয়। আহা, সেই সকল অভাগিনীদিগের ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে করিতে কাহার মন বিগলিত না হয়,—কাহার নয়ন অশ্রু বর্ষণ না করে?

অনেক অনেক জাতির মধ্যে অতি শৈশবাবস্থায় কন্যাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। পরে একটি নির্দ্ধারিত বয়স প্রাপ্ত হইলে মনোনীত বরের সহিত তাহাদের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিবাহে বর বা কন্যার কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। স্ব স্ব অভিভাবকেরা যাহা করেন, বর-কন্যাকে অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিতে হয়। ইহাতে দ্বিরুক্তি বা কোন প্রকার আপত্তি প্রকাশ করিলে হতভাগ্যদের জীবননাশের সম্ভাবনা। উত্তর এস্কিমো জাতিদিগের মধ্যে কোন ঘরে একটি কন্যা জন্মিলেই, যে বালক তাহার পানি গ্রহণেচ্ছুক হয়, সে প্রতিদিন কন্যার পিতার আবাসে যাইয়া তাহাকে পাইবার জন্য প্রস্তাব করে এবং নানা প্রকার চেষ্টা ও যত্ন করে। কন্যার পিতা যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে অঙ্গীকার স্বরূপ কোন কিছু দান করিয়া থাকে। সেই অঙ্গীকারই বিবাহের অকাট্য বন্ধন স্বরূপ। পিতা যাহাকে কন্যা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করে, সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইলেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। অঙ্গীকার প্রদানের পর, কোন একটা বিশেষ বয়সে উপনীত হইলে তাহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকাস্থ অনেক আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে অতি শৈশবে

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের এই সুসভ্য ভারতভূমেও, বোধ হয়, তাহার অভাব নাই। আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত মারুত্সি নামক জাতির মধ্যে নিতান্ত অপ্রাপ্ত বয়সে কন্যাদিগের বাগ্দান হইয়া যায় এবং পরিণত বয়সে উপনীত হইবামাত্রেই বিবাহ হইয়া যায়। বস্ম্যান্ সাহেব বলিয়াছেন যে, গোল্ডকোষ্ট্ প্রদেশের নিগ্রোরা শিশু কন্যার জন্ম হইবার অনতিবিলম্বে তাহার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলে। মিঃ বিচ্ম্যান্-কৃত "আশাণ্টি এবং গোল্ডকোষ্ট্" নামক পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায় যে, বুসম্যান, বেচুয়ানা এবং আশাণ্টি জাতির লোকেরা ভ্রূণে কন্যার লক্ষণ জানিতে পারিলেই সেই ভ্রূণের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখে!

অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারাও কন্যা-দিগের অতি শৈশবে—এমন কি, আশাণ্টি জাতিদিগের মত, গর্ভস্থ শিশুর কন্যা হইয়া জন্মিবার লক্ষণ বুঝিতে পারিলেই, পূর্ব্ব হইতে তাহারা পণ দিয়া থাকে। নবগিনি, নবজিল্যাণ্ড, তাহিতি এবং দক্ষিণ সাগরস্থ অন্যান্য অনেক দ্বীপ ও উপদ্বীপে এইরূপ প্রথার প্রচলন আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের অনেক স্থলে এইরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, আর বাল্যবিবাহ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত; কেবল পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ এবং রাজপুতনার মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌবন-বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত প্রদেশ সমূহের কোন কোন স্থলে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি, এমন কি ত্রিংশতি, বর্ষ বয়স্কা যুবতী কুমারীগণ স্বাধীন ভাবে মনের সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন।—কোন এক হিন্দু রাজার ভগ্নীকে আমরা চিরকৌমার অবলম্বন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি; তিনি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন এবং অতিবৃদ্ধা হইয়া ভগবন্নামানুকীর্ত্তন করিয়া কাল কাটাইতেছেন। তবে, এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

মলয়দ্বীপপুঞ্জে, টঙ্গার এবং মূল তুর্কীদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহের প্রচলন আছে। পশ্চিম রুশিয়াস্থ য়িহুদী জাতির মধ্যে পিতা মাতারা ভবিষ্যতে কন্যা পাইবার আশা করিয়া কন্যা জন্মিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে তাহাদের বিবাহ স্থির করিয়া রাখেন। এক এক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে যে, কোন পিতা মাতা কোন একটি বালককে, আপন ভাবী কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া, নিজ বাটীতে লালন পালন করিতেছেন, কিন্তু সেই পিতা মাতার আদৌ কন্যা জন্মিল না; বালক বেচারা সেই গৃহে লালিত পালিত হইতে লাগিল এবং

আশার আশায় থাকিয়া অবশেষে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইল বা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইল।

কোন কোন জাতির মধ্যে কন্যাগণ বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদিগের মাতা, ভ্রাতা বা মাতুলের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। তাহারা যাহা করিবে, বিধিলিপি ভাবিয়া কন্যাদিগকে তাহাই মান্য করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাহাদের উপায়ান্তর নাই। মিঃ ফর্ব্বস্ বলেন যে, টিমর-লটে কন্যা বা পুত্রের বিবাহ বা অন্য কোন প্রকার গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক কর্ম্মকাণ্ড পল্লীবাসীদিগের অমতে সম্পন্ন হওয়া নিষিদ্ধ। এইরূপ কার্য্যে পল্লীবাসীদিগের অভিমত, উপদেশ ও সাক্ষ্য নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। ওল্ডফিল্ড সাহেব তাঁহার পুস্তক মধ্যে লিখিয়াছেন যে, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় কোন একটী জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহে সমস্ত জাতির মতামত গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ প্রথা আজকাল অতীব বিরল। যাহা হউক ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায় যে, এক সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কন্যারা সাধারণ জাতি অথবা তাহাদিগের মাতৃকুলের স্থাবর সম্পত্তি স্বরূপ বিবেচিত হইত। যথেচ্ছ ভাবে তাহাদের আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয়, চলিত। আত্মজা বলিয়া পিতা মাতা তাহার প্রতি কোন প্রকার দয়া প্রকাশ করিত না।

কিন্তু সকল অসভ্যজাতির মধ্যেই যে ঐ প্রকার বিবাহ প্রচলিত,— এরূপ নহে। উত্তর আমেরিকার কোন কোন আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং আপনাপন বর মনোনীত করিয়া থাকে। স্কুলক্রাফ্ট সাহেব বলেন যে, তাহাদের মধ্যে কখন কখন আপনাপন মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় গুরুজনদিগের মতে এবং কখন বা অমতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। উভয় পক্ষের মত হইলে, মনের মিলন হইলেই, বিবাহের সংঘটন হইয়া যায়। উপরোক্ত জাতির মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, কোন প্রণয়ী ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায়, বা স্বীয় প্রণয়িণীর সহিত অপরের বিবাহ হওয়ায়, মনক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রণয়ে নিরাশ হইলে অন্তরাত্মায় যে কিরূপ গুরুতর আঘাত অনুভূত হয়, প্রেমের প্রগাঢ়তা যে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে। যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, প্রাণের মধ্যে উত্তম আসনে স্থান দান করিয়াছে, রক্ত মাংসের সহিত যাহার ভালবাসা জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাকে না পাইলে বা তাহাকে হারাইলে তাহারাও সুসভ্য প্রেমিকের মত আপন প্রাণ বিনাশে কুণ্ঠিত হয় না। কানাইয়ামাত, ক্লিঙ্কেট

ও স্নুটকাদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রীর মত গৃহীত হইয়া থাকে। কিটিং সাহেব লিখিয়াছেন যে, ছিপ্পেওয়াদিগের মধ্যে কন্যার মাতারা তাহাদিগের অমতে বিবাহের পূর্ব্ব কার্য্যাদি করিয়া রাখে, পরে বরকন্যা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে উভয়ের মত গ্রহণ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করে। আতখা আলিউতদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদের পিতা মাতা পুত্র কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের একটী সন্তান না হয়, ততদিন তাহাদের বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। গ্রীক জাতিদিগের মধ্যে সনাতন প্রথা এই যে, বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে, পাত্রকে প্রথমে পাত্রীর "কর-যাচ্ঞা" করিতে হয়। পিউব্লো জাতিদিগের মধ্যে পাত্রীর অমতে বল পূর্ব্বক বিবাহ দিবার প্রথা নাই। পাত্রী স্বয়ং বর বাছিয়া লইয়া বিবাহ করে। এইরূপ বিবাহ আইন বা সামাজিক রীতি বিগর্হিত হইলেও তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না।

দক্ষিণ আমেরিকাস্থ আঁজারা দেশের গুয়ানা জাতির সম্বন্ধে মিঃ ব্রিজেস্ বলিয়াছেন, "কোন স্ত্রী যদি কোন কারণবশতঃ তাহার স্বামীকে ঘৃণা করে আর সেই ঘৃণা যদি বিকটাকার ধারণ করে, তাহা হইলে সে তাহার পূর্ব্ব পতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।" তাহাতে সে সমাজের নিন্দার পাত্রী হয় না। বস্তুতঃ আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরা বিবাহ সম্বন্ধে এতই স্বাধীনা। পিতা মাতা স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া কাহারও হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলে যদি সেই পতির প্রতি কন্যার ভালবাসা না জন্মে তবে সে পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, প্রণয়ীযুগলের প্রেম-সম্মিলনে তাহাদিগের পিতামাতা কোনরূপ অনভিমত প্রকাশ করিলে তাহারা একেবারে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া, দেশান্তরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তকার প্রেস্কট সাহেব লিখিয়াছেন যে, ড্যাকোটা জাতিদিগের মধ্যে অধিকাংশ পরিণয়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। পিতা মাতার আপত্তি হইলেই বর ও কন্যা গোপনে পলাইয়া যায় এবং অন্য দেশে বা সুদূরবর্ত্তী কোন গ্রামে গিয়া বিবাহ করে ও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ায় কন্যার পিতাই পাত্র মনোনীত করিয়া থাকে। কার সাহেব বলেন যে, এ সম্বন্ধে তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিবার

শক্তি নাই। নারিনয়েরি জাতির ইতিহাসে ট্যাপলিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, বিবাহের সময় স্ত্রীলোকের মত গ্রহণ করা সে দেশের প্রথা নহে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহা গৃহীত ও তদনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কুরনেই জাতির মধ্যে কন্যার স্বাধীন ইচ্ছার উপরেই বিবাহ নির্ভর করে; মনোমত পাত্র না হইলে তাহারা সহজে বিবাহ করিতে চায় না। যদি কোন বিশেষ কারণে কন্যার আত্মীয় স্বজনেরা তাহার মনোনীত পুরুষের সহিত বিবাহ দিতে অসম্মত হয়, তবে কন্যা সেই পুরুষের সহিত পলায়ন করিয়া যায়, এবং সসত্ত্বাবস্থায় পিতৃগৃহে পুনরাগমন করে। সে অবস্থায়, অধিকাংশস্থলেই, পিতামাতা তাহাকে ক্ষমা করিয়া গৃহে আশ্রয় দিয়া থাকে।

এতদ্দ্বারা দেখা গেল, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিবাহ-প্রথা প্রচলিত।—বিবাহ একটী অতি গুরুতর এবং দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার; প্রণয়ী ও প্রণয়িণীযুগলের ভাবী জীবনের সুখ-দুঃখ ইহার উপরেই নির্ভর করে। উভয়ে উভয়ের মনোমত হইলে, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতি সঞ্চারিত হইলে, তাহাদের জীবন অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই দায়িত্বপূর্ণ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া দিবার পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মতামত গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশে সে প্রথা নাই বলিয়া দিন দিন অসংখ্য লোমহর্ষণ ও শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। সে প্রথা নাই বলিয়াই ভারতের আজ এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে,—বিবাহের আধ্যাত্মিকতা পাশবিকতায় পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ, আমাদের সভ্য ভারতে এমন অনেক কুসংস্কারাপন্ন ভাব আছে, যাহা হইতে অসভ্য জাতিদিগের আচার ব্যবহার অনেকাংশে ভাল। আমাদের আশা হয় যে, শীঘ্রই জগতে এমন একটি যুগান্তর উপস্থিত হইবে, যাহাতে অনেক রীতি-নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

কবিতা-কুঞ্জ।

—০৫০৯০—

১

সোণার-মুকুল। *

একদিন সন্ধ্যাকালে মলয়-বাতাসে
স্বর্গের সুরভিরাশি শূন্যপথে আসে,—
সেইখানে, এলো চুলে, মাঝের দুয়ারে,
ঘুমাইয়া আছিলাম উপাধান শিরে।
পাপিয়া ডাকিয়া গেল,—ভেঙ্গে গেল ঘুম,—
প্রতিভা ঢালিয়া দিল সাঁজের কুসুম!
যামিনীর গায়ে তারা, গলে ফুলমালা,—
সরসীর স্বচ্ছ জলে 'কাল' মেঘ ঢালা,—
ফুটন্ত কুসুম গুলি, সুধার লহর তুলি'
ঢালি'ছে সুরভি-কণা লতিকার গায়,
যেমন সহস্র কোটী সোণার নক্ষত্র ফুটি'
অঞ্জলি অঞ্জলি শান্তি ঢালে অমরায়!—
লতিকা এলানো-চুল, কোলভরা কুঁদফুল,
ঘুমাইয়া চারিপাশে ভ্রমরার দল;—
সেই খানে আন্‌মনে, অতি মৃদু মধুতানে,
কানন গাইতেছিল কাঁপা'য়ে অঞ্চল;—
চাতক কোথায় ছিল, অকস্মাৎ ডাক দিল,—
জ্যোছনায় দিবা ভাবি', "জল, জল, জল!"
সেই স্বরে চমকিয়া থর থর কাঁপে হিয়া,
নয়নে আনন্দ অশ্রু বহে অবিরল,—
অবশা বিবশা হ'য়ে শূন্যপানে দেখি চেয়ে—
সোণার মুকুল এক পবনের সাথ!
ভুল ভেবে মুছি আঁখি, আবার চাহিয়া দেখি—
পবনের সনে স্বর্গ-স্বর্ণ-পারিজাত!

---

* নবজাত শিশুর জন্ম উপলক্ষে।

এবারেও ভাবি বুঝি আমারি বা ভুল—
নয়, নয়,—এই সেই সোণার মুকুল।
পবনের সাথ সাথ যেন শিশু পারিজাত
সোণার মুকুল আসি' পড়িল ধরায় !—
চমকি' উঠিনু আমি, স্মরিনু অন্তরযামী,—
কোলে নিতে, চুমা খেতে, রজনী পোহায় !

২

পা'ব প্রতিদান।

আমি সূর্য্যমুখী ফুল—
মন প্রাণ হারাইয়া অশোকের বনে,
শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে, ফিরিলাম নিজ স্থানে,—
কিনিলাম মর্ম্মদাহ গোপনে গোপনে ;—
উজ্জ্বল তপন হেরি' হারাইনু প্রাণ—
সে রবি যে মহা উচ্চ, আমি তুচ্ছ অতি তুচ্ছ,
জানি না কোথায় কবে পা'ব প্রতিদান।

৩

চাই প্রাণ !

আয় গো তোরা, কিন্‌বি যদি সরল সাদা প্রাণ,—
শস্তা দরে, বেচ্‌ব আমি খাস্তা খাসা জান্ !
নই গো আমি জাত-বেপারী—ধূর্ত্ত চতুর খল,—
ভবের হাটে আজ এসেছি,—প্রাণটুকু সম্বল !
প্রাণের দায়ে প্রাণ এনেছি,—বলি প্রকাশ ক'রে,—
প্রাণের বোঝা ভার হ'য়েছে, বেচ্‌ব তারি তরে !
দর দস্তর জানি নে, ভাই,—ধরম চেয়ে নিও,
হক্ হিসাবে জিনিষ দেখে দাম চুকিয়ে দিও।
সাচ্চা কথা বল্‌চি আমি,—আচ্ছা খাঁটি মাল,
স্বভাব তাজা, মধুর ধাঁজা, নাইক বিষের ঝাল।

ননীর মত নরম সেটী, মিঠে মধুর পারা,
সোহাগ পেলে যায় গো গ'লে,—উনিয়ে ছোটে ধারা!
সরল সিধে প্রাণটি আমার,—নাইক বাঁক্‌-চুর,
ধপ্‌ধ'পে সে চাঁদের মত, তক্‌ত'কে মুকুর!
গুণ্‌ জহরী পরাণটি, গো, গুণের পাছে ধায়,
ভোম্‌রা মত গুণ্‌গুনিয়ে গুণের মধু খায়!
সোণার ঝালে জুড়্‌তে পারে নিপট ভাঙা প্রাণ,
গাইতে পারে শুক-পাপিয়ার মন-মজানে গান!
আপ্‌নি সে যে দাঁড়ি মাঝি, আপ্‌নি সে যে খেয়া,
মিষ্টি মধুরি সদাই এ প্রাণ—ভাবের যেন নেয়া!
বিছিয়ে পাখা যায় নিমেষে নীল আকাশের তলে,
গাঁথ্‌তে পারে মোহন মালা তুলে তারার দলে!
চাঁদ নিঙ্‌ড়ে আন্‌তে পারে সুধা কুতুহলে,
গুণের টানা দেয় গো টেনে রামধনুকের গলে!
ঝড়-ঝাপটে ভয় করে না, আপন মনে ধায়,
ফুর্‌-ফুরে সে বাতাস পেলে ফর্‌ফরিয়ে যায়!
এত সাধের প্রাণটি আমার বেচ্‌তে না চায় মন,—
ক'র্‌ব কি গো?—বিষম তাপে হই'ছি জ্বালাতন।
—একটু খানি খুঁত আছে, গো, কওয়া ভাল শেষে,
ব'ল্‌বে পরে ঠকিয়ে দিলে ঠগী সর্ব্বনেশে!
প্রাণটি আমার নিখুঁত দেখে হিংসেয় হ'য়ে চুর,
বিষম দাপে দুম্‌ড়ে দেছে দুষ্ট কালাসুর!—
গভীর ডাগর কালির আঁচড় দিয়েছে তা'র গায়,
আড়াল থেকে বজ্জর হেনে ম'চ্‌কে দেছে তায়!
সেই কারণে—ব'ল্‌ব কি গো, কইতে ফাটে বুক!—
দগ্‌দ'গে ঘা প্রাণে আমার, নাই(ক) জায়গা-টুক্‌;—
মরম্‌ ফুটে রক্ত ছুটে বইছে বুকে ঢেউ,—
ভীষণ জ্বালা সইতে নারি;—প্রাণ নিবি গো কেউ?

"শিক্ষিতে"র নিবেদন।

গত ফাল্গুন মাসের "সাহিত্য-সেবকে"—"শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎ প্রত্যুত্তরে—দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইল ;—শুধু ইচ্ছা নহে, তৎ সম্বন্ধে নিজের মনোগত ভাব ব্যক্ত করা এবং 'উপদেষ্টা' মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়াও বিবেচিত হইল, কারণ "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের" আর যত দোষই থাকুক না কেন,—স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণ তাহাদের মস্তকে যতই কলঙ্কারোপ করুক না কেন, তাহারা অকৃতজ্ঞ—এই কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ, তাহারা অকৃতজ্ঞ নহে ; অন্যকৃত যৎ সামান্য উপকারও, "কাগজে কলমে পত্রস্থ" করিয়া না হউক, অন্ততঃ মনে মনে, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে।

"সাহিত্য-সেবক"—সম্পাদক-সমিতির কূটবুদ্ধিবশে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের নাম পাঠক সাধারণের সমক্ষে প্রচ্ছন্ন না থাকিলে আমাদিগকে এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না,—এই "ব্যাকরণ-দুষ্ট", "অসংযত" ও "অমার্জ্জিত" ভাষা লইয়া আমাদিগের সামান্য কথা "সাধারণের সমালোচনার অধীন করিয়া পত্রস্থ" করিতে হইত না ;—লেখক মহাশয়ের নিকট সশরীরে গমন করিয়া "বাগ্‌যন্ত্রের" সাহায্যে "ইঙ্গবঙ্গ" ভাষাতে আপনার বক্তব্যটী বলিয়া আসিলেই চলিত। দুর্ভাগ্যক্রমে, সে সুযোগ না থাকাতেই এই প্রবন্ধের অনুবন্ধ করিতে হইল।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, রচনা শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে—সন্দেহ নাই, এবং তজ্জন্য প্রবন্ধলেখকের নিকট তাঁহাদের কৃতজ্ঞ থাকাও উচিত। কিন্তু আমাদের অভাব কি ?—কেন আমরা লিখিতে প্রয়াস পাই না, প্রবন্ধলেখক মহাশয়, বোধ হয়, তাহা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঔষধের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোগের নিদান নির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহাতে আরোগ্যের সম্ভাবনা অতি অল্পই

থাকে। সুতরাং যাহাতে উপদেষ্টা মহাশয় আমাদের রোগের প্রকৃত 'কারণ' অনুসন্ধান করিয়া তন্নিবারণার্থ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা প্রদান করিতে পারেন, এতদভিপ্রায়ে নিম্নে রোগের কতকগুলি 'লক্ষণ' প্রদর্শিত হইল। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা, স্বয়ং "শিক্ষিত" বলিয়া মনে না করিলেও প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে তৎপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং "শিক্ষিত"নামে দুই একটী কথা বলিলে, বোধ হয়, নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা বর্ত্তমান সময়ের "প্রতিনিধি" মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া,অথবা তাঁহাদের 'নজির' প্রদর্শন করিয়া, স্বতঃই বরিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আসরে অবতীর্ণ হইতেছি। আমাদিগের সে ইচ্ছা বা স্পর্দ্ধা নাই। নতুবা, যাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম, আহার পরিচ্ছদের সম্পূর্ণ বিরোধী—যাঁহারা হিন্দু-জাতিকে আন্তরিক ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং সুবিধা ও ক্ষমতা পাইলে ভারত মহাসাগরের জলে ডুবাইয়া দিতে পারেন—এমন সব ঘোষ-বোস-মাল্বারি প্রভৃতি অহিন্দুগণ স্বাভিপ্রায় সাধনার্থ যখন হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে বক্তৃতাদি দ্বারা 'বাহবা' লইতেছেন, তখন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত একজন লোকের পক্ষে তৎ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে সাধারণ সমীপে উপস্থিত হওয়া বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত মার্জ্জনীয় হইত না।—তথাপি, বলিয়া রাখা ভাল, আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা আমাদিগের নিজের কথা—"শিক্ষিত" সম্প্রদায়ের অনুমোদনীয় কি না, জানি না।

প্রথমতঃ, আমাদের প্রতিভার অভাব। প্রতিভা স্বর্গের দুহিতা—মানব মস্তিষ্কের স্পর্শমণি। প্রতিভা যাঁহার আছে তাঁহার আবার চিন্তা কি? তিনি যাহা স্পর্শ করিবেন, তাহাই সোনা হইয়া যাইবে,—তাহাই জন সাধারণ সযত্নে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অভিনিবেশ শক্তির পূর্ণ বিকাশের অপর নামই প্রতিভা, সুতরাং প্রতিভা লইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না,—প্রতিভা সহজাত সংস্কার নহে, ইহা চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও প্রতিভা-উপার্জ্জন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল কই?—আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমাদিগকে ত অভিনিবেশ শক্তির সম্যক্ অনুশীলন করিবার অধিক অবকাশ দেয় নাই।—"বৈশ্ববিদ্যালয়িক" শিক্ষা বিভ্রাটে বিপর্য্যস্ত হইয়া এক নিশ্বাসে বেদ-বেদান্ত সমাপন করিয়া বসিলাম,—না

পড়িয়া পণ্ডিত হইলাম,*—দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের বলে পল্লবগ্রাহী 'গ্র্যাডুয়েট' রূপে 'ডিপ্লোমা' লাভ করিলাম,—শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইল।—ধন্য শিক্ষা! এ বিদ্যা শিক্ষা, না ধৃষ্টতা শিক্ষা, বুঝা সহজ নহে। এরূপ শিক্ষা 'ভারতে'ই সম্ভবে! যাহা হউক, এখন ত 'শিক্ষিত' হইলাম, কিন্তু শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তবুও আশা ছিল, বুঝি 'ডিপ্লোমা'র সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রতিভা, কাম-অর্থ—সমস্তই পাইব, কিন্তু বাড়ী আসিয়া 'ডিপ্লোমা' খুঁজিয়া, দুর্ভাগ্য বশতঃ, তাহার কিছুই পাইলাম না। সময়, স্বাস্থ্য, অর্থ—কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিলাম, বিনিময়ে পাইলাম একখণ্ড কাগজ—সুধু কাগজ, আর কিছুই নহে!

দ্বিতীয়তঃ, অজীর্ণতা দোষ।—শিক্ষার ব্যভিচারে আমাদিগের, শারীরিক ও মানসিক, উভয়বিধ অজীর্ণতা জন্মিয়াছে। ছাত্রাবস্থায় উৎকট পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় পরিপাকশক্তি লোপ পাইয়াছে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে 'পেটের অসুখ' নিত্য সহচর হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় কোন কাজে যে আমাদিগের উৎসাহ ও উদ্যম দেখিতে পাইবেন না, তাহা আর বিচিত্র কি? আবার মানসিক অজীর্ণতাও ততোধিক প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সময়ে নানা বিষয়ক গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে,—কাজেই পঠিত বিষয়ের সম্যক্ ধারণা জন্মিতে পারে নাই, অধিকন্তু নূতন বিষয় গ্রহণ করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ "শিক্ষিতে"রই যে এই অবস্থা—তাহা এক প্রকার নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সুতরাং এমন লোকের নিকট হইতে 'দেশ ও সমাজ' কি প্রত্যাশা করিতে পারেন, বুঝিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, অর্থচিন্তা।—যদি যোগী ঋষিদের মত বলিতে পারিতাম—"অর্থই অনর্থের মূল, অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ চিন্তাতেই দিন অতিবাহিত করিব," তাহা হইলে আর কোন কথাই ছিল না; নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতাম,আর অবসর মতে বক্ষ্যমাণ উপদেষ্টা মহাশয়ের উপদেশ মত "সাহিত্য-সেবকে" প্রবন্ধ সরবরাহ করিতাম। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে কই? যখন উদরাধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাঁহার পূজার জন্য জ্বালাতন করিতে

* ভুক্তভোগী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, ডেকার্টিস্, হিউম, লক্, হেমিণ্টন, ক্যাণ্ট, হেলেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের লিখিত একটি পংক্তিও কলেজে পাঠ না করিয়া সিনেট হলে বসিয়া পরীক্ষার্থীকে তাঁহাদিগের মতামতের সমালোচনা করিতে হয়।

আরম্ভ করেন, তখন কোথায় থাকে যোগী ঋষিদের ধর্ম্ম কথা, আর কোথায় যায় সাহিত্য-সেবী উপদেষ্টা মহাশয়ের উপদেশ; তখন কেবল 'হায় অন্ন, কোথা অন্ন, কিসে অন্ন পাব' ধ্বনি প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিলোড়িত করিয়া ফেলে—সংসার শূন্য বোধ হয়, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকি। সংসারে যদি 'একা' হইতাম, অথবা যদি 'উন্নতিশীল দলে'র মত 'Forsake your father and mother and cleave unto your wife' এই খ্রীষ্টান নীতি অনুসরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বড় না ভাবিলেও চলিত। কিন্তু, দুর্ভাগ্য-ক্রমে, তাদৃশ সুসভ্য (?) হইতে পারি নাই; অগত্যা সকলের গ্রাসাচ্ছাদনার্থ অর্থের জন্য লালায়িত। কিন্তু তাহারও উপায় নাই।—কালেজের বিদ্যা কেরাণীগিরিতে চলে না, আর 'বড় বাবু'র নিত্য নব পারিষদ মহাপ্রভুগণের আবির্ভাবে আমাদিগের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিবারও অর্থ বা সামর্থ্য আমাদিগের নাই। সুতরাং ভাবিতে ভাবিতেই আমরা 'সারা' হইলাম। কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"নশ্যতি বিপুলমতেরপি বুদ্ধিঃ পুরুষস্য মন্দ বিভবস্য।
ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল বস্ত্রেন্ধন চিন্তয়া সততম্॥"

অন্ন চিন্তাতেই আমরা 'মাটি' হইলাম। তাহার উপর আবার 'শিক্ষার গুণে' একটু বিলাসিতাও শিখিয়াছি—নিজের নবীন সজ্জা যত না হউক, গৃহিণীর গহনা যোগাইতে "প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া উঠে—তিনি 'বাবুর বাবু'! সকলই আমাদের পোড়া অদৃষ্টের দোষ!

চতুর্থতঃ, বিষয়াভাব।—নূতন লেখকের পক্ষে ইহা বড়ই একটা সমস্যার বিষয়। কি লিখিব?—আমাদের নিকট হইতে কোন্ বিষয় জানিবার জন্য 'ইতর-সাধারণ' উদগ্রীব হইয়া আছেন?—এমন ত কোন বিষয় দেখিতে পাই না, যে সম্বন্ধে পূর্ব্বে আর কখন কিছু লিখিত হয় নাই। সময়ে সময়ে মনে হয়, আরও বিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে হয় ত, লিখিবার অনেক নূতন বিষয় পাইতাম এবং সেই সুযোগে মৌলিক 'সুলেখক সংজ্ঞাভাক্' হই-বার চেষ্টা করিতে পারিতাম। কিন্তু এখন যাহা লিখিব তাহাই "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" হইয়া পড়িবে। আর পুরাতন বিষয় নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রঙ্ ফলাইতে হইলে প্রতিভার প্রয়োজন। সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অভাব,—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"আর একটি কথা—একটি গুরুতর কথাই রহিয়াছে।" আমরা যাহাই লিখিব তাহাতেই আমাদিগকে কোন না কোন সম্প্রদায়ের অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে দুই দল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় দেশের যাহা কিছু রীতি নীতি, আচার ব্যবহার সমস্তই অভ্রান্ত সত্যানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, অপর সম্প্রদায় এ সমস্তই 'কুসংস্কার' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমরা এতদুভয়ের কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। সুতরাং এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমরা 'বাবু' অভিধানে অভিহিত ও অন্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক 'কুশিক্ষিত', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন', 'কুরুচিসম্পন্ন' প্রভৃতি সুললিত বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকি। এখন বলুন, কে নিজের সময় ও কাগজ কালি নষ্ট করিয়া গালাগালি খাইতে যাইবে? সুতরাং আমাদের দ্বারা লেখা হইবে না।

উপসংহারে উপদেষ্টা মহাশয়ের নিকট অনুরোধ—যদি তিনি আমাদের প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া তৎপ্রতিবিধানার্থ উপযুক্ত 'ঔষধ' প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে যেন আমাদিগকে লিখিতে উপদেশ দেন, নতুবা তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।*

"কি হয় ম'লে?"

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে?
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মিলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে সব খোয়ালে।

---

* পূর্ব্ব প্রবন্ধলেখক ইহার প্রত্যুত্তর প্রদানে আর 'পরিশ্রম' স্বীকার করিবেন কি না, বলিতে পারি না; তবে তাঁহার 'উপদেশ' বা প্রার্থনা যে অন্ততঃ একজন 'শিক্ষিতে'রও মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে ও ফলপ্রসূ হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—সা-সে-স-স'।

এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলে জুলে,
যে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে।"

মৃত্যু মহা বিভীষিকাময় সমস্যা—এমন রহস্য আর নাই। জীবনের পর পারে কি আছে, তাহা কেহই বিদিত নহে—এ দুর্জ্ঞেয় বিষম রহস্য ভেদ করা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। মৃত্যুর পরে আত্মার গতি কি হইবে, তাহার মীমাংসাই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। দণ্ড যেমন কুম্ভকারের চক্র পরিচালনের হেতু, মরণান্তর আত্মার অবস্থা বিষয়ক অনুমান তদ্রূপ জীবন যন্ত্র পরিচালনের দণ্ড স্বরূপ। যদি লোকে এমন জানিত যে, মৃত্যুর পরে পাপের দণ্ড বা পুণ্যের পুরস্কার নাই, তাহা হইলে বসুন্ধরা পাপে পূর্ণ হইত এবং কেহই পুণ্যের পথে পদার্পণ করিত না। কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই বলিয়াই এই পৃথিবীতে পাপ পুণ্য উভয়ই আচরিত হইয়া থাকে। মৃত্যু অভেদ্য রহস্য জড়িত বলিয়াই সংসারে বৈচিত্র্য দেখা যায়। মৃত্যুর পরে কি হইবে যদি জানা থাকিত, তাহা হইলে, সকলে না হউক, অনেকেই যে তদুপযোগী কার্য্য করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মৃত্যু এক মহা প্রহেলিকা; সুতরাং সংসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের গতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে। এক দিন মৃত্যু সকলেরই পরিণাম। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, —সকলকেই মরিতে হইবে। কিন্তু মরণান্তর কোথায় যাইবে, কি হইবে, তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। কার্য্যের ফল জানা না থাকিলে তাহাতে মহা সন্দেহ, অপরিজ্ঞাত পথে নানা আশঙ্কা, কোন মতেই চরণ চলিতে চাহে না। সেই জন্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মরিতে এত ভয়! যদি সে পথের মানচিত্র থাকিত, যদি সেই অজানিত রাজ্যের এক খানা ইতিহাস থাকিত, যদি কেহ সঙ্গের সঙ্গী থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যুকে ভয় করিত কে? যাহার সংসারে আপনার বলিতে কিছু নাই, যাহার মায়া-মমতার একগাছি সূত্রও দৃঢ়বদ্ধ নাই, যে রোগের যন্ত্রণায় আপন শরীরের উপরেও বীতশ্রদ্ধ, সে ব্যক্তিও মরিতে চাহে না। মৃত্যুর পরে পাপের দণ্ডাশঙ্কা না থাকিলেও আত্মার গতি কি হইবে কেহই জানে না বলিয়াই মৃত্যুকে এত ভয়। স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রভৃতি নানা সুখপূর্ণ সংসার এবং আত্মার আবাস এই আদরের মানব দেহ ত্যাগ করা মহা কষ্টের কথা

সন্দেহ নাই ; কিন্তু যখন তাহা অনিবার্য্য, তখন মৃত্যুর জন্য মনুষ্যকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু মৃত্যুর পর পার মহা অন্ধকারময় বলিয়া লোকে তাহা পারে না। সংসারে আমরা এমন অনেক কাজ করিয়া থাকি, যাহার ফলাফল জানা নাই, যে স্থানে কেহ কখন যায় নাই এমন স্থানেও গিয়া থাকি ; কিন্তু মৃত্যুর পথে যাইতে সাহস কুলায় না। তাহার প্রধান কারণ, তথা হইতে ফিরিবার উপায় নাই—যদি দুঃখ কষ্ট বিপত্তি দেখি, তাহা হইলে সংসারে পুনঃ প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু এত যে ভয় সন্দেহ অনিশ্চয়তা, তথাপি সে পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম যদি কাহাকেও সমভিব্যাহারী পাইতাম। মানুষের এমনই স্বভাব, আত্মায় আত্মায় এমনই আকর্ষণ যে, দুই চারিজন আত্মীয় বন্ধুর সহিত মরিতে পারিলে আমরা তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না। স্বভাবতঃই মনুষ্য সমভিব্যাহারী প্রিয়, সমভিব্যাহারী পাইলে মনুষ্য সকল কার্য্যই করিতে অগ্রসর হইতে পারে, প্রবৃত্তি না থাকিলেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করে। এই কারণে মন্দ বালকের সহিত মিশিলে সচ্চরিত্র বালক সহজেই মন্দ হইয়া যায়, অসাধুর সহিত মিলিত হইলে সাধু অসাধু হইয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর পর পারে যাইবার সঙ্গী মিলে না ; সুতরাং মৃত্যু ভয়ঙ্কর হইতেও ভয়ঙ্কর। সেই অপরিজ্ঞাত রাজ্যের বৃত্তান্ত কেহ বিদিত নহে, সেই ঘোর অন্ধকার কেহ ভেদ করিতে সক্ষম নহে ; কিন্তু সকলকেই এক দিন তথায় যাইতে হইবে বলিয়া সকলেই আপনার জ্ঞানানুসারে মৃত্যুর পরে কি হইবে, তাহার একটা কল্পনা করিয়া লইয়াছে, মনে মনে সেই অজানিত দেশের একটা মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়াছে। যাহার যেমন বিদ্যা বুদ্ধি, যাহার যেমন শিক্ষা, যাহার যেমন কল্পনাশক্তি, সে সেইভাবে মৃত্যুর অতীত রাজ্যের কল্পনা করিয়াছে। কাহারও অনুমান তর্ক যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত, কাহারও বা অনুমানের মূলে কেবল অনুমান ও অন্ধ বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে কাহার অনুমান সত্য, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই ; তবে যাহার মূলে অধিক তর্ক যুক্তি, সেই মতই যে অধিক বিশ্বাসযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ কি ? মৃত্যুর পরে যে একটা অপরিজ্ঞাত অবস্থা আত্মার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এবম্প্রকার বিশ্বাস প্রায় সকল লোকেরই আছে ; কিন্তু আবার এমনও এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা মৃত্যুর পরে আর আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, এই শরীরের সহিতই সমস্ত সাঙ্গ করিতে চাহেন। কিন্তু কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ তাঁহাদিগের কথা বলেন নাই ; সুতরাং আমরাও তাঁহাদিগের নামো-

লেখ করিব না। এই জীবনের পরে আমরা একটা যাহা হউক কিছু হইব, কোথাও না কোথাও যাইব, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদিগেরও তদ্বিপরীত নহে। কিন্তু কি হইব এবং কোথায় যাইব, সে মীমাংসার পক্ষে বহু মতভেদ—

"কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মিলে॥"

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ভূতযোনির অস্তিত্ব মিথ্যা নহে। অশিক্ষিত কেন, অনেক শিক্ষিত লোকেরও উক্ত বিশ্বাসে আস্থা আছে। তাহাদিগের মতে কুস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির মরণান্তর সদ্গতি হয় না,—আর হয় না তাহাদিগের—যাহাদিগের মৃত্যু স্বাভাবিক নহে। এই সকল লোক মৃত্যুর পরে ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং এই পৃথিবীতে বা ইহার নিকটে কোথাও থাকিয়া তাহাদিগের দূষিত আত্মা অদৃশ্যভাবে বিচরণ করে, কখন বা কাহাকেও পরিত্যক্ত জড় শরীরের অনুরূপ ছায়া শরীর ধারণ করিয়া অথবা অন্য প্রকার একটা বিকট আকার ধারণ করিয়া দেখা দেয়। এই সকল ভূত প্রেত কখন কখন কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে উপদ্রব করে। জনহীন বাটীতে বা বৃহৎ বৃক্ষে বা মাঠে বা পুষ্করিণীর পাড়ে বা শ্মশান ভূমিতে ইহারা থাকিতে ভালবাসে এবং এই সকল স্থানে কখন কখন কাহাকেও দেখা দেয়। গয়া ধামে তাহাদিগের প্রেতকার্য্য করিলে বা পিণ্ডদান করিলে তাহারা ভূতযোনি হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করে। এই সকল ভূত প্রেত আবার কখন কখন কাহাকেও পাইয়া বসে এবং যাহার স্কন্ধে ভর করে তাহার দ্বারা অনেক অমানুষিক কার্য্য সম্পাদন করে। ফলতঃ লোকের বিশ্বাস যে, আত্মা ভূত যোনি পাইলে কষ্টে কালাতিপাত করে এবং সদ্গতির জন্য লালায়িত থাকে ও যাহাতে তাহা লাভ হয় তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই প্রেত যোনি অতিক্রম করিতে পারিলে আত্মার স্বর্গ-লাভ হয়। স্বর্গ মহা সুখের স্থান। যে যেমন সুখের কামনা করে এবং যাহার যেমন সুকৃতি, সে তদনুযায়ী সুখের অধিকারী হয়। তারতম্য অনুসারে ভূর, ভুবর, স্বর, মহর, জন, তপস ও সত্য এই সপ্ত স্বর্গ কল্পিত হইয়াছে। পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুর পরে এই সপ্ত স্বর্গের একটাতে যাইতে পারে এবং সুকৃতি অনুসারে তথাকার সুখ ভোগ করিয়া কাল পূর্ণ হইলে অন্য স্বর্গে উন্নীত হয়। স্বর্গেও আত্মার কার্য্য শেষ হয় না, তথায় গিয়াও কর্ম্ম বীজ সংগ্রহ করে এবং তাহার ফলে উত্তরো-

ন্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয় অথবা তথা হইতে চ্যুত হইয়া দণ্ডভোগের স্থানে পুনরায় দুঃখ যন্ত্রণা উপভোগ করে।

স্বর্গ সুখভোগ অপেক্ষা আত্মার আরও উন্নত এবং চরম অবস্থা পরমাত্মার সহিত মিলন। যে বাঞ্ছিত সুখভোগের জন্য হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ যাহা জড়াতিরিক্ত চৈতন্যাংশের উপভোগ্য, সেই সুখভোগ সমাপ্ত হইলে গুণাতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সহিত মিলন জীবাত্মার উৎকৃষ্ট ও চরম অবস্থা। ইহাই হিন্দু শাস্ত্রোক্ত মুক্তি। মুক্তিলাভই জীবাত্মার পরম লক্ষ্য, ইহা লাভ হইলে আর তাহার কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না—আর কার্য্য থাকে না, সুখ দুঃখ থাকে না; থাকে কেবল অনন্ত জ্ঞান, বিমল আনন্দ! হিন্দু শাস্ত্রমতে মুক্তি নানা প্রকার; তন্মধ্যে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ এই পাঁচ প্রকার মুক্তি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ এবং মোক্ষ অভিলাষী, মৃত্যুর পরে তাঁহারা এই সকল মুক্তির অন্যতম লাভ করেন। সাধনা অনুসারেই এই সকল গতি লাভ হয়। পরমেশ্বর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকে সকল কালে বিরাজমান আছেন ইত্যাকার ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব ভাব সাধক যখন নিয়ত ধ্যান করেন এবং আপনার হৃদয়ে সর্ব্বদা ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখন তাঁহার সালোক্য লাভ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক লোকে বাস করিবার অধিকারী হন। মৃত্যু, অর্থাৎ জড়দেহ ত্যাগ করিবার পুর্ব্বে যে সাধকের এবম্প্রকার অবস্থা ঘটে না, এমন নহে। যাঁহার আত্মা ঈশ্বর সন্দর্শন লাভ করিয়াছে, তিনি জড় শরীর ধারণ করিয়া থাকিলেও জড় কর্ত্তৃক আবদ্ধ নহেন—ঈশ্বর সন্দর্শন লাভ হইলে শরীর ধারণের প্রয়োজনও থাকে না। সাধকের ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব ভাব যতই প্রগাঢ় হইতে থাকে, মুক্তির পথে তিনি ততই অগ্রসর হইতে থাকেন। সালোক্য অপেক্ষা সামীপ্য মুক্তি ব্রহ্মের আরও নিকটবর্ত্তী এবং যখন সাধক ঈশ্বরকে সকল বস্তুর মধ্যে দেখিয়া আপনাকে তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন তাঁহার সামীপ্য মুক্তি লাভ হয়। এ অবস্থায় তাঁহার এই প্রকার জ্ঞান হয় যে, ঈশ্বর তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করিতে-ছেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ঈশ্বর ছাড়া নহেন। যখন ব্রহ্মের এই সামীপ্য ভাব আত্মার সহিত আরও জড়িত ও ঘনীভূত হয়, তখন সাধক আপনার আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবেন না, অর্থাৎ গৃহ মধ্যস্থ বায়ুকে সংসার

ব্যাপ্ত বায়ু হইতে যেমন কেহ পৃথক্ মনে করে না, তদ্রূপ আত্মা পরমাত্মার এক রূপত্ব জ্ঞান লাভ করেন। ইহাই সাধকের স্বারূপ্য মুক্তি। এবম্প্রকার মুক্তির তাৎপর্য্য এমন নহে যে, আত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ সমান গুণ বা ঐশ্বর্য্যশালী হয়। পিতা পুত্রে যেমন স্বারূপ্য, ব্রহ্ম ও জীবাত্মায় তদ্রূপ ভাব যখন সাধক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তখনই তাঁহার স্বারূপ্য মুক্তি লাভ হয় বলা যাইতে পারে। এই পিতা পুত্র তুল্য স্বরূপ্য ভাবে যখন সাধক একেবারে নিমজ্জিত হন,তখন পিতা পুত্র সম্বন্ধ আরও নিকট হয় এবং জীবাত্মা আপনার জনক পরমাত্মাতে একেবারে সংলগ্ন হইয়া পড়ে, উভয়ের মধ্যে আর প্রভেদ থাকে না, পার্থক্য থাকে না, ব্যবধান থাকে না এবং আত্মা নিয়ত পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া একত্র অবস্থান করে। ইহাই আত্মার সাযুজ্য মুক্তি। তাহার পরে এই সাযুজ্য ভাব যখন আরও ঘনীভূত হয়, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্ সত্বা জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং একেই দুই ও দুয়েই এক ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। আত্মার পৃথক্ সত্বা, পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞান লোপ পাইলেই আত্মা পরম আশ্রয় স্থান ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই আত্মার চরম অবস্থা—ইহারই নাম নির্ব্বাণ মুক্তি, অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত নদীর মিলনান্তর একাকার ভাবের তুল্য আত্মা পরমাত্মার সর্ব্বাংশে মিলন।

"বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে সব খোয়ালে।"

ঘটমধ্যস্থ আকাশ ও তদতিরিক্ত বহিরাকাশে যে সম্বন্ধ,জীবাত্মা ও পরমাত্মায় সেই সম্বন্ধ বেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বলিতেছেন যে, তাহাই বেদের আভাস। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঘট ভাঙ্গিলে ঘটমধ্যস্থ আকাশ বহিরাকাশে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে জীবাত্মা অবশ্য পরমাত্মায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে—পাপী ও পুণ্যবান নির্ব্বিশেষে পরব্রহ্মে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং কবিরঞ্জনের আশঙ্কা যে, শূন্যে পাপ পুণ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইলেই সর্ব্বনাশ! এই জড় জগতের জীবন যেমন শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, মনুষ্যের জড়দেহাতিরিক্ত আত্মাও তদ্রূপ চৈতন্য মাত্র। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ কেহই আত্মা নহে—আত্মা তদতিরিক্ত শক্তি মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া আত্মা জীবনী শক্তি নহে—প্রাণ নামে যাহা কথিত, তাহা আত্মা নহে এবং এতদুভয়ের এককে অন্য বলিয়া জ্ঞান করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ঘটের সহিত মনুষ্যের দেহ উপমিত হইলেও তন্মধ্যস্থ আকাশ মনুষ্যের প্রাণ

নহে, উহা আত্মারই সহিত উপমিত হইয়াছে এবং যে কারণে জল মৃত্তিকা তেজ ইত্যাদির একত্র সমবায়ে ঘটের অস্তিত্ব, মনুষ্যের প্রাণও সেই কারণ-সম্ভূত। সেই জীবনী শক্তির ক্ষয় হইলে ঘট আর ঘটাকারে থাকে না, অর্থাৎ মনুষ্যের মৃত্যু হয়। জীবনীশক্তি আত্মার কোন প্রকার শক্তি নহে, তবে তাহার স্ফূর্ত্তিতে আত্মার বিকাশ হয় সন্দেহ নাই। জীবনী শক্তি যে কি সামগ্রী, তাহা আজিও বিজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই—কখন যে হইবে, সে আশা করিবারও সময় আসে নাই। ইহা জড়ের গুণ কি আত্মার শক্তি সাপেক্ষ, তাহা স্থির করা সুকঠিন এবং এ সম্বন্ধে অনেক মতবিরোধ দেখা যায়। প্রাণীজগৎ জড়জগতের অব্যবহিত উপরেই সত্য, এমন কি উভয়ের সংযোগস্থল পরিস্কাররূপে নির্দ্দেশ করাও কঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া জড়ে যে চৈতন্য শক্তি নিহিত আছে, তাহা কি প্রকারে ও কি প্রমাণে বিশ্বাস হইতে পারে? আবার পণ্ডিতেরা প্রাণীজগতের নিম্নস্তরে আত্মার আরোপ করেন না, এমন কি ইতর জন্তুতেও আত্মার আরোপে অনেকে সন্দিহান। যাহাই হউক, মনুষ্যের জীবনীশক্তির ক্ষয় হইলেই মৃত্যু হয়, অর্থাৎ দেহ বা তাহার হেতুভূত জীবন হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে দেহ হইতে চৈতন্যময় আত্মা বিচ্ছিন্ন হইলে সেই আত্মার যে আত্মা, জগতের যে প্রাণরূপী অনন্ত চৈতন্য, তাহাতে মিশিয়া যায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আর সংসারে পাপ পুণ্যে প্রভেদ রহিল না—পাপ পুণ্য কেবল অসার নাম মাত্র এবং উভয়ের মধ্যে একের আদর ও অন্যের অনাদর কেবল বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ। কিন্তু বাস্তবিক তাহাই কি মান্য করা কর্ত্তব্য? তাহা মান্য করিলে সংসার চলে না, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পবিত্রাপবিত্রতা কিছুই থাকে না, সংসারটা একটা স্বেচ্ছাচারের স্থান হইয়া ত্বরায় ধ্বংস হইয়া যায়।

"এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।"

মনুষ্যদেহ ক্ষিত্যপ্তেজ মরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতের রাসায়নিক সংযোগ মাত্র। পাঁচ ভূত একত্র হইলেই মানুষ হয়; কিন্তু সৃষ্টির কি আশ্চর্য্য কৌশল যে, মনুষ্য কর্তৃক তাহাদিগের সংযোগে মনুষ্য সৃষ্টি হয় না, ভূতের ভূতত্ব গিয়া চৈতন্যোদয় হয় না। পরিমাণ ও প্রক্রিয়া অনুসারে পঞ্চ ভূত একত্রিত হইলেই তাহাতে জীব ও আত্মা আসিয়া প্রবেশ করে। পঞ্চ ভূত পৃথক্ পৃথক্ হইলেই তাহাদিগের সহিত জীবনীশক্তি চলিয়া যায়, আত্মা পরমাত্মায় মিশ্রিত

হয়। মনুষ্যজন্মের ন্যায় আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার সংসারে আর কিছু নাই—ভাবিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়! মানুষকে চিনিতে পারিলে অর্থাৎ মানুষের অভ্যন্তরে যে আত্মা বিরাজ করিতেছে, তাহাকে চিনিতে পারিলে আর কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না। কবি যে বলিয়াছেন, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা স্থল (The proper study of mankind is man) তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাহ, তাহা হইলে আত্মার সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা ঈশ্বর সাক্ষাৎ ঘটিবে না। এমন যে আত্মা, যতদিন না মুক্ত হয় ততদিন তাহার লীলাভূমি এই মনুষ্য দেহ, যাহা পঞ্চ ভূতের সমষ্টিমাত্র। সংসারে জড় ও চৈতন্য এই দুই দ্রব্য বিদ্যমান আছে—জড়কে অতিক্রম করিলেই চৈতন্যের রাজ্য। কিন্তু জড়কে অতিক্রম করা সময়সাপেক্ষ, অর্থাৎ কাল পূর্ণ না হইলে পঞ্চ ভূত আপনা আপনি বিশ্লিষ্ট হইয়া দেহ নাশ করে না। সকলই কালের অধীন—এই জন্য মহাকাল শক্তিরও স্বামীরূপে কল্পিত হইয়াছে। যাহার যতদিন কর্ম্মের ভোগ, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম যতদিন না শেষ হয়, ততদিন সে শরীর ত্যাগ করিতে পারে না এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও জড়দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে অকালমৃত্যু সংসারে নাই। অল্প বয়সে কাহার মৃত্যু হইলে আমরা তাহাকে অকালে কালের কবলে কবলিত দেখি বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে কর্ম্ম ভোগ করিবার জন্য তাহার জন্ম হইয়াছিল,তাহা শেষ হইল, সুতরাং তাহার সেই দেহ ধারণের প্রয়োজনও শেষ হইল। তাহার দেহ ধারণের কাল পূর্ণ হইল—পঞ্চভূতের সমষ্টি দেহ ধ্বংস হইল, অর্থাৎ পঞ্চে পঞ্চ মিলিয়া গেল এবং তাহাদিগের সম্মিলনে যে জীবনীশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা অন্তর্হিত হইল। প্রধানতঃ মৃত্যুর দুইটী বাহ্যিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়—শ্বাস রোধ ও তেজ ক্ষয়। শ্বাসরোধ জনিত মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টদায়ক বটে, কিন্তু তেজ ক্ষয় জনিত মৃত্যু তদ্রূপ নহে। হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই দুইটী জীবনীশক্তির প্রধান বাসস্থান—এই দুই স্থান বিকৃত হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুর পূর্ব্বে এতদুভয়ের একটা বিকৃত হয় এবং তাহার কার্য্য করিবার আর শক্তি থাকে না। এই প্রকারে মনুষ্যের জড়াংশ জড়ে মিলিত হইয়া গেলে তাহার চৈতন্যাংশও জগতের একমাত্র মূল চৈতন্যে মিলিত হয়। এ স্থলে অবশ্য এমন বুঝিতে হইবে যে, যাহার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়াছে এবং কর্ম্মবীজ একেবারে ধ্বংস হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাকে আর পুন-

জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, তাহারই আত্মা পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। তখন—

"প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে।"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যে ঘোর অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বী ছিলেন, এ স্থলে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। পরমাত্মা হইতে আত্মার উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই তাহার লয়, এবম্প্রকার অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক যুক্তি উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু এ স্থলে তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন, তবে প্রধান দুই একটা আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে জলবিম্বের ন্যায় জল হইতে উদয় হইয়া পুনরায় জলেতেই তাহার বিলোপ জীবাত্মার পক্ষে প্রযুজ্য হয়, তাহা হইলে পরমাত্মার জীবাত্মা রূপে মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করার কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন পরমাত্মার পক্ষে গুণাধীন হইয়া দুঃখ ভোগ করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অদ্বৈতবাদের মূল মত এই যে, এক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তু নাই, সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। তাঁহার ইচ্ছায় বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার উপাদান স্বয়ং তিনি; সুতরাং সংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে বা ছিল বা উৎপন্ন হইবে, সে সমস্তই জড় ও জীব ভাবাপন্ন ব্রহ্ম এবং আমাদিগের জীবাত্মা ব্রহ্ম বস্তু ব্যতিরেকে আর কিছু নহে, কারণ এক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সংসারে অন্য কিছু নাই। যদিও এক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তথাপি বিশ্ব সংসারকে, অর্থাৎ সমস্ত জড় ও জীব জগৎকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানময় নিত্য সত্য, আর জড় ও জীব জগৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন অনিত্য অসত্য। সুতরাং ব্রহ্ম বস্তু ব্রহ্মের বিপরীত লক্ষণ-যুক্ত ইহা অসম্ভব। তদ্ভিন্ন জ্ঞানময় নির্ব্বিকার গুণাতীত ব্রহ্ম যে ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিকারযুক্ত সগুণ হইয়াছেন, ইহাও নিতান্ত অযৌক্তিক। অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মবস্তু নহে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে ব্রহ্মাতীত পৃথক্ বস্তু তাহাও নহে। সকল পদার্থই ব্রহ্ম নহে; কিন্তু ব্রহ্ম সকল বস্তুতে প্রাণ রূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ বা নিরবচ্ছিন্ন দ্বৈতবাদ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। দ্বৈতবাদ সত্য বলিলে ঈশ্বরাতীত বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আবার অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এমত অবস্থায় দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিত ভাবই প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

"আমি" অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা, এবম্প্রকার মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বী হইলে মৃত্যুর পরে আত্মা যে একেবারে পরমাত্মায় মিশিয়া যাইবে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এবম্প্রকার মত নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং সর্ব্বনাশের মূল; কারণ, যদি আমি স্বয়ং পরমাত্মা হই, তাহা হইলে আর ব্রহ্মের ধ্যান ও উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। সেই ব্রহ্ম আমার প্রাণের প্রাণ এবং তিনিই আমিত্ব—তাঁহাতে নিজ অস্তিত্ব মিশাইয়া দেওয়ার নাম অদ্বৈতবাদ নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বটে যে, "আমি", "আমার" ইত্যাকার অহংভাব বিনষ্ট না হইলে জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে না; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এমন নহে যে, জীবাত্মা একেবারে জলবিম্বের জলে মিলিত হওয়ার ন্যায় পরমাত্মায় মিলিয়া যায়। যিনি মোক্ষ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইতে হইবে, তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে, আমিত্বের মূলে যে স্বয়ং ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, এইটী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যিনি ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই জানেন না, যাঁহার চিত্ত মুহূর্ত্তেকের জন্যও ব্রহ্ম হইতে বিচলিত হয় না, তিনিই মুক্ত পুরুষ সত্য; কিন্তু তাঁহার মোক্ষাবস্থায় যে জীবাত্মার একেবারে লোপ হয়, শাস্ত্রের মর্ম্ম তাহা নহে।

কবিরঞ্জন তাঁহার এই গীতটীতে মনুষ্যের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অনেক অবস্থার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু জন্মান্তরের কথা একেবারে উত্থাপিত করেন নাই। তাই বলিয়া তিনি যে জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না, এমন আভাস পাওয়া যায় না। বার বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শেষ মৃত্যুর পরেই বোধ হয় তিনি বলেন যে, জলবিম্বের জলে মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যায়। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে কর্ম্মবীজ ও তাহার ফলাফল একেবারে উড়াইয়া দিতে হয় এবং এই সংসারে মনুষ্যের সুখ দুঃখের তারতম্য বিচার করিলে ঈশ্বরের ন্যায়পরতায় অনেক দোষ আসিয়া পড়ে এবং তাঁহাকে পক্ষপাত দোষে দোষী করিতে হয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চণ্ডবিক্রম, প্রমোদবালা, মায়াবিনী, কিরণসিংহ ও সুধামুখী।—শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত ও বরিশাল, কীর্ত্তিপাশা হইতে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।—লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ-প্রসঙ্গ আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি,—বিবাদের ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষও দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু নিয়মমাত্রেরই, ন্যূনাধিক, ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে,—বক্ষ্যমাণ বিবাদ-সূত্রেরও ব্যতিক্রম স্থলবিশেষে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধীমান্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সমালোচ্য গ্রন্থনিচয়ের প্রণেতা শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় এই ব্যতিক্রমের বিশেষ পরিচয়-স্থল। ধনকুবের হইয়াও এই দুই মহাত্মা নিতান্ত তরুণ বয়স হইতে অবিচলিত অনুরাগভরে ভারতীর সেবা করিয়া লক্ষ্মী-সরস্বতীকে এক সূত্রে জড়িত করিয়াছেন বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও অনন্যসুলভ কবিত্বশক্তি দেবতাবাঞ্ছিত; রোহিণীকুমার তদনুরূপ প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও, উপন্যাস-গ্রন্থনে তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থগুলি তাঁহার কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়; এতদ্ভিন্ন "কনকলতা" ও "চিতোর-উদ্ধার" নামক অপর দুইখানি উপন্যাসও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে "প্রমোদবালা," "মায়াবিনী" ও "সুধামুখী" সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত, "চণ্ডবিক্রমে" রাজপুতকুলগৌরব সত্যনিষ্ঠ চণ্ডের আখ্যায়িকা সুচারুভাবে বর্ণিত, এবং "কিরণসিংহ" ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত। লেখকের বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার গ্রন্থগুলিতে উত্তরোত্তর ভাব ও ভাষার মাধুরী এবং চরিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা অধিকতর প্রস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তকগুলির ভাষা মধুর ও মনোজ্ঞ, বর্ণনা সুরম্য ও সুললিত, উদ্দেশ্য সৎ ও সুরুচিপ্রণোদিত। তাঁহার সাধু অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সহৃদয়বঙ্গসাহিত্য-সেবীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

কড়া প্রসাদ।

আজ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পঞ্চনদের সেই গর্ব্ব-বিস্ফারিত বক্ষঃ সঙ্কুচিত কেন? প্রাতঃসূর্য্যের ক্রমবিকাশে ধরা আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা অন্ধকারে বিলুপ্ত হইল কেন? পঞ্জাবের শিখ-বীর্য্য যে এত সত্বরেই বিলীন হইবে, ইহা কি শিখজাতির গোচরাধীন ছিল?—না, কোন আকস্মিক ঘটনারাজি জড়িত হইয়া উহার ধ্বংস সাধন করিল? ইহা ভাবিবার বিষয়।

আজ আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, কোন্ দুষ্কৃতি বশে সেই নবোত্থিত বিপুল শিখশক্তি হীনবীর্য্য হইয়া কাল গর্ভে বিলীন হইল। এইটী দেখিতে হইলেই সেই শক্তির উৎপত্তি ও বিলয়ের তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক। কোন শক্তির উৎপত্তি ও বিলয়ের হেতু জানিতে পারিলে সেই শক্তির পুনর্গঠন সম্ভব।

মহাত্মা নানক যে শক্তি ঈশ্বরের রাজ্য হইতে পঞ্চনদের উষর ক্ষেত্রে বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুগণ সেই শক্তির মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই শক্তির মূলে অমৃতবারি সেচন পূর্ব্বক তাহা সুদৃঢ় ও স্থায়ী করিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

মহাত্মা নানক দেখিলেন, পঞ্জাবের অবস্থা শোচনীয়। পঞ্চনদবাসী জনগণ হৃদয়হীন, হৃদয়হীন মানব শক্তিহীন।—শক্তির মূল মানবহৃদয়। সেই হৃদয় যদি পরস্পরকে এক মানবশক্তিতে বন্ধন করিতে না পারে, তবে পঞ্জাবের অন্ধকার প্রদেশে আলোকের আবির্ভাব অসম্ভব। যোগই শক্তির উৎপাদক,—বিয়োগই হ্রাসকারী উচ্ছেদক। যোগে উৎপত্তি,—বিয়োগে বিনাশ। যখন দেখিলেন, পঞ্চনদবাসীগণ হৃদয় শূন্য বিয়োগধর্ম্মী,—সহানুভূতির সুকোমল বন্ধনের পরপারে অবস্থিত,—পরস্পর বিদ্বেষী, তখন বুঝিলেন, যোগ আবশ্যক;—মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে গভীর যোগবন্ধন ভিন্ন অন্য উপায় নাই,—অন্য উপায় হইতে পারে না।

সাম্যে সমষ্টি,—বৈষম্যে বিয়োগ। পঞ্চনদবাসীদিগকে এই সাম্য ভূমিতে আনিতে হইবে,—মানব সাম্যাসনে সমাসীন না হইলে জাতিরূপে পরিগণিত হয় না,—জাতীয় শক্তির উন্মেষ হয় না। সুতরাং যোগশক্তির প্রয়োজন—তপ, জপ বা সমাধি যোগ নহে, অন্যবিধ যোগের প্রয়োজন; নতুবা শক্তির বিকাশ অসম্ভব,—পঞ্চনদবাসীদিগের সুদিন সুদূরপরাহত। তাই সেই মহাত্মা ঈশ্বরের রাজ্য হইতে ঘৃণা-দ্বেষ-বর্জ্জিত বৈষম্যনাশক "কড়া প্রসাদ" রূপ অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক মানবের স্বত্ব মানবকে বিলাইয়া জগতে শিখজাতির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই শিখ-শক্তির প্রভাবেই পঞ্জাবের অস্তমিত সূর্য্য ধীরে ধীরে উদিত হইতেছিল, কিন্তু, উঠিতে না উঠিতেই, সহসা কেন বিনাশ প্রাপ্ত হইল? নানক মানবের প্রাণে প্রাণে যে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বন্ধনের শিথিলতাই এই বিনাশের মূল। এই শিথিলতাই মানবকে সহায়হীন শক্তিহীন করে,—ইহারই দোষে মানবের জন্য মানব প্রাণ দিতে পারে না—প্রাণের স্বার্থ আসিয়া শক্তি চ্যুতি করে। সুতরাং শিখ-শক্তির মূলে কীট প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে উহার ধ্বংস সাধন করিল।

নানক, বিভিন্ন কর্ম্মী, বিভিন্ন ধর্ম্মী, হৃদয় শূন্য, বিয়োগীদিগকে সাম্যের পবিত্র আসনে বসাইয়াছিলেন। তাঁহার শিখ-শক্তি হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য মিশ্রিত—হাড়ি-মুচি-চণ্ডাল মিশ্রিত—সৈয়দ-মোগল-পাঠান মিশ্রিত। তাই বলি, সেই মহীয়সী শক্তিতে ছিল না কি? সে যে ঐশ্বরিক শক্তি—মানবের স্বত্বশক্তি—মানবে মানবে স্বার্থ-শক্তি। জাতীয় শক্তির অন্য কিছু শক্তি হইতে পারে না। কিন্তু হায়! এখন সেই শক্তি কোথায়? সেই পবিত্র শক্তিসঞ্চারক "কড়া প্রসাদ"—সেই স্বর্গীয় সুধা—সেই মহাপুরুষ-প্রবর্ত্তিত অতুল শক্তির আধার কোথায়?—এখন তাহা নামে মাত্র বর্ত্তমান। পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, "কড়া প্রসাদ" রূপ অমৃত ভক্ষণ করিয়া একীভূত শক্তিশালী শিখরূপ শিখা প্রাপ্ত হইত,—তাহাতে আধুনিক ক্ষত্রিয় শিখ, ব্রাহ্মণ শিখ, চণ্ডাল শিখ, ছিল না—যে কেহ যত ঘৃণিত ও বিতাড়িত হউক না কেন, "কড়া প্রসাদ" রূপ সুধা ভক্ষণে পবিত্র শিখ-শক্তিতে সম্মিলিত হইয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিত,—এক শোণিত, এক গোষ্ঠী, এক জাতি হইয়া, একীভূত স্বার্থ-ক্ষেত্রে সাম্যের আসনে স্থাপিত হইত; কিন্তু এখন আর সে "কড়া প্রসাদ" নাই, সে শিখ-শক্তিও

নাই।—এখন সে "কড়া প্রসাদ" বিভিন্ন শক্তি একত্র করিয়া শক্তির সমষ্টি সাধন করে না—মানবে মানবে প্রাণের সংযোগ করিয়া দেয় না—হৃদয়ের ঘৃণা-দ্বেষ বিদূরিত করে না;—বিয়োগ তাহাতেই। তাই শিখে আর শিখা নাই,—শিখজাতি শতধা বিভক্ত হইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ।

(২)

বিধাতা পুরুষকে বলবান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া পুরুষ যে যৌন নির্ব্বাচনে বল প্রয়োগ করে, এমন নহে; কারণ, তাহা হইলে, কোন প্রাণীরই স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করিতে দেখা যাইত না। তবে স্ত্রীজাতি যে বলের পক্ষপাতী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার কারণ এই যে, স্ত্রী দুর্ব্বল এবং পুরুষের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম, সুতরাং পদে পদেই তাহার অপেক্ষা ক্ষমতাবান জীবের সাহায্যের প্রয়োজন,—বিনা সাহায্যে জীবন-সংগ্রামে দুর্ব্বলের বিনাশ অপরিহার্য্য। ক্ষমতার ন্যায় স্ত্রীজাতি অন্যান্য গুণেরও পক্ষপাতী। যে পুরুষ গুণবান, স্ত্রী তাহার প্রতি যত আকৃষ্ট, নির্গুণের প্রতি তত নহে। এই জন্য দেখা যায় যে, স্ত্রী নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে পুরুষ আপনার গুণের পরিচয় দেয়—কোন কোন মধুরকণ্ঠ পক্ষী যে আপনার মধুর গানে স্ত্রীকে আকর্ষণ করে, তাহা, বোধ হয়, অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যে যাহার সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, সে তাহার গুণাগুণ সহজেই বুঝিতে পারে;—এ ক্ষমতা এক প্রকার স্বাভাবিক, যত্ন করিয়া শিখিতে হয় না। মনুষ্যের পক্ষেও এই নিয়ম। মানুষ সহজেই আপনার সহযোগী বাছিয়া লইতে পারে এবং সহযোগীর যে গুণ থাকিলে মিলন সহজ ও সম্ভব হয়, এই নৈসর্গিক শক্তির দ্বারা তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। তোমার আমার চক্ষে যে সকল গুণাগুণ দেখা যায় না, প্রণয়ীযুগল তাহা সহজে দেখিতে পায়; এই কারণে সংসারে অনেক অযোগ্য প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায়—তোমার আমার বিবেচনায় অযোগ্য বটে, কিন্তু প্রণয়ীযুগলের চক্ষে

নহে। মানুষ কেবল রূপে মোহিত হয় না—রূপ ব্যতিরেকে প্রণয়-পাত্রে অন্য গুণ দেখিয়া আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্য্য কেবলই বাহিরের পদার্থ নহে, চর্ম্ম চক্ষু ভিন্ন প্রণয়ী অন্য চক্ষুদ্বারা তাহা দেখিতে পায়। কোন বিখ্যাত কবি বলিয়াছেন—আমি প্রিয়ার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নহি, যাহাকে লোকে সৌন্দর্য্য বলে, প্রিয়ার তাহা আছে কি না তাহাও জানি না; আমি যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি, তাহা আমার চক্ষু ব্যতীত অন্য চক্ষুর অগোচর।

অতঃপর আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহযোগী নির্ব্বাচিত হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বা পুরুষান্তর গ্রহণ করে না। অধিকাংশ জীবই অনেক দিন ধরিয়া বা জীবনান্ত পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষে একত্র বাস করে। উভয়ে একত্র বাস করিবার প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ। এই একত্র বাস হইতে মনুষ্যের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সামাজিক বা সাংসারিক সম্বন্ধ আরম্ভ হইল। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একত্র মিলিত হইলে যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যের অর্থাৎ সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিভাগ করিয়া লয়। স্বভাবতঃ পুরুষ বলশালী এবং স্ত্রীলোক দুর্ব্বলা, সুতরাং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্ত্রীজাতি পুরুষকে সহায়তা করে এবং তাহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলে। অসভ্যাবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অর্থাৎ আহার সংগ্রহ, বাসস্থান নির্ম্মাণ, শত্রুদমন, ইত্যাদি কার্য্যে, অতিশয় বলের আবশ্যক হইত, সুতরাং তখন হইতেই এ সকল কার্য্য পুরুষের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলা বলিয়া যে সকল কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ তাহাই সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। এ সংসারে বলবান ও দুর্ব্বল সকলেরই কার্য্য আছে, বিনা উদ্দেশ্যে কেহই সৃষ্ট হয় নাই—একের কার্য্য অন্যে করিতে যাইলেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এবং কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। পুরুষ আহার সংগ্রহ করিল, স্ত্রী তাহা রন্ধন করিয়া আহারোপযোগী করিল; পুরুষ গৃহনির্ম্মাণ করিল, স্ত্রী তাহা লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কৃত করিল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা স্থানে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিল; পুরুষ শত্রুদমন করিয়া ভয়শূন্য ও নিষ্কণ্টক হইল, স্ত্রী সন্তান পালন করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিল; ইত্যাদি। এই প্রকার কার্য্য বিভাগ ব্যতিরেকে সংসার অচল হইত; কারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক, একা পুরুষ বা স্ত্রী তাহা করিতে স্বভাবতঃই সক্ষম নহে—সে চেষ্টা বিড়ম্বনা

মাত্র ও পদে পদে অনিষ্টকর প্রতিপন্ন হইত। পুরুষ ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের এক দিন চলে না—স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষের সংসারও অচল। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তি ও অপত্যোৎপাদনেচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যদি স্ত্রী পুরুষে ক্ষণিক মিলনে মিলিত হইত, তাহা হইলে মনুষ্য বংশ কোন্ কালে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইত। যদি স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ন্যায় কাজ করিয়া একাকী থাকিতে হইত, তাহা হইলে কঠোর জীবনসংগ্রামে স্ত্রীজাতি কথনই তিষ্ঠিতে পারিত না। এ সংসারে বলবানেরই জয় ও জীবন, আর স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, সুতরাং পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় পদে পদে পরাজিতা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তদ্ভিন্ন বলবান পুরুষ-শত্রু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কাজেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইত। এইরূপে অগ্রে স্ত্রীবংশের ধ্বংস হইত এবং আর বংশ বর্দ্ধিত হইতে না পারিয়া অচিরেই মনুষ্যবংশ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত।

স্ত্রী পুরুষ একত্র বাস করিবার অন্য কারণ মনুষ্যের সমাজ-প্রিয়তা। যাহাতে পরস্পর সাহায্য করিতে পারে সেই জন্য মনুষ্য লোকালয় ব্যতিরেকে একা বাস করিতে চাহে না। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে নির্জ্জন স্থানে থাকিতে ভাল বাসে না এবং সর্ব্বদাই অন্যের সঙ্গে থাকিতে চাহে। একাকী বাস করা তাহার পক্ষে একটী গুরুতর দণ্ড। যাহার কোন অভাব নাই, প্রতিবাসীদিগের নিকট যে কোন প্রকার সাহায্যপ্রার্থী নহে, সেও প্রতিবাসী মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া থাকে। এই কারণে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সঙ্গী চাহে এবং একত্র থাকে। যাহারা প্রায় সকল কাজেই একে অন্যের সহযোগী, বিশেষতঃ যাহারা যৌন নির্ব্বাচনে আপনার সহিত অন্যের দেহ বন্ধন করিয়াছে এবং মনের উপরেও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহারা যে পরস্পরকে উপেক্ষা করিয়া অন্য সঙ্গীর পক্ষপাতী হইবে না, তাহা বিচিত্র নহে। স্ত্রী পুরুষ যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, সংসারে তেমন প্রিয় আর কে হইতে পারে? একা পুরুষ বা স্ত্রী অপূর্ণ, অপূর্ণতা ও অসামঞ্জস্য সংসারের নিয়ম নহে,—সম্পূর্ণতার দিকেই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ যে সর্ব্বদা একত্র মিলিত হইয়া সেই লক্ষ্য সাধনে যত্নবান হইবে, এবং প্রকৃতি কর্ত্তৃক একত্র আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ক্রমে মনুষ্য যত সভ্য হইতে লাগিল, স্ত্রী পুরুষের বন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয় তাহার ততই উপায় উদ্ভাবিত হইল। এই প্রকারে বর্ত্তমান কালের বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়া স্ত্রী পুরুষকে অভেদ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ

করিয়াছে। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইলে, বিশেষ কারণের অভাবে, কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিবার অধিকারী নহে। বিবাহ কালে দশ জনের সাক্ষাতে পুরুষকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, সে স্ত্রীকে আজীবন ভরণ পোষণ করিবে এবং স্ত্রীও আজীবন তাহার অনুগমন করিতে সম্মত হয়। যাহা ব্যক্তি বিশেষের হিতকর, তাহাই সমাজের হিতকর ; কারণ এক একটী মনুষ্য লইয়াই সমাজ। সুতরাং লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিবাহের প্রয়োজন বলিয়া ইহা সামাজিক নিয়মে পরিণত হইয়াছে। বিবাহের উদ্দেশ্য এক স্ত্রীর সহিত এক পুরুষের সংযোগ ; কারণ এক পুরুষের একাধিক সহযোগিনীর বা এক স্ত্রীর একাধিক ভর্ত্তার আবশ্যক হয় না ;—একাধিক বিবাহ করিলে, যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য স্ত্রী পুরুষ একত্র বদ্ধ হয় তাহা সুচারু রূপে পালিত হয় না ;—বিধাতা এক জনের জন্য এক জনকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য এইরূপ হইলেও, সমাজের তথা ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে স্ত্রী বা পুরুষের সংখ্যাধিক্য বা অল্পতা নিবন্ধন কোন কোন সমাজে সময়ে সময়ে এক পুরুষকে একাধিক পত্নী এবং এক স্ত্রীকে একাধিক পতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীর আনুগত্য করা কষ্টকর এবং এক প্রকার অসাধ্য বলিয়া এক স্ত্রীর বহু স্বামী অতি অল্পই দেখা যায় ; কিন্তু এক পুরুষের বহু স্ত্রী পালন করা সহজ বলিয়া এক পুরুষের বহু পত্নী গ্রহণ তত বিরল নহে। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয় না যে, ইহাতে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় ; তবে এখনকার সভ্যতার চক্ষে এ সকল ঘটনা অতি বিসদৃশ, সন্দেহ নাই, এখনকার সমাজে ইহার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি হয় না, বরং প্রথাটা বর্ব্বরোচিত বলিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুখসৌকর্য্য ব্যতিরেকে স্ত্রী পুরুষের একত্র বাসের ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অন্য কারণ অপত্য উৎপাদন ও প্রতিপালন। সকল প্রাণীরই আপন দল পরিপুষ্ট করিবার বাসনা, অর্থাৎ অপত্যোৎপাদনেচ্ছা, স্বাভাবিক। যাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়, এবং সকল যুগে প্রজার সৃষ্টি হইতে থাকে, তজ্জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা সকল প্রাণীর অন্তরেই বংশ বৃদ্ধির প্রবৃত্তি দিয়াছেন। সেই স্বাভাবিক ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে, অর্থাৎ সন্তান জন্মিলে. তাহাকে প্রতিপালন করা আবশ্যক—যত দিন না সেই সন্তান পিতা মাতার সাহায্য ব্যতিরেকে সংসারে বিচরণ করিতে পারে, অর্থাৎ পুত্র জীবিকা নির্ব্বাহক্ষম এবং

কন্যা কোন পুরুষের সহযোগিনী হইবার যোগ্যা ও আনুগত্য করিতে সক্ষম বা বিবাহযোগ্যা হয়, ততদিন তাহারা পিতামাতার অবশ্য প্রতিপাল্য; নচেৎ তাহাদিগের পদে পদেই মৃত্যুর আশঙ্কা। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর জীবের পক্ষেই এই নিয়ম। পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে সন্তান পালন আদৌ সম্ভব নহে, আবার মাতার সাহায্য ব্যতিরেকেও সন্তান জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং সন্তান রজ্জু স্বরূপ হইয়া স্ত্রী পুরুষকে একত্র বন্ধন করে, স্ত্রীজাতিকে যদি আপন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আহার সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে (অন্য সময়ে কতকটা সম্ভব হইলেও) গর্ভ ধারণ কালের শেষ কিছু দিন এবং সন্তান জন্মিবার পরে কিছু দিন তাহাদিগের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িত। এমন অবস্থায় পুরুষ যদি স্ত্রীর জীবিকা নির্ব্বাহের ভার না লয়, তাহা হইলে এই সময়ে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সুতরাং সন্তানের জীবনের আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হয়। এই মৃত্যু হইতে স্ত্রীজাতিকে ও সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষ তাহাদিগের প্রতিপালনের ভার লয় ও উভয়কে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করে। এই প্রকারে স্ত্রী পুরুষ আরও ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

কবিতা-কুঞ্জ।

(১)

সোণার কমল।

প্রভাতী বাতাস লেগে ঊষারাণী-গায়
একটি একটি করি'
মুকুটের মতিগুলি তা'র
টুপ্ টুপ্ খ'সে প'ড়ে যায়;—
দুইটী নীরব অশ্রুধারা, শুভ্র মুকুতার পারা,
গোলাপী-কপোল চুমি' ভূমিতে লুটায়।

জলদ-আসনে বসি,' মূর্ত্তিমতী রাকা শশী,
বিজলী লইয়া খেলে দেবের অঙ্গনা ;—
হাতে বিজলীর বালা, গলে সৌদামিনী মালা,
নিতম্বে শোভি'ছে চারু তড়িৎ মেখলা।
আঁচল ঝাঁপিয়ে সতী, চাঁদেরে ধরিতে চায়,—
সভয়ে যামিনী-পতি মেঘেতে লুকা'য়ে যায় ;
চাঁদের দুর্দ্দশা হেরে, ভাসে নয়নের নীরে
পতিপ্রাণা কুমুদের উষ্ণ গণ্ডস্থল ;—
একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস, প্রেমিকার অতৃপ্ত পিয়াস,
নিরাশা মেঘেতে ঢাকা বদন মণ্ডল।
আকাশের কুলবালা রূপসী নক্ষত্রমালা
সরসীর স্বচ্ছ দরপণে,
আপন ছায়ার দিকে, চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
কত কি ভাবি'ছে আনমনে।
পাপিয়া হৃদয় খুলে, পঞ্চমে আওয়াজ তুলে,
ঢালি'ছে শান্তির বারি নির্জ্জীব ধরায়,—
সুধামাখা সেই গীতি, অসীম অম্বর ভেদি',
ধীরে ধীরে পশে গিয়ে সুপ্ত অমরায়।
প্রকৃতি-পূজার তরে, শেফালি আঁচোল ভ'রে
কুড়া'য়েছে এক রাশ ফুল ;
বায়ু এসে এক ফুঁয়ে, সব দিল উড়াইয়ে,—
সরলা শেফালি-বালা কাঁদিয়ে আকুল !
নিদ্রার কোমল কোলে রাখিয়ে কপোল
(দেখিতেছিলাম) একমনে প্রকৃতির কটাক্ষ বিলোল।
মল্লিকার নধর অধরে,
কুন্দের বুকের 'পরে,
মালতীর নয়নের কোণে,
যুথিকার আধফুট স্তনে,
(দেখিতেছিলাম) ধীরে ধীরে প্রতিভার আধেক বিকাশ !—
অনিল বহিয়ে গেল ছড়ায়ে সুবাস।

দেখিলাম,—সুরপুরে দিব্যাঙ্গনা সবে
ফুল্ল কমলিনী সম মত্ত মহোৎসবে;
মন্দাকিনী ব'য়ে যায় কুল-কুল-স্বরে,
সোণার নলিনী ভাসে বুকের উপরে!
নলিনী আপন মনে, চাহিয়ে আকাশ পানে,
কভু হাসে,—কভু গান গায়,—
কভু বা তরঙ্গ সনে, খেলা করে আনমনে,—
সোহাগ করিতে থাকে পাতায় পাতায়!

———

(২)

সাধ।

নির্জ্জন প্রান্তর ভূমি—তা'র মাঝখানে
একটী তটিনী ক্ষুদ্র ব'য়ে যা'বে ধীরে;
বালিকা শেফালি এক আকুল পরাণে
প্রতি নিশা জেগে জেগে ঘুমা'বে সে তীরে।
নীলিমা সে বুকে শু'য়ে হেরিবে স্বপনে,
মলয় পরশে মৃদু উঠিবে কাঁপিয়া,—
নবীন প্রণয়ে যথা প্রথম চুম্বনে
প্রেমিক-প্রেমিকা-আদি উঠে শিহরিয়া।
প্রতি উষা পিকবধূ তুলিবে ঝঙ্কার
চির নব বসন্তের আকুলতা দানে।
বিভোর হইয়া তায় পরাণ আমার
জন-কোলাহল হ'তে দূরে—এই স্থানে
মৃত্যুর শ্যামল ছায়—শান্তিময় কোরে
ঘুমা'য়ে পড়িবে সুখে,—সাধ সে অন্তরে।

———

(৩)

পাগলিনী।

আঁচর ভরিয়া তুলিব, লো, ফুল,
ঢালিয়া দিব, লো, যমুনা জলে,
হেলিয়া দুলিয়া করিব, লো, খেলা,—
সরসী যেমন লহরী তোলে।
কখন গিরির সুদূর শিখরে
একেলা নীরবে রহিব বসি',
আধ ঘুম ঘোরে আধ জাগরণে
ভাবিবে সকলে এ বাল-শশী।
কখন নিবিড় নিভৃত কাননে
এলাইয়ে দিয়ে চুলের রাশ,
বসি' তরু মূলে শুনিব বিরলে
বন-সারিকার মুখের ভাষ।
কখন বা ফুলে সাজি' ফুলময়ী
বনদেবী সম করিব ধ্যান,
লতিকার ছায় বসিয়া একেলা
কোকিলার সম করিব গান।
চন্দ্র করোজ্জ্বলে উজ্জ্বল হইয়া
ফুল-আস্তরণে রহিব শুঁয়ে,
মৃদুল বাতাসে ঘুমা'ব হরষে
শেফালি যেমন ঘুমায় ভুঁয়ে।
কভুবা পরিয়া রত্ন-আভরণ
সিন্দুরে রঞ্জিত করিব সিঁথি,
কভুবা ফেলিয়া বসন-ভূষণ
পরিব কুসুম-মালিকা গাঁথি'।
কভু এলো কেশে লুণ্ঠিত অঞ্চলে
সারা নিশি র'ব কুসুমবনে,—

চন্দ্রও আমারে তুষিবে যতনে
তারাও চাহিবে নয়ন-কোণে।
নিকুঞ্জ-কাননে নব জল-কণা
ধুইয়া ফেলিবে এ দেহ-লতা,
শিশিরে হইয়া অর্দ্ধ নিমগন
শ্বেত সুঁদী সম শোভিব তথা।
আ মরি কি সুখ!—কি সুখ আমরি!—
পাগলিনী সবে আমারে কয়;—
আমারি ব্রহ্মাণ্ড,—আমারি ব্রহ্মাণ্ড,—
এ ব্রহ্মাণ্ড আর কাহার নয়।
আকাশের তারা, ধরার কুসুম,
জলের লহরী,—আমারি সব;—
আমারি কারণ বনে লতা পাতা,
আমারি কারণ পাখীর রব।
যথা ইচ্ছা যাই, যাহা ইচ্ছা খাই,
মনের আনন্দে বেড়াই ঘুরে;
পাগলিনী হ'য়ে বেঁচে থাকি আমি—
সাধু ম'রে যা'ক স্বরগ-পুরে।

শিক্ষা-ব্যভিচার।

ফলভেদে শিক্ষা দুই প্রকার—প্রকৃত শিক্ষা ও শিক্ষার ব্যভিচার। কুশিক্ষা, নীচ শিক্ষা, বিকৃত শিক্ষা, ও শিক্ষার অপব্যবহারকে এস্থলে শিক্ষা-ব্যভিচার বলিয়া গণ্য করা হইল। সুশিক্ষার দ্বারা যে সকল ফল লাভ করা যায়, কুশিক্ষায় তাহার বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষার ফল সাধারণতঃ প্রবৃত্তি সকলের পুষ্টিসাধন করা ও শিক্ষার মাত্রানুসারে সেই পরিপুষ্ট প্রবৃত্তি

অনুযায়ী কর্ম্ম করা। শিক্ষার অল্পতা নিবন্ধন তাহার ফলও অল্প হইয়া থাকে,—অর্থাৎ, প্রবৃত্তি সকল কেবল পুষ্টতা লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয়—তাহা কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয় না; পরন্তু, যে স্থলে শিক্ষা অধিক, তথায় ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে,—অর্থাৎ প্রবৃত্তি সকল পূর্ণ বলাক্রান্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সুতরাং সুশিক্ষার ফলে সৎপ্রবৃত্তি গুলি জাগরিত হইয়া অসৎ প্রবৃত্তি সকল নষ্ট করিয়া ফেলে, অপর দিকে কুশিক্ষা স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট ও অসৎ প্রবৃত্তি সকলকে উজ্জীবিত করিয়া মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। অতএব, সুশিক্ষা যত অধিক এবং কুশিক্ষা যত অল্প হয়, সংসারে ততই মঙ্গল। শত অশিক্ষিত অপেক্ষা একটী কুশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা যে অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হয় না। কত উন্নতমুখী প্রতিভা, কত অলোকসামান্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কত স্বার্থশূন্য সহানুভূতি, এই শিক্ষা-ব্যভিচারের ফলে আপনার জাতি, আপনার সমাজ, আপনার দেশকে জাতীয় কলঙ্কে ডুবাইয়া রাখে, কে তাহার গণনা করিতে পারে?

মানবসমাজে যত প্রকার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শিক্ষা-ব্যভিচার অনিষ্ট সাধনের সর্ব্বপ্রধান হেতু। কেননা, শিক্ষা-ব্যভিচার হইতেই সর্ব্ববিধ অন্য জাতীয় ব্যভিচার দেশ মধ্যে প্রচলিত হয় ও জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় স্বরূপ সকল প্রকার অমঙ্গলের নিদান হইয়া জন সাধারণের মধ্যে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। জন সাধারণ সকল দেশে সকল সময়ে ন্যূনাধিক অজ্ঞ, স্ব স্ব ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে অক্ষম,—উপস্থিত অমঙ্গল হইতে উদ্ধার পাইয়া চিরস্থায়ী মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়া, প্রকৃত শিক্ষিতের দ্বারা পরিচালিত না হইলে, তাহাদিগের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। মানবেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতীয় উন্নতি জনসাধারণের উন্নতির সহিত এক সূত্রে গ্রথিত, একের উন্নতির সহিত অপরের উন্নতি অপরিহার্য্য। এরূপ অবস্থায় প্রকৃত শিক্ষিতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া যদি কুশিক্ষিত বা বিকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা দেশের জন-সাধারণ পরিচালিত হয়, তাহা হইলে পরম কল্যাণকর জাতীয় উন্নতির আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে, প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা অশিক্ষিত লোকের তুলনায় নিতান্ত অল্প, পরন্তু কুশিক্ষিতের সংখ্যাও প্রকৃত শিক্ষিতের

অপেক্ষা অনেক অধিক; সুতরাং এই বিকৃত শিক্ষিতমণ্ডলী আপনাদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ সহজেই অশিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে স্ব স্ব স্বার্থ-প্রণোদিত দায়িত্ববিহীন মতামত প্রচার করিয়া সমাজের ও দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। প্রকৃত শিক্ষা আপাতদৃষ্টিতে নীরস, কঠোর, জ্যোতিহীন; পক্ষান্তরে, বিকৃত শিক্ষা তদবস্থায় সরস,কোমল, চাকচিক্যময়ী। সুতরাং অজ্ঞ নিরীহ জনসাধারণ সহজেই কুশিক্ষিতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহারই প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া আপনার অশুভ আপনি ডাকিয়া লয় ও সুশিক্ষিতের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জাতীয় উন্নতিকে নিরাশার অতল সাগরে ডুবাইয়া দেয়। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে এই শিক্ষা-ব্যভিচারের প্রভাব চিরদিন কার্য্যকরী না হইলেও যে বহুদিন পর্য্যন্ত সমাজের অস্থিমজ্জা চর্ব্বণ করিতে থাকে এবং জনসাধারণ যে বহুকাল পর্য্যন্ত উহার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আঘোর নিদ্রায় কালযাপন করে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। অধুনা ভারতবর্ষ জাতীয় অবনতির অন্তিম সীমায় ও নব জীবনের মূলে সমুপস্থিত। এই মহা সন্ধিস্থলে, দুর্ভাগ্যক্রমে, কুশিক্ষিত লোকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ও শিক্ষা-ব্যভিচারের অবশ্যম্ভাবী ফলের বিষয় স্মরণ করিয়া মনে স্বতঃই ভাবনা উপস্থিত হয় এবং দেশের শুভাশুভ চিন্তা করিয়া এই সমাজ-কীট-ধুরন্ধরদিগের নির্দ্দেশ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার লক্ষণ ভেদ করিতে পারিলেই এই মহা-ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় বাহির হইতে পারে এবং ভবিষ্য বংশধরগণ যাহাতে এই শিক্ষাব্যভিচারের হস্ত হইতে রক্ষা পায় তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিলেই কালে নির্ম্মল পবিত্র তেজোময়ী শিক্ষায় দেশের সকল দুঃখ-দুর্গতি বিদূরিত হইয়া জাতীয় মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে।

শিক্ষা-ব্যভিচারের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ ঐতিহাসিক সত্যে অনাস্থা প্রদর্শন। যেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক সত্যে অবিশ্বাস বা অনাদর করা হইতেছে, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে তাহা কুশিক্ষার বিষময় ফল অথবা নিদর্শন। প্রকৃত শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী; ঐতিহাসিক সত্য তাহার প্রাণ, জ্ঞান,—তাহার জীবন-পথের আঁধার ঘুচাইবার একমাত্র দীপশলাকা। উত্থান-পতন, মঙ্গল-অমঙ্গল, মানবজগতের আদিম অবস্থা হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক জনসমাজে ঘটিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস প্রত্যেক উত্থান-পতন, প্রত্যেক মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ

দেখাইয়া উপস্থিত পতন হইতে রক্ষা ও ভবিষ্যৎ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উত্থান ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিতেছে। ঐতিহাসিক সত্য দেববাণী,—শিক্ষা-ব্যভিচারগ্রস্ত মহাপাতকী সে অমৃত ডাক শুনিতে পায় না, প্রকৃত সুশিক্ষিত ব্যক্তিই ঐ মহা আহ্বান শুনিবার একমাত্র অধিকারী।

দুর্ব্বলতা শিক্ষা ব্যভিচারের অন্যতম লক্ষণ। আসর বুঝিয়া কীর্ত্তন, করতালি লেহন ও অল্প বাত্যায় পদস্খলন, দুর্ব্বলতা-পরিচায়ক। এইরূপ দুর্ব্বল লোকের মতের স্থিরতা নাই, কথার সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য নাই, ন্যূন পক্ষে একটা ফলহীন চেষ্টাও নাই,—কেবল স্বার্থপরতা, কেবল বাদবিতণ্ডা, কেবল নীচপ্রাণতা। ইহারা কঠোর সত্য প্রকাশে কুণ্ঠিত,—শ্রুতিসুখকর তোষামোদ যোগাইতেই ব্যতিব্যস্ত। এই সর্ব্বনাশকর দুর্ব্বলতার অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

সহজাত সংস্কারে নির্ভরতা শিক্ষা-ব্যভিচারের আর একটী লক্ষণ। সংস্কারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, সংস্কার সীমার বহির্গমনে একান্ত বিমুখ, আপন অন্ধ সংস্কার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, এই পেচক জাতীয় শিক্ষাব্যভিচার-গ্রস্ত মহামহোপাধ্যায়েরা যাহাতে জ্ঞানসূর্য্যের রেখা মাত্র তাঁহাদের চক্ষে প্রবেশ না করে, সে জন্য সদা সতর্ক। শ্রবণেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিয়াছেন,—পাছে কোন নূতন তত্ত্ব সেই বড় সাধের বহু পুরাতন ভঙ্গপ্রবণ সংস্কারটী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এই চিন্তায় তাঁহারা সদাই সশঙ্কিত।

শিক্ষা-ব্যভিচারের আর একটী মাত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গৃধিনী যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে মৃতদেহের আশায় বসিয়া থাকে, এই শিক্ষিত নামধারী সম্প্রদায় সেইরূপ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের কুৎসা গাহিবার জন্য অনুকূল অবস্থা অন্বেষণ করিয়া বেড়ান এবং সুযোগ পাইলেই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বোধ হয় যেন স্বশরীরে স্বর্গ-সুখ ভোগ করেন। ফলতঃ, যে শিক্ষায় একটা দেবতার ভাব—একটা স্বর্গের ভাব—নাই, যে শিক্ষায় কেবল আসুরিক তাণ্ডব ব্যাপার, তাহাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধোক্ত "শিক্ষা-ব্যভিচার" পদবাচ্য।

অপূর্ব্ব বাসর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিত্র সন্নিধানে।

অন্যমনে চলিতে চলিতে প্রবোধচন্দ্র গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। দারুণ দুঃস্বপ্নবশে, সুনিদ্রার অভাবে, তাঁহার শরীর অবসন্ন,—চিত্ত স্ফূর্ত্তিবিহীন,—উষার মনোমুগ্ধকর রূপচ্ছটাও তাঁহার চিত্তবিকৃতি দূর করিতে পারিল না। তিনি উদাস প্রাণে অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন,—তখনও ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিম গগনে মৃদু হাসি হাসিতেছে, আশে-পাশে দুই-চারিটি ক্ষীণতর নক্ষত্র নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে, নৈশ শোভায় ক্ষীণরেখা অস্ফুট স্মৃতির ন্যায় তখনও যেন স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। সম্মুখে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী অলসগমনা তরুণীর ন্যায় প্রশান্ত মন্থর গতিতে বহিয়া যাইতেছে। নিশাবসান বুঝিয়া দুই একটি শৃগাল তট-প্রান্তে দাঁড়াইয়া চক্-চক্ করিয়া জলপানানন্তর অদূরস্থ বন মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অন্যমনে প্রবোধচন্দ্র গত রজনীতে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—যেখানে তাঁহার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী সেই সুবর্ণপ্রতিমা হৃদয়ভরা হাসি হাসিয়া তাঁহার অন্তরে অমৃতরাশি সিঞ্চন করিয়াছিল—সেই খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে কে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল, চমকিত হইয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন—যোগেন্দ্রনাথ।

যোগেন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রের বাল্যসখা। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশ বৎসর, হস্ত-পদ সুদৃঢ়, বক্ষঃ বিস্তৃত—দেখিলেই অপরিমিত বলশালী বলিয়া বোধ হয়। যোগেন্দ্র এই তরুণ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আলিপুরের আদালতে ওকালতী করেন। অত্যল্পকাল মধ্যে এ ক্ষেত্রেও তিনি বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন—সকলেই তাঁহাকে একজন সুদক্ষ উকীল বলিয়া জানে। সংসারে যোগেন্দ্রনাথের মাতা, সহধর্ম্মিণী ও এক কনিষ্ঠা ভগ্নী ভিন্ন অপর কেহই নাই। ভগ্নীর নাম সরোজ,—সরোজ হেম-লতার 'সই'। যোগেন্দ্রনাথ উপযুক্ত সময়ে বীরনগরের কোন সুবিখ্যাত

ধনাঢ্যের গৃহে সরোজের বিবাহ দিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই যোগেন্দ্র-নাথ আপনাকে সংসারের মধ্যে একজন পরম সুখী পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন।

যোগেন্দ্রনাথের অনেক গুণ। বিশেষতঃ তাঁহাকে দয়ার অবতার বলিয়া বোধ হয়। দরিদ্রের দুঃখমোচন করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। যেখানে কোন বিপন্ন লোক বিপদভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যোগেন্দ্রনাথ সেই খানে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট। বস্তুতঃ, দরিদ্র-প্রতিপালন তাঁহার জীবনের একমাত্র মহাব্রত বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের পরিবার অল্প বটে, কিন্তু তাঁহার পোষ্য অনেকগুলি। কলিকাতার বাসায় অনেক লোক,—অনেকগুলি অনাথ দরিদ্র বালক তথায় থাকিয়া লেখাপড়া করে, অনেক নিঃসহায় ভদ্র-সন্তান তথায় থাকিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করে। যোগেন্দ্রনাথ তাহাদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, এবং কোনরূপ আধিব্যাধিতে স্বয়ং তাহাদিগের শুশ্রূষা করেন। যোগেন্দ্রনাথ, বাস্তবিক, অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল।

যোগেন্দ্রনাথ ওকালতী করেন বটে, কিন্তু অর্থপিশাচ নহেন। সামর্থ্যা-নুসারে সন্তুষ্ট হইয়া যে যাহা দেয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন, এবং কোন নিঃস্ব লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে,—তাহার নিকট হইতে কিছু লওয়া দূরে থাকুক—তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয়ভার পর্য্যন্ত স্বয়ং বহন করেন ও তাহার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া স্বীয় পরিশ্রমের সমুচিত প্রতিদান বোধ করেন। তাঁহার আমায়িকতা ও সার্ব্বজনীন সহানুভূতি দেবতাদুর্ল্লভ বলিয়া বোধ হয়,—তাঁহার হাস্যোৎফুল্ল মুখাবলোকন করিলে হৃদয়ের দুঃখ-যাতনা দূরে চলিয়া যায়।

বিশেষ কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ না হইলে যোগেন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাটী আসিয়া থাকেন। গত রজনীতেও তদ্রূপ বাটী আসিয়াছেন এবং অভ্যাসমত প্রত্যূষে মুক্ত বায়ু সেবনার্থ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছেন। অদূরে প্রবোধচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া তিনি দুই তিন বার তাঁহাকে ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। একাকী প্রত্যূষে নদীতীরে এরূপ অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার হেতু কি জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে প্রবোধচন্দ্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ

করিলেন। প্রবোধচন্দ্র চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। যোগেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে?—এরূপ ভাব কেন?"

যোগেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নে কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া প্রবোধচন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ পুনরপি কহিলেন—"চুপ করিয়া রহিলে কেন?—বুঝিয়াছি, তোমার অন্তরে কোন গোপনীয় কথা রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিবে কি না ভাবিতেছ। ভাল, উহা যদি এতই গোপনীয় হয় যে আমার সমক্ষে বলিতেও তোমার সঙ্কোচ জন্মে, তবে বলিয়া কাজ নাই—অনর্থক হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই।"

প্রবোধচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাল্যসুহৃদের দক্ষিণ হস্ত আপন হস্তমধ্যে লইয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন, এবং এতক্ষণ বলিবার পক্ষে ইতস্ততঃ করার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, একে একে হেমলতার সহিত প্রথম প্রণয়-সঞ্চারের ঘটনা হইতে গত রজনীর সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন,—কেবল হেমলতার প্রতি শ্যামাচরণের দুর্ব্ব্যবহারের কথা গোপন করিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সমস্ত শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন—"এই সামান্য কারণে এতদুর চিন্তিত হইবার কারণ কি? আমি অদ্যই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় ঠিক করিব।"

প্রবোধচন্দ্র নিষেধ করিয়া বলিলেন—"না, ভাই, তাঁহাকে একথা এখন বলিও না।"

যোগেন্দ্র। কেন?

প্রবোধ। বিশেষ কারণ আছে।

যো। কি কারণ, শুনিতে পাই না?

প্র। আমার সহিত হেমলতার বিবাহ দিতে অমত।

যো। কাহার অমত?—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের?

প্র। না, তাঁহার নয়—তাঁহার ভগ্নীর।

যো। ভাল, তাহা আমি বুঝিব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত হইলে, তাঁহার ভগ্নীর অমতে কি হইবে?—ওকালতীটা এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়াছে, এখন একবার দেখিব ঘট্‌কালীটা করিতে পারি কি না!—আমার বিশ্বাস,

উকীলরা ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া ঘট্‌কালী-ব্যবসা আরম্ভ করিলে বিলক্ষণ পসার করিতে পারে!

এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে প্রবোধচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু হেমলতার পিতার নিকট তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। বাটী গিয়াই এক পত্র পাইলেন, তদনুসারে কোন অপরিহার্য্য কার্য্যোপলক্ষে সেই দিনই তাঁহাকে বর্দ্ধমান যাত্রা করিতে হইল। গমনোপযোগী আয়োজনের ব্যস্ততা প্রযুক্ত তিনি আর প্রবোধচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভট্টাচার্য্যের সংসার।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কন্দর্পপুরের মধ্যে একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। বিশেষতঃ গ্রামের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং কিছু কিছু ভয়ও করিত। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার সহধর্ম্মিণী সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। পুত্রটির বয়স তখন ছয় বৎসর,—কন্যা হেমলতা তখন নয় বৎসরের। ব্রাহ্মণী হেমলতাকে বড় ভাল বাসিতেন; তাঁহার মনে কত আশা ছিল, হেমলতার বিবাহ দিয়া কত আনন্দোৎসব করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কাল অকালে তাঁহাকে সে সাধে বঞ্চিত করিল। মৃত্যুকালে সজল নয়নে তিনি স্বামী সন্নিধানে শেষ প্রার্থনা করিয়া যান,—যেন তাঁহার হেমা সৎপাত্রে ন্যস্ত হয়, যেন স্বামী-সুখে সে সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে।

পত্নী-বিয়োগের পর সন্তান দুইটীই ব্রাহ্মণের সংসারের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগের মুখ চাহিয়া পত্নী-শোক বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু অচিরে বিধাতা তাঁহাকে সে সুখেও বঞ্চিত করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁহার শিশু পুত্রটীও ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া জননীর অনুগামী হইল। তখন হেমলতাই ব্রাহ্মণের নিদারুণ শোকাপনোদনের একমাত্র শান্তিস্থল হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ তাহাকে এক দণ্ড

না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না,—আহারের সময় হেমলতা নিকটে না থাকিলে তাঁহার আহারই হইত না। কন্যার মনস্তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন, সে যখন যাহা চাহিত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিতেন,—হেমলতার মত ভাল ভাল পুতুল তাহার সমবয়স্কদিগের মধ্যে অপর কাহারও ছিল না। কিন্তু এত আদরের মধ্যেও তিনি তাহাকে কন্যাজনোচিত সৎশিক্ষা দিতে বিস্মৃত ছিলেন না।—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"—মহাজনোক্ত এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি কন্যাকে যথারীতি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন এবং তাহার তীক্ষ্ণ মেধা দেখিয়া পরম পুলকিত হইতেন।

সায়ংকালে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া শিবপ্রসাদ প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন, এবং জ্যোৎস্না রজনীতে কন্যা হেমলতাকে তথায় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি যখন সন্ধ্যাবন্দনাদিতে তন্ময় হইয়া থাকিতেন, হেমলতা তখন আপন মনে বসিয়া কৌমুদীপ্লাবিত গঙ্গাবক্ষে স্বভাবের অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিত এবং তটপ্রহত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালার সহিত কত কি কলহ করিত! ধ্যানান্তে শিবপ্রসাদ কন্যার ঐরূপ ভাব দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতেন, তখন হেমলতা লজ্জিতা হইয়া উত্থান পূর্ব্বক পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিত। যে রাত্রে গঙ্গার ঘাটে হেমলতার সহিত প্রবোধচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, সেই রাত্রে হেমলতা গঙ্গাতীরে আসিবার জন্য পিতার সন্ধান করে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি একাই তথায় গমন করিয়াছেন ভাবিয়া, অভিমান ভরে পিতার উদ্দেশে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়; পরে যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে এখন একমাত্র দুহিতা—হেমলতা, ও এক কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী—দিগম্বরী। দিগম্বরী অল্প বয়সেই শ্বশুর-কুল নির্ম্মূল করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নীবিয়োগের পর অবধি দিগম্বরী সংসার-পর্য্যবেক্ষণের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দিগম্বরী নামেও যেমন, কাজেও তদ্রূপ—অকপট, প্রফুল্ল, হাস্যময়ী। তাহার হাসির ঝঙ্কারে প্রতিবাসীর তিষ্ঠান ভার!—দিগম্বরীর এত হাসির কারণ কি, সেই বলিতে পারে। তাহার আর এক গুণ—সে গল্প পাইলে আর কিছুই চাহে না! একদা জন কয়েক প্রতিবেশিনী চক্রান্ত করিয়া দিগম্বরীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেল এবং পথমধ্যে এক

গল্প আরম্ভ করিল; সঙ্গিনী সকলে গল্পের সঙ্গে স্নানাদি সমাপন করিয়া তীরে উঠিল,—দিগম্বরীর চৈতন্য নাই, সে অনন্যমনে অবাক্ হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া সেই গল্প শুনিতে লাগিল; গল্প করিতে করিতে সকলে গৃহে ফিরিল, দিগম্বরী সেই অস্নাত অবস্থাতেই তাহাদের অনুগমন করিল; তখন সকলে উচ্চ হাসি হাসিয়া তাহার চমক ভাঙ্গাইয়া দিল,—দিগম্বরীও সেই সঙ্গে হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল, এবং সেই হাস্যের তুফানে কন্দর্পপুর তোলপাড় করিতে করিতে পুনশ্চ একা গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। এতদ্ভিন্ন দিগম্বরীর আরও একটী গুণ ছিল—তাহার মনোমত কাজ না হইলেই সে নাকে কাঁদিতে বসিত! শিবপ্রসাদ এই নিমিত্ত তাহাকে "দিগী পাগ্‌লী" বলিয়া ডাকিতেন! কিন্তু তাহাতে নাকে কান্না উপশমিত না হইয়া বরং দুই চারি গ্রাম উপরে উঠিত!

দিগম্বরী অন্যথা যাহাই হউক, হেমলতাকে সে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত। হেমলতা যে মাতৃহীনা, সে তাহা এক দিন—এক মুহূর্ত্তেরও জন্য তাহাকে জানিতে দেয় নাই। হেমলতার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দিগম্বরী সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু ভবিতব্যতার দুর্ল্লঙ্ঘ্য সূত্রে এক বিষয়ে সে অজানিত ভাবে হেমলতার আজীবন নিরানন্দের হেতু হইয়া দাঁড়াইল।—কন্যা বয়ঃস্থা দেখিয়া তাহার বিবাহের জন্য শিবপ্রসাদ নানাস্থানে পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বংশমর্য্যাদায় বা গুণপরম্পরায় তাহার অনুরূপ পাত্র না মিলাতে অবশেষে প্রবোধের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। দিগম্বরীর ইহাতে সম্পূর্ণ অমত; ভিন্ন গ্রামের জামাই হইলে প্রতিবাসী পাঁচ জন দেখিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে,প্রবোধের ন্যায় "ঘ'রো" জামাই হইলে তাহার কিছুই হইবে না—শিবপ্রসাদের সংকল্পিত সম্বন্ধে দিগম্বরীর অমতের ইহাই একমাত্র হেতু। সুতরাং শিবপ্রসাদ, আপনার নিতান্ত ইচ্ছা স্বত্বেও, ভগ্নীর অমতে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই—অন্যত্র পাত্রানুসন্ধান করিতেছিলেন।

অন্যত্র বিবাহের কথা উঠিলেই কিন্তু হেমলতা বিমর্ষ হয়। আবার আজ কয়েক দিন হইতে সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। তাহার সেই পূর্ব্ববৎ বালস্বভাব-সুলভ চাঞ্চল্য নাই, অধর-প্রান্তে সরল সুমধুর হাসির রেখা নাই, সঙ্গিনীদিগের নিকট পূর্ব্ববৎ গতিবিধি নাই। সে এখন সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে, বসিয়া বসিয়া কি- ভাবে,—ভাবিতে পাইলেই যেন তাহার অন্তরে

আনন্দ জন্মে। সে আর এখন বহির্ব্বাটীতে যায় না, পূর্ব্বে যাহার পড়া শুনিবার জন্য সে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত—এখন আর তাহার সম্মুখে বাহির হয় না, তাহার কথা উত্থাপিত হইলেই যেন সে শিহরিয়া উঠে। কেন এমন হইল?—সেই নির্ম্মল চন্দ্রকরবিধৌত সুধাময়ী যামিনীতে যাহার হৃদয় মধ্যে মস্তক রাখিয়া হেমলতা আপন হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, যাহার অন্তরে অপার্থিব সুখের অমৃতময় উৎস প্রথম প্রবাহিত করিয়াছিল, যাহাকে একবার মাত্র দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, আজ কি হেমলতা তাহাকে ভুলিতে পারিবে?—তাহাও কি সম্ভবে? তবে হেমলতার এ ভাব কেন?

সেই দিন, সেই কৌমুদীপ্লাবিত রজনীতে, সেই প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীতীরে, সেই আপনা-বিস্মৃত উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে, প্রবোধচন্দ্রের সমক্ষে হেমলতা যে হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বাটী ফিরিয়া অবধি এখন তাহার তাহাই চিন্তা হইয়াছে। সে আপনাকে কত তিরস্কার করে,—ভাবে, হয় ত প্রবোধচন্দ্র তাহাকে নির্লজ্জা বলিয়া কত ঘৃণা করিতেছেন, তাহার উপর কত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার বাচালতার জন্য মনে মনে কত ভৎর্সনা করিতেছেন,—ভাবে, কেন এত দুর্ব্বল হইলাম? যে বল এত দিন হৃদয় মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, কেন তাহা সহসা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম? প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া কেন দর্শন-সুখের পথও রুদ্ধ করিলাম? আবার পরক্ষণেই মনে করে, কেন আমার দোষ কি? যাঁহার হৃদয় তাঁহারই নিকট উন্মুক্ত করিয়াছি, তাহাতে দোষ কি? অন্যের দৃষ্টিতে হয় ত দোষী হইতে পারি, কিন্তু তিনি আমাকে কখনই দোষী ভাবিবেন না। এইরূপ নানা চিন্তায় হেমলতা দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। দিগম্বরী হেমলতার এই অবস্থান্তরের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর না পাইয়া, তাহার স্বভাবসুলভ 'নাকে কান্না' আরম্ভ করিল। হেমলতা চিত্তবেগ সম্বরণ করিয়া 'কাষ্ঠ-হাসি' হাসিয়া 'পিসীমা'র আনন্দ বর্দ্ধনে চেষ্টা করে, কিন্তু পরক্ষণেই বিমর্ষতা অলক্ষ্যে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসে।

দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

ষষ্ঠীপালা।

মন্ত্রণা।—প্রথমাংশ।

সীতার উদ্দেশ পা'য়া দেব ভগবান। পুনঃ জিজ্ঞাসেন প্রভু বল হনুমান॥
সমুদ্র গম্ভীর কত বটে পরিমাণ। জলের তরঙ্গ তার কেমত বিধান॥
লঙ্কাপুরী দেখিলে সে কেমত দুর্গম। বিবরণ বলিয়া মিটাহ মন-ভ্রম॥
কৃতাঞ্জলি করি' কয় কেশরী-কুমার। (১) পয়োধি পাতাল ভেদী অগাধ অপার॥
উর্দ্ধেতে আকাশ স্পর্শে ভাসে নক্রগণ। মকর ব্যাকার (২) তায় মীন অগণন॥
ঊর্ম্মির উপরে কূর্ম্মী-কূর্ম্ম কত ভাসে। জলধির ধ্বনিতে ধরণী পায় ত্রাসে॥ (৩)
মহী হ'তে লঙ্কাপুরী শতেক যোজন। অসাধ্য অভেদ্য হয় শুন নারায়ণ॥
প্রভু ক'ন তবে তুমি লঙ্ঘিলে কেমনে। শুনে ভয় হয় তার বল বিবরণে॥ (৩)
হনুমান ক'ন শুন প্রভু কৃপানিধি। সামান্যের কিবা সাধ্য লঙ্ঘিতে বারিধি॥
ভব সিন্ধু হৈতে এ সমুদ্র বড় নয়। তব নাম-গুণে পঙ্গু সেহ পার হয়॥
পবনের পুত্র (১) আমি তাথে তব দাস। মম হৃদি-কমলে সতত তব বাস॥

---

(১) কেশরী-কুমার, পবনের পুত্র=হনুমান। কেশরী নামক বানরের ক্ষেত্রে পবন কর্ত্তৃক হনুমানের জন্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

"অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুনা।
জাতঃ কমলপত্রাক্ষ হনুমান্নাম বানর॥"
—মহাভারত।

(২) ব্যাকার=প্রকাশ।

(৩) ত্রাসে, বিবরণে=ত্রাস, বিবরণ। কবিতায় চরণ মিলাইবার অনুরোধে এই সকল পদ সপ্তম্যন্ত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতেব প্রাকৃত সিন্ধু গোষ্পদ সমান। আমি কি লঙ্ঘিব?—দাসে তুমি কৈলে ত্রাণ॥
ত্রিকূট-উপরি লঙ্কা শঙ্কাযুত অতি। স্বর্ণের সকল ভূমি ভানু সম ভাতি॥
কনক-প্রাচীর বেড়া চতুর্দ্দিকে জল। নানা উপবন ব্যাপী তড়াগ নির্ম্মল॥
বিচিত্র চিত্রিত ঘর মণিস্তম্ভযুত। পশ্চিম দ্বারের দ্বারী গজবাহ কত॥
উত্তরের দ্বার রাখে যত অশ্ববাহে। অসংখ্য ঘোটক-যোদ্ধা পূর্ব্বদ্বার তাহে॥
দক্ষিণ দ্বারেতে যত রথী মহারথী। মধ্যকক্ষে অসংখ্য বাহিনী আছে তথি॥
ভ্রাতা যার কুম্ভকর্ণ পুত্র ইন্দ্রজিত। যার খড়্গ চন্দ্রহাস জগত বিদিত॥
পুরীখান দীপ্তিমান নানা সু-অস্ত্রেতে। ত্রিলোক ত্রাসিত সদা রাবণ-তেজেতে॥
দশানন বলবান বিদিত সংসারে। শঙ্কর-শঙ্করী-পদ সদা সেবা করে॥
পূর্ব্বে হর গৌরী বর দিলেন রাবণে। সমরে সহায় মোরা হ'ব দুই জনে॥
শূল খড়্গ ধরি' রণে অগ্রেতে থাকিব। তোর সনে সবে রণে পরাজয় হব॥ (৪)
পশুপতি পার্ব্বতীতে পুত্রভাবে গণে। তেকারণে ত্রিজগতে তৃণতুল্য মানে॥
অমরের অসাধ্য এ লঙ্কা জিনিবারে। কিন্তু তব দাস হনু' তৃণবুদ্ধি করে॥
তব কোপানলে, সীতা মাতার নিশ্বাসে। হেন লঙ্কা ভস্মরাশি করিনু নিমেষে॥
রাবণের যত সৈন্য তার চতুর্থাংশ। তব চরণের তেজে তাহা কৈনু ধ্বংস॥
তুমি আদি দেব কিবা ভাব মনে মন। ভ্রূভঙ্গে নাশিতে পারে এ চৌদ্দ ভুবন॥
ভক্তের প্রভাব জানাইতে ভূমিতলে। দাসের দ্বারেতে সর্ব্ব কর্ম্ম কর ছলে॥
গৌণ ত্যজ মৌন না করহ রঘুমণি। দিব্য দিয়াছেন দেবী জনকনন্দিনী॥
মাস দুই বই প্রাণ না রাখিবে সীতা। বিলম্বে তাঁহার হত্যা তোমারে সর্ব্বথা॥
ভক্তিদর্প (৫) কথা শুনি' রঘুমণি ক'ন। ধন্য হনুমান পুত্র আমার জীবন॥

(৪) হব—হইবে।—সাহিত্য-সেবক ২য় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠায়, ২য় টিপ্পনী দেখুন।
(৫) ভাবিয়ে—ভাবহ। হিন্দী ভাষায় 'ভাবুন' অর্থে এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

জগতের যত জীব হৃদে ভাবে মোরে। হেন আমি হৃদে পুনঃ ভাবিহে তোমারে॥
ব্যক্ত বলি,—ভক্ত তুমি মুক্ত নিরন্তর। তোমাতে বিক্রীত আমি শুন কপিবর॥
তার পর সুগ্রীবেরে ক'ন ভগবান। বল মিতা সীতার উদ্ধার অনুষ্ঠান॥
অসাধ্য সাধন কৈল সচিব তোমার। তুমি কি করিবে মৈত্র বল সারোদ্ধার॥
কপি কয় মহাশয় না ভাব অন্তরে। লঙ্কা জয়ে শঙ্কা কিবা ধনু লহ করে॥
সকলেতে শত অক্ষৌহিণী সেনা হ'ব। সীতার উদ্ধারে সবে অগ্রে প্রাণ দিব॥
ইথে না হইবে যবে তবে ভেব তুমি। যাত্রা কর জনার্দ্দন জগতের স্বামী॥
প্রভু ক'ন বটে মিতা সে কথা নিশ্চয়। মোর ভাবে প্রাণ দিবে সে অন্যথা নয়॥
কিন্তু সাম দান দণ্ড ভেদ চারিমতে। মন্ত্রণা আছয়ে মৈত্রে সকল কর্ম্মেতে॥
হঠাৎকারে কর্ম্ম কৈলে ক্লেশ অতিশয়। বিচারি' বিহিত কৈলে বিপদ না হয়॥
উপায় করিয়া গেলে আয়াস ঘুচিবে। উপক্রম না করিলে শ্রমসাধ্য হ'বে॥
সুগ্রীব বলেন নাথ এই সমুচিত। অনায়াসে কার্য্য লয় সে জন পণ্ডিত॥
কি বিধান অনুষ্ঠান করিলে আপনে। বিবরিয়া বলহ বানরে নিজ গুণে॥
দুর্গাপঞ্চরাত্রি গায় জগত দুর্ম্মতি। ভব-ভয়ে ভরসা কেবল ভগবতী॥

মন্ত্রণা।—শেষাংশ।

সুগ্রীবে উপায় ক'ন দেব রঘুমণি। রাবণ সতত সেবে শিবা শূলপাণি॥
ভক্তিতে ভজিয়া ভুলা'য়েছে ভোলানাথে। সে ভাবে ভবানী-ভব আছেন লঙ্কাতে॥
পুত্রভাবে ভগবতী দিয়াছেন বর। তাঁর তেজ ধরে সেই রাজা লঙ্কেশ্বর॥
বিবরণ সকল বলিল হনুমান। অতেব ভাবিয়ে (৫) মৈত্র তাঁর অনুষ্ঠান॥
যে কালে লঙ্কাতে যা'ব রাবণে বধিতে। অব্যাজে আনিবে রাজা সংগ্রাম করিতে॥

(৫) ভাবিয়ে—ভাবহ। হিন্দী ভাষায় 'ভাবুন' অর্থে এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

পরাভূত হ'য়া দ্রুত যাইব (৬) ভবনে। সঙ্কটে সেবিব(৬)শিব-দুর্গার চরণে॥
ভক্তের দুঃখেতে দুঃখী হ'য়া দুই জনে। রক্ষা জন্য যদি বা আসেন মোর স্থানে॥
রাবণে অভয় দিতে বলিবেন হর। রাক্ষসে করিতে হ'বে অজর অমর॥
সঙ্কট আগামী আমি বলিনু প্রচারি'। ইহার বিধান বল বানরাধিকারী॥
শিব কিম্বা আমি ভক্তে এড়াতে নারিব। জানকীর উদ্ধারের উপায় কি হব (৬)॥
সুগ্রীব বলেন নাথ এ বড় আনন্দ। বিনা যুদ্ধে সীতারে পাইব রামচন্দ্র॥
আয়াস ঘুচিল ইথে ভাব মনে মনে। সীতাভেট দিয়া শিব মাগিব (৬) রাবণে॥ (৭)
রাবণ করুক রাজ্য আপন লঙ্কাতে। আমরা অযোধ্যা যা'ব সীতা ল'য়ে সাথে॥
শ্রীরাম বলেন মিতা পূর্ব্ব কথা বলি। যে কালে হরণ হৈলা প্রাণের মৈথিলী॥
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যেবা হরিলা বণিতা। সবংশে বধিয়া তা'রে উদ্ধারিব সীতা॥
রাবণে অভয় দিলে নষ্ট হ'বে পণ। শ্রীরামের নাই কভু দ্বিতীয় বয়ন॥
বিফল সন্ধান মোর নাহিক ধনুকে। মোর পণভঙ্গে পীড়া পা'বে তিন লোকে॥
নিজ নারী-ত্যাগ পারি—পণ-ত্যাগ নারি। বল হে সুগ্রীব মিতা কি উপায় করি॥
সুগ্রীব বলেন প্রভু এ কোন্ ভাবনা। দুষ্ট-নষ্টে (৮) শিব কেন করিবেন মানা॥
তোমার যে দ্রোহী বটে শিবদ্রোহী সে। অভিন্ন তোমাতে তাঁথে—কি আশ্চর্য্য এ॥
শ্রীরাম বলেন মৈত্র সে বটে নিশ্চয়। শিবরামে ভেদ হৈলে বেদ মিথ্যা হয়॥

---

(৬) যাইব, সেবিব, হব, মাগিব=যাইবে, সেবিবে, হবে, মাগিবে।—সাহিত্য-সেবক, ২য় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠা, ২য় টিপ্পনী দেখুন।

(৭) সীতাভেট দিয়া শিব মাগিব রাবণে=মহাদেব সীতা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক রাবণের প্রাণ ভিক্ষা করিবেন।

(৮) নষ্টে=নাশে, বিনাশ করিতে।

সেবকের উপরোধে সর্ব্ব কর্ম্ম হয়। ভক্তের ভাবেতে বেদ-বিধি নাহি রয়॥
কোন্ শাস্ত্রে বলিয়াছে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে। উচ্ছিষ্ট খাইনু কেন শবরীর (৯) স্থানে॥
চণ্ডাল করিতে স্পর্শ কোন্ বেদে বলে। সখা বলি' কোলে করি গুহক চণ্ডালে॥
বিপ্রনারী স্পর্শ করা না হয় উচিত। তারে পদরেণু দিনু—এ কোন্ বিহিত॥
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার হেতু। গর্ভবাস সহ্য কৈনু হ'য়া দেবকেতু॥(১০)
কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম ঘটে ভক্তের প্রীতিতে। ভক্তাধীন নাম তেই বলয়ে ভারতে॥
ভক্ত যে বচন বলে এড়া নাহি যায়। নিজ প্রাণ দিতে হয় ভক্তে যদি চায়॥
ভক্ত হ'তে প্রিয় নয় জনক-জননী। দাসের (১১) সদৃশ দারা-সুত নাহি গণি॥
বেদ-বিপর্য্যয় কর্ম্ম হয় ভক্ত হ'তে। সেবক সদৃশ বস্তু নাই ত্রিজগতে॥
অতেব নারিব শম্ভু (১২) বচন বলিতে। ভক্ত রক্ষা জন্য হর বলিব আমাতে (১৩)॥
বরঞ্চ থাকেন সীতা রাবণের গৃহে। উভয়ে অভেদ,—শিববাক্য লজ্ঘ্য নহে॥
সুগ্রীব বলেন নাথ তবে কি উপায়। কি বিধানে শিবের সঙ্কটে এড়া যায়॥
প্রভু ক'ন শুন মৈত্র শরৎকাল হইল। বসন্তে বাসন্তী চৈত্রে চণ্ডী-পূজা ছিল॥
অকালে অম্বিকা পূজা করিয়া আশ্বিনে। বিজয়া দশমী যাত্রা করিব দক্ষিণে॥

---

(৯) শবরী—তন্নাম্নী জনৈক বৃদ্ধা তাপসী। রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম্ সর্গে ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ঋষ্যমূক পর্ব্বতান্তর্গত পম্পা সরোবরের পশ্চিম তীরে বাস করিতেন, এবং রামচন্দ্রকে সুগ্রীবাদির সন্ধান বলিয়া দিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণাহুতি দিয়াছিলেন। তিনি তদীয় আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যার্থ পম্পাতীর সমুদ্ভূত নানাজাতীয় আরণ্য দ্রব্যজাত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাম শ্রদ্ধা সহকারে সেই সমস্ত আহার্য্য প্রতিগ্রহ করেন। এস্থলে জগদ্রামোক্ত উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

(১০) দেবকেতু—দেবশ্রেষ্ঠ (?)।

(১১) দাসের—ভক্তের।

(১২) শম্ভু—শম্ভুকে।

(১৩) বলিব আমাতে—বলিবে আমাকে।

আশুতোষী হ'ন সে ভবানী ভূতপতি। সাদরে সেবনেতে সন্তোষ ভগবতী॥
ভাব করি' ভজিলে ভুলেন ভোলানাথ। মনোভীষ্ট হয়, ক্ষয় যায় উৎপাত॥
নবীন বেম্বের পত্র ভাবে যদি দেয়। গালবাদ্য করি' তা'রা শিবে কিনে নেয়॥
নিজে দিগম্বর হর নাই আপন-পর। তুষ্ট না হইলে দেয় নাহি কোন বর॥
অতএব পূজ ভব ভবাণী সহিত। কায়মনোবাক্যে সেব যাথে হ'ন প্রীত॥
দোঁহে তুষ্ট করি' আগে রাবণে মাগিব। অবশ্য শঙ্করী-শিব সানুকূল হ'ব॥ (১৪)

সফল শরৎকাল ঋতুর প্রধান। পূজা কৈলে কাত্যায়নী করিবে কল্যাণ॥
কোটী যুগ পূজা কৈলে যত পুণ্য হয়। আশ্বিনের এক দিন পূজা সম নয়॥
শরতে সাদরে পূজ শঙ্কর-ঘরণী! বিপদ-সাগরে শিবা হইবে তরণী॥
তবে লঙ্কা যাত্রা কৈলে সঙ্কটে এড়াই। মন্ত্রণা সম্মত এই শুন কপি ভাই॥
দুর্গাপঞ্চরাত্রি-গান জগদ্রাম ভণে। পার্ব্বতি! পাতকী দেখি' রাখিহ চরণে॥

কালিদাসের কাহিনী।

মহাকবি কালিদাস ভারতের অমূল্য-রত্ন। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, যাঁহার গৌরবে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে সমস্তই অন্ধকারের গভীর গহ্বরে নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ, জীবনাখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা এতদ্দেশে বর্ত্তমান না থাকাতে, প্রাচীন ভারতের বড় বড় লোকের জীবনের ইতিহাস জানা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে। এই জীবনাখ্যায়িকার অভাব নিবন্ধন, এই সকল বড় লোকের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, তাহা কতকগুলি লোকপরম্পরাগত কাহিনীর উপরই অগত্যা নির্ভর করিতেছে।—কালিদাসসম্পর্কে যাহা কিছু সাধারণের গোচরীভূত, তাহাও এই অজ্ঞাতমূলা কিংবদন্তীর উপরেই সংস্থাপিত। এই সকলের আলোচনায় বিশেষ কোন লাভ না থাকিলেও আমোদ যথেষ্টই আছে।

(১৪) হ'ব—হ'বে।

জগতে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রথিত এই যে কালিদাস, তিনি নাকি বাল্যে একজন গণ্ড-মূর্খ ছিলেন!—কেবল স্বয়ং মূর্খ নহেন, মূর্খের পুত্র মূর্খ। পিতামহও মূর্খ ছিলেন কি না, এতদ্বিষয়ে কিংবদন্তী নীরব। কালিদাস কোন্ সময়ের লোক—তাহা লইয়া গবেষণাপটু মনীষিগণের মধ্যে এযাবৎ বিচার-বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহাতে আরও একটি ক্ষুদ্র সমস্যা যোগ করা যাইতেছে। যে সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ মনুসংহিতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আপনাপন সন্তানদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়নরূপ নিগড়পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই কালিদাস জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের বৈপুরুষিকী মূর্খতার প্রমাণও জন-শ্রুতি,—আজকাল এই 'শ্রুতির' প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য হইবে বলিতে পারি না।

কালিদাস বাগেদবীর অসাধারণ কৃপাপাত্র—নানা দিগেদশ হইতে অসংখ্য ছাত্রবর্গ আসিয়া জুটিয়াছেন। অধ্যাপকের অসামান্য পাণ্ডিত্য দর্শনে শিষ্যগণ ভাবিলেন, না জানি তাঁহার পিতৃদেব কতই অগাধ বিদ্বান্,—কারণ, তখনকার লোকের ধারণা ছিল, জগতে পাণ্ডিত্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রস্ব হইতেছে। কালিদাসের সময়ে শিষ্যেরা "গুরু-কুলে" বাস করিতেন কি না, গবেষণাসাপেক্ষ, কিন্তু কালিদাসের শিষ্যগণ গুরুর পিতৃদেবের সাক্ষাৎকার লাভ সহজে করিতে পারেন নাই, একথা নিশ্চিত। যাহা হউক, শিষ্যগণের বহু অনুরোধে কালিদাস স্বীয় জনকের সহিত উহাদের পরিচয় করাইতে সম্মত হইলেন। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বার্দ্ধক্যোচিত বেশে সজ্জিত হইয়া জপ-মালা হস্তে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম 'রাম' নাম মাত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে পুত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, কালিদাস-জনক কুতূহলী ছাত্রবর্গের সম্মুখে আগমন করিলেন। কালিদাসের পিতা যে কেবল মুর্খ ছিলেন এমন নহে; জীবনের পূর্ব্বতন কালে যে কোন দিন তিনি ভগবন্নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, বক্ষ্যমাণ ঘটনায় তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ 'রাম', 'রাম' উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া মূর্খত্বসূচক জিহ্বার জড়তা নিবন্ধন "রাভন" "রাভন" বলিতে লাগিলেন। অধ্যাপক-জনকের এই দিগ্গজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া শিষ্যগণ ঈষদ্ধাস্যে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কালিদাস অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা বুঝিতে পারিলে না, পিতৃদেব তোমাদিগের নিকট এই পূর্ব্ব পক্ষ করিলেন :—

"কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
রক্ষঃশ্রেষ্ঠে কুলজ্যেষ্ঠে স কথং নাস্তি রাবণে? ॥"

কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এই দুইয়েতেই ভকার বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ রাবণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হইয়াও এমন কি অপরাধ করিলেন যে, তাহাতে মহাপ্রাণ ভকার নাই?—কালিদাসের ছাত্রগণ এই পূর্ব্বপক্ষের কোনও মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি না আমরা সম্প্রতি অবগত নহি।

এমন মূর্খের পুত্র মূর্খ হইবে না ত কি? এই পৈতৃক প্রকৃতি লইয়া "মন্থনের পূর্ব্বে অনভিব্যক্তরত্নোৎপত্তি অর্ণবের ন্যায়" যখন কালি-দাস, মূর্খত্বের ফলস্বরূপ, ব্রাহ্মণ হইয়াও গোচারণের মাঠে বিরাজমান হইয়া গো-নিতম্বোপরি লবণ রক্ষা পূর্ব্বক স-ক্ষার বদরীর স্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন যে জগতে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল না, এমন নহে; বরং উহা কেবল পুরুষের করায়ত্ত না থাকিয়া কোন কোন রমণী-রত্নের আয়ত্ত হইয়াছিল। ভারতের কোন এক রাজার পরম রূপসী কন্যা সার্থকনাম্নী বিদ্যোত্তমা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন "যিনি আমাকে বিচারে পরাজয় করিবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।" সৃষ্টির আদ্যা নায়িকা মহাবিদ্যা * যে প্রতিজ্ঞা-বাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, এতৎ কাহিনীর নায়িকা বিদ্যোত্তমা তাহারই প্রতি-ধ্বনি করিলেন। বররুচির নায়িকা 'বিদ্যা' (ভারতচন্দ্রের কৃপায় বঙ্গদেশে যিনি সুপরিচিতা) যে এই বিদ্যোত্তমারই এক অনুকৃতি নহেন তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ বররুচি কালিদাসেরই সহযোগী (এবং প্রতিযোগী) ছিলেন একথাও স্মর্ত্তব্য। অথবা, শক্তিরূপিনী নারীজাতির মধ্যে কোন একটা শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ হইলেই, বুঝি, তত্তৎ শক্তি দ্বারা পুরুষ-বিজিগীষাই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে।—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কোন 'বিদুষীর' জীবনী ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে। যাহা হউক, বিদ্যোত্তমার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া অনেক মহামহোপাধ্যায় আসিয়া জুটিতে লাগিলেন, কিন্তু একে একে সকলেই পরাস্ত হইয়া গেলেন।—হায়, বিদ্যো-ত্তমার ভাগ্যে বুঝি আর "সুন্দর" বা "মেধাবী" পতিলাভ ঘটিবে না!

নির্জ্জিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কতকগুলি যুবক একত্র ষড়যন্ত্র করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই বিদ্যোন্মত্তা বিদ্যোত্তমার সঙ্গে একটা হস্তি-মূর্খের

* শুম্ভপ্রেরিত দূতের প্রতি ভগবতীবাক্য—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ৩।৪।১২০

বিবাহ দিতে হইবে এবং এতদাশয়ে তাঁহারা তদ্রূপ মূর্খের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহাদের মনোরথ সফল হইতে বিলম্ব হইল না, অচিরেই দেখিলেন—এক যুবক এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া ঐ শাখারই মূলভাগ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে এমনই মূর্খ যে, ছেদনকার্য্য সমাপ্ত হইলেই যে শাখাসহ স্বয়ং ভূমিসাৎ হইবে ইহাও তাহার মনে উদিত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূর্খ মিলিবে না ভাবিয়া পণ্ডিতের দল উহাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাইলেন। বলা বাহুল্য, ইনিই আমাদের গল্পের নায়ক—সরস্বতীর ভাবী বরপুত্র। বৃক্ষাবতীর্ণ কালিদাসকে পণ্ডিতের দল বুঝাইলেন যে, তাহাকে এক রূপবতী রাজকন্যা বিবাহ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল তাঁহাদের অনুগামী হইতে হইবে এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনভাবাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। বিবাহের নামে কাষ্ঠপুত্তলিকাও নাকি মুখব্যাদান করিয়া থাকে। তাই মূর্খ কালিদাস উহাতে অবশ্যই সম্মতি দিলেন।

পণ্ডিতেরা কালিদাসকে তাঁহাদের 'অধ্যাপক' বলিয়া রাজকন্যার নিকট পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, ইনি সম্প্রতি 'বাচংযম'—কাহারই সহিত আলাপ মাত্রও করেন না, ইঙ্গিতে মাত্র স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। একটি যুবক এতগুলি পণ্ডিতের অধ্যাপক, ইহাতে বিদ্যোত্তমা বিস্মিতভাবে কালিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মূর্খ কালিদাস কি জানি কি ভাবিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলী বক্র করিয়া দেখাইলেন। ইহাতে পণ্ডিতের দলে মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল, তাঁহারা ব্যাখ্যা করিলেন, আমাদের অধ্যাপক দুই হস্তের (বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত) অষ্টাঙ্গুলি বক্র করিয়া বুঝাইলেন যে, অষ্টাবক্র ঋষি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে জনক রাজার সভা জয় করিয়া ছিলেন, সুতরাং "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।" এইরূপে কালিদাস যে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করিলেন, পণ্ডিতদিগের কেহ না কেহ তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। অতঃপর অধ্যাপকের হইয়া পণ্ডিতেরা বিদ্যোত্তমার সঙ্গে বিচার আরম্ভ করিলে, যে যে স্থানে রাজকন্যা পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া আনেন, সেই সেই স্থলেই অমনি একজন পণ্ডিত গিয়া কালিদাসের পশ্চাদ্ভাগে চিম্‌টি কাটিতেন, তাহার যন্ত্রণায় মৌনী কালিদাস হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন। *

* গল্প আছে, কোনও বিদ্যালয়পরিদর্শক একটী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত খ শব্দের উত্তর ঙস্ (ষষ্ঠীর একবচনে) করিলে কি হয়?" অধ্যাপক দেখিলেন ছাত্র ঠকিয়া আসি-

রাজকন্যা এই সকল দেখিয়া কালিদাসকে মহাপণ্ডিত স্থির করিলেন এবং শিষ্যগণকে ছাড়িয়া অধ্যাপকের সঙ্গে সাংকেতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যোত্তমা কালিদাসের প্রতি এক অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলেন; মূর্খ কালিদাস কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রথমতঃ এক অঙ্গুলি পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া দুই অঙ্গুলি দেখাইলেন। এবার অতিবুদ্ধিমতী রাজকন্যা আপনিই পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সেই মূর্খের গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া পণ্ডিতের দলের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। সভাস্থ সকলে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি প্রশ্ন করিলেন, কি উত্তরই বা মিলিল, যে ইহাকে বরণ করিলেন?" বিদ্যোত্তমা উত্তর করিলেন, 'আমি ইঁহাকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম বিষয়ক পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলাম, ইনি ইঙ্গিতে প্রথমতঃ স্বীকার করিলেন—ব্রহ্মপদার্থ এক, কিন্তু তথাপি প্রকৃতি পুরুষ এই দুইয়ে বিভক্ত না হইলে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল হয়েন না, ইহাই বুঝাইলেন।"

যথারীতি বিদোত্তমা ও কালিদাসের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কোন স্মার্ত্ত পাঠক অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "রাজকন্যা অবশ্যই ক্ষত্রিয়ের দুহিতা ছিলেন (কেননা তখনও আজিকালিকার ন্যায় ঔপাধিক চাতুর্ব্বর্ণিক রাজা সৃষ্ট হয়েন নাই, ইহা নিশ্চয়), তবে ব্রাহ্মণ কালিদাসের সঙ্গে কিরূপে তাঁহার বিবাহ হইল?" এতদুত্তরে মহাকবি ভারত চন্দ্রের "পণে জাতি কেবা চায়" এই কথার দোহাই দিয়া কন্যা-পক্ষকে সান্ত্বনা করিতে পারা যায়; কিন্তু বরপক্ষকে সহজে বুঝান দায়। তবে, অপর বিষয়ে মনুর অনুশাসন লঙ্ঘন করিলেও, কালিদাসের সময়ে বিবাহবিষয়ে কথঞ্চিৎ মানষিক উদারতা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়-বিবাহের প্রথা) বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইয়া কিংবদন্তীর পক্ষ অনুসরণ করিতে হইবে। বিবাহান্তে দম্পতী বাসরগৃহে নীত হইলেন। তথায় পালঙ্কোপরি মশারি ঝুলান ছিল। মূর্খ কালিদাসের মনে হইল, কন্যা পালঙ্কোপরি বসিল আমাকে বুঝি তদুপরি বিস্তৃত মশারির উপর বসিতে হইবে। এই ভাবিয়া মশারির উপর আরোহণ

য়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ছাত্রের পশ্চাতে গিয়া জোরে একটি চিমটি কাটিলেন, অমনি ছাত্র "উঃ" করিয়া উঠিল প্রশ্নেরও উত্তর হইয়া গেল। এই অধ্যাপকও বুঝি কালিদাসের শিষ্যভুক্ত পণ্ডিতগণের কাহারও শিষ্যপরম্পরাভুক্ত ছিলেন।

করিবার চেষ্টা করিবামাত্র উহা ছিঁড়িয়া গেল,এবং কালিদাস রাজকন্যার উপরি পড়িয়া গেলেন। এত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতের এইরূপ ব্যবহারে বুদ্ধিমতী বিদ্যোত্তমার বিস্মিত হইবার কথা বটে; কিন্তু একটা ঘটনার উপর সকল সময় মতামত নির্ভর করে না,কেননা তাহা আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে। তথাপি রাজকন্যার অন্তরে সন্দেহ জন্মিল। তখন সহসা একটা উষ্ট্র ডাকিয়া উঠাতে রাজকন্যা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ডাকিতেছে?" এইবার বর-পাত্রের প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল,—তিনি একবার বলিলেন, 'উষ্ট', পরক্ষণে আবার বলিলেন, 'উট্র'। এতক্ষণে বিদ্যোত্তমার চৈতন্য হইল; তিনি বিজিত পণ্ডিতগণের এই গূঢ় পরিহাসরূপ ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দারুণ মনস্তাপ উপস্থিত হইল, তখন, তাদৃশ অবস্থাগত ব্যক্তির ন্যায়, দোষ দিবার অপর পাত্র না পাইয়া, দগ্ধকপাল বিধাতাকেই উপলক্ষ করিয়া বলিলেন—

"কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কিং ন্ করোতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রংবা-ষংবা-
তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা॥"

বিদ্যোত্তমে! আক্ষেপ করিলে কি হইবে? সংসারের গতিই ঈদৃশী,—তোমার সম দুঃখভাগিনী জগতে তোমার অনেক ভগিনীই ছিলেন, আছেন ও হইবেন। কিন্তু এ—ছি ছি!—কি করিলে? মূর্খ বলিয়াই কি স্বামীকে (ব্রাহ্মণকে) পদাঘাত করিতে হয়? এই কি তোমার বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম? ঐ দেখ গণ্ড-মূর্খ হইলেও তোমার এই জড়বুদ্ধি স্বামী লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে, ম্রিয়মাণ হইয়া এই গভীর রজনীর অন্ধকারে কোথায় লুকাইতে চলিয়াছে। তুমি আজ অভিমানে ও অহঙ্কারে ইহা দেখিলে না, কিন্তু একদিন তোমাকে এইনিমিত্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে—ইহা কি তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও বুঝিলে না?

পাঠক! মূর্খের কীদৃশী-মর্য্যাদা বুঝিলেন? কাহারও গৃহে যেন মূর্খ-ত্বের প্রশ্রয় দেখিতে না হয়। আজ এই পর্য্যন্ত।

মহিমা।

পরমাত্মা !—পরমেশ !—চিন্ময় অমৃত-ধারা !—
নিখিল জগত তব মহাপ্রেমে মাতুয়ারা।
সরসী-মেখলা শস্য-শ্যামলা ভারত-ভূমি ;
নর্ম্মদা, কপোত-অক্ষি—অনন্ত সাগরগামী ;—
স্তিমিত অস্ফুটজ্যোতিঃ নক্ষত্র সরলপ্রাণ ;
সমুদ্র উছলি' বয়,—কি মহান্, গরীয়ান্ !—
অযুত তরঙ্গায়িত,—সুবিশাল করপুটে
মণিদাম মরকত ঢালিয়া দিতেছে তটে ;
সুনিবিড় বনরাজি ; অভ্রভেদী ধরাধর ;
অবিচলা দিগঙ্গনা ;—মহাশূন্য অনশ্বর ;
নিশীথ-নক্ষত্র-খণ্ড মহা সুরবর্ত্মে ভাসে ;
বরষ অজ্ঞাতসারে কি সুন্দর যায় আসে ;
স্বর্গের সোনালী দূতী—পূর্ণিমা-আলোক-মাখা ;
ঊরধ বিটপী শত প্রসারি' প্রশাখা-শাখা ;
মধ্যাহ্ন আকাশে রবি—প্রাচীন দেবতা যথা ;
গ্রহ-উপগ্রহ-বিশ্ব—যেন এক সূত্রে গাঁথা ;
মানব-অন্তর-রাজ্য কত ভাবে ভাবময় ;—
সকলের রচয়িতা তুমি এক মহাশয় !
পরম পুরুষ !—ধাতা !—অদ্বিতীয় !—অনশ্বর !
তোমারি করুণা-কণা এ অনন্ত চরাচর।
বসন্তের শান্ত সন্ধ্যা-মলয় সুধীরে বয়,
কোকিল কদম্ব-মূলে, 'চ'খ্ গেল' কথা কয়,
তোমারি সৌন্দর্য্যে, নাথ ! বসুন্ধরা সুশোভনা ;—
যেখানে যতই দেখি,—তোমারি করুণা-কণা।

প্রহসন।

এই ক্রন্দন-কোলাহলময় জগতে, এই শোকাশ্রুর উষ্ণ প্রস্রবণ সংসারে মানবের বিষাদ মলিন অধরে যিনি হাসির আনন্দ-রেখা ফুটাইতে পারেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। প্রহসনকার হাস্যরসের অবতারণা করিয়া মানুষের হাস্যের মাত্রা বৃদ্ধি করেন; অতএব তিনি ধন্য।

প্রহসনের প্রধান অবলম্বন হাস্যরস; প্রহসনকার অদ্ভুত বা বিচিত্র ঘটনা চরিত্র ভাষা প্রভৃতির সাহায্যে আমাদিগের হৃদয়নিহিত হাস্যের উৎস উন্মোচন করিয়া দেন; মেঘাচ্ছন্ন আকাশে রৌদ্রের চিক্‌মিকির মত, আমাদের জীবনের অন্ধকারে ক্ষণেকের জন্য আলোক সঞ্চার হয়।

মানুষের অন্তরে শোক, হাস্য, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি কতকগুলি ভাব স্থায়ী-রূপে বদ্ধমূল আছে। ইহা জন্মজন্মান্তে অনুভূত চিত্তবৃত্তির পুঞ্জীভূত সংস্কার; অথবা (জড়বাদীর মতে) বংশপরম্পরাগত পূর্ব্বপুরুষের যুগবাহী উত্তরাধিকারের ফল। উক্ত স্থায়ীভাব উদ্বোধক হেতু দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। সেই করুণ হাস্য রৌদ্র ভয়ানক প্রভৃতি রসে অভিষিক্ত হইয়া আমরা বিমল কাব্যামোদ অনুভব করি।

হাস্যরসের অভিব্যক্তির প্রণালী কিরূপ? কোন্ উদ্বোধক হেতু দ্বারা হাস্যরূপ স্থায়ীভাব অভিব্যক্ত হইয়া হাস্যরসে পরিণত হয়? অতীতে ভূয়োদর্শনের ফলে, সকল বিষয়ে আমাদিগের একটা স্বাভাবিকতা, সৌসাম্য ও সামঞ্জস্যের ধারণা আছে। কোন চরিত্র ঘটনা অথবা ভাষার দ্বারা সেই ধারণার ব্যত্যয় ঘটিলে হৃদয়নিহিত হাস্যরূপ স্থায়ীভাব উদ্রিক্ত হইয়া হাস্যরসের অবতারণা করে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করি। নদেরচাঁদ যখন বঙ্গভাষার প্রতি করুণার্ত্ত হইয়া তাহাকে দীনা ক্ষীণা মলিনা পিঁচুটিনয়না বলিয়া বর্ণনা করে অথবা ডগবেরি তাহার সহচরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া বুদ্ধিহীনতার কথা বলে * তখন আমাদের ধারণামতে

---

* Good man Verges, sir, speaks a little off the matter; an old man sir and his wits are not as blunt as, God help, I would desire they were—Much Ado about Nothing. কৌতূহলী পাঠক ভাষাগত সৌসাম্যের অভাব সেরিডন সৃষ্ট Mrs. Maloprop এর মুখে পদে পদে শুনিতে পাইবেন।

ভাষাগত সৌসাম্যের ব্যত্যয় হওয়াতে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। মধ্যযুগে রণ-প্রিয় নাইট সম্প্রদায় অশ্বারোহণে বিপন্নের বিপদ নিবারণ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের অনুকরণে যখন ডনকুইকসোট পক্ষিরাজ রোজানন্টির পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া গর্দ্দভারোহী সেন্‌কোপ্যানজার সাহায্যে ভোঁতা বর্শা হস্তে পৃথিবীময় আর্ত্তের উদ্ধার করিয়া বেড়ায় অথবা যখন ব্রহ্মণ্যের অবতার শুদ্ধাচারী বিদ্যাদিগ্‌গজ যবনকন্যা আসমানীর উচ্ছিষ্টান্ন নিতান্ত ক্ষুধার দায়ে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে; তখন আমাদের ধারণামতে ঘটনাগত সামঞ্জস্যের ব্যত্যয় হওয়াতে হাস্যরসের অনুভব হয়।

এইরূপ জগদম্বার বিশাল রূপ, জলধরের স্ফীত উদর, ম্যালভোলিওর * পূর্ব্বরাগ, স্লেনডারের † প্রেমালাপ; পলোনিয়সের ‡ সর্ব্বজ্ঞতা, এগুচিকের * বুদ্ধিমত্তা, বোবাডিলের ¶ বীরত্ব, বক্কেশ্বরের শূরতা প্রভৃতি আমাদের ধারণামতে চরিত্রগত স্বাভাবিকতার ব্যত্যয় ঘটাইয়া হাস্যরসের অবতারণা করে। সর্ব্বত্রই হাস্যরসের উদ্বোধক হেতু চরিত্র ঘটনা বা ভাষাগত স্বাভাবিকতা সৌসাম্য বা সামঞ্জস্যের ব্যত্যয়। সেক্ষপীয়র সৃষ্ট ফলষ্ট্যাফ্‌ চিত্রে এইরূপ ব্যত্যয় পুঞ্জীভূত; সেইজন্য ফলষ্ট্যাফ্‌ হাস্যরসের আধার। আকৃতি প্রকৃতি মতি গতি পদ্ধতি সর্ব্বাংশেই ফলষ্ট্যাফ্‌ সাধারণ-ছাড়া। সে বৃদ্ধ হইয়া যুবার অভিনয় করে, ভীরু হইয়া বীরত্বের বড়াই করে, শঠ হইয়া সরলতার ভান করে, অথচ তাহার প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে, প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে হাস্যরস মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকটিত হয়। সেই জন্য প্রহসনাংশে ফলষ্ট্যাফ্‌ অদ্বিতীয়।

প্রহসন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, স্বাভাবিক ও সামাজিক। যে স্থলে স্বভাবের সীমা অতিক্রম না করিয়া প্রহসনকার মানুষের স্বভাবসিদ্ধ সামঞ্জস্যের ব্যত্যয়—তাহার আকার আচার ভাব ভঙ্গি প্রভৃতির রহস্যোদ্দীপক অংশ প্রকটিত করেন সেই স্বাভাবিক প্রহসন।

এরূপ প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য হাস্যরসের অবতারণা, মানব প্রকৃতির আলোচনা, কাব্যামোদের উদ্দীপনা; পাপের প্রতীকার, সমাজের সংস্কার বা দোষের আবিষ্কার নহে। এ শ্রেণীর প্রহসনের চরম উৎকর্ষ সেক্ষপীয়রের

* Twelvth Night.

† Merry Wives.

‡ Hamlet.

¶ Every man in his humour.

নাটকে। তৎসৃষ্ট হাস্যোদ্দীপক চরিত্রগুলি সকলেই স্বভাবের ছাঁচে ঢালা। প্রকৃতি নিজহস্তে নরনারীকে যে সব অসামঞ্জস্যে ভূষিত করিয়াছেন, তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি সেক্ষপীয়রের নাটকে।

সামাজিক প্রহসন অন্যরূপ। এস্থলে প্রহসনকার স্বভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সমাজের সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করেন। সভ্যতার ফলে সমাজ যে সকল দোষের আকর হইয়া উঠে,কপটতার সাহায্যে সামাজিক মানুষ ভাব ভঙ্গীপ্রণালী পদ্ধতির যে সকল অসামঞ্জস্য সদ্‌গুণের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করে,অতিশয়োক্তির সহায়তায় তাহার আবিষ্করণ, শ্লেষ সহকারে তাহার উন্মোচন এবং ব্যঙ্গের সহযোগে তাহার সংশোধন—সামাজিক প্রহসনের উদ্দেশ্য। এ শ্রেণীর প্রহসনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ মলিয়ারেব এবং দ্বিতীয় চারলসের সাময়িক উচারলি প্রভৃতির নাটকে। তাহাদের রচিত প্রহসনের লক্ষ্য সামাজিক পাপের প্রতীকার, দোষের আবিষ্কার—এক কথায় সমাজ সংস্কার। তাহাদের সৃষ্ট চরিত্রে তদানীন্তন কালের ক্ষুদ্রতা নীচতা মূর্খতা দাম্ভিকতা স্বার্থপরতা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বাহ্যবিলাসিতা প্রভৃতি, বিদ্রূপের তুলিতে ব্যঙ্গের রঙে উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন! আমরা যে জীবকে 'ফোতো বাবু' বলি, সেকালে ইংলণ্ডে ঐরূপ জীবের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাদের দমনের জন্য এথরিজ * সার ফপলিং ফ্লাটারের সৃষ্টি করিলেন। তিনি পোষাগের পারিপাট্য ও সুবেশের সুষমার পূর্ণাবতার। তাঁহার প্রাণ মন পরিচ্ছদের কাছে বিক্রীত; তিনি আপনার স্বরূপের সৌরভে ও লাবণ্যের গৌরবে আত্মবিস্মৃত; তাঁহার মতে দর্পণই জগতে এক অদ্বিতীয় হৃদয়রঞ্জন সুহৃদ; তাঁহার বিবেচনায় দরজি ও পরচুল বিক্রেতা অতি মহাত্মা ব্যক্তি। এইরূপ সেকালের সম্ভ্রান্ত † মহিলার সংশোধনের জন্য ফারকুহার লেডি লিওরবেলকে সৃষ্টি করিলেন। রাগ, মান, অভিমান, নীচতা, কুটিলতা, কৌশল, কামুকতা, চাঞ্চল্য, অস্থৈর্য্য, কাপট্য, খামখেয়াল প্রভৃতি যাহা কিছু স্ত্রীজাতিসুলভ সদ্‌গুণ আছে, সকলের রাসায়নিক সংযোগে এই অপূর্ব্ব চরিত্র প্রস্তুত করিলেন। যেন সামাজিক নব

---

* **Etherege's Sir Fopling, Flutter.**

† **Farquhar's Trip to the Jubilee.**

নারীগণ প্রহসন-দর্পণে আপন আপন মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মসংস্কারে যত্নশীল হয়।

এই সামাজিক প্রহসনের সহিত বিদ্রূপের (satire) ভেদ অত্যল্প। উভয়ের উদ্দেশ্য একই; প্রণালীও প্রায় এক। 'প্রায়ই এক' বলিলাম এইজন্য যে, সামাজিক প্রহসনকার দর্শককে হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া কাব্যামোদের সাহায্যে সংশোধন করিতে চান। কিন্তু বিদ্রূপকার অনেক স্থলে কঠোর ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাতে লোককে ক্ষত বিক্ষত করিয়া বেদনার সহযোগে মানবসমাজকে শিক্ষা প্রদান করেন। জুভিন্যাল, ড্রাইডেন, পোপ, সুইফট্ এইরূপ বিদ্রূপকার। তাঁহাদের ব্যঙ্গ পড়িয়া সামাজিক দোষের প্রতি এমন উগ্র ঘৃণার উদয় হয়, যে তাহার সঙ্গে হাসির উচ্ছ্বাস উঠিতেই পারে না। সামঞ্জস্যের ব্যত্যয়ে যে টুকু উপভোগের অংশ আছে, কবির ভৈরব ক্রোধের সম্মুখে তাহা তিষ্ঠিতেই পারে না। কিন্তু বিদ্রূপ মাত্রই যে কঠোর হইবে তাহার কোন কারণ নাই; কারণ জগতের বিদ্রূপ-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক উৎকৃষ্ট বিদ্রূপকার পাপের প্রতি করুণ কোমল। এরিষ্টোফেনিস্, সারভ্যানটিস্, ফিলডিং ফুলার প্রভৃতি বিদ্রূপকার এমন অকঠোর করে সামাজিক দোষের উদ্‌ঘাটন করেন যে, দোষ 'উচাটন' হইয়া ভয়ে পলাইয়া যায় না, বরং উৎফুল্ল হইয়া আপনার সর্ব্বাবয়ব উন্মুক্ত করিয়া আমাদের উচ্ছ্বসিত হাস্য-রসের পোষকতা করে।

সামাজিক প্রহসন বা বিদ্রূপ, বিশেষ ন্যায় ও দক্ষতার সহিত প্রযুক্ত হওয়া উচিত; অন্যথা ইহাদের দ্বারা সমাজের প্রভূত অমঙ্গল সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। মানুষ হাসিতে এত ভালবাসে যে, অনেক সময়ে হাসা উচিত কি অনুচিত তাহার বিচারের অপেক্ষা করে না; হাসিতে পাইলেই হাসে। ভাবুন কেহ যদি কুব্জের কুঁজ, খঞ্জের চলন অথবা তোতলার উচ্চারণ দেখিয়া শুনিয়া হাসে, তাহার হাসি কি ন্যায়সঙ্গত হইবে? কাব্যেও এরূপ অন্যায় হাসির অবতারণা হইতে পারে। পোপ 'ডানসিয়াড' কাব্যে তাঁহার সাময়িক লেখকাণুদিগের দারিদ্র্য উপলক্ষ্য করিয়া অনেক বিদ্রূপ করিয়াছেন; দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'তে রামমাণিক্যের বাঙ্গাল ভাষা লক্ষ্য করিয়া অনেক হাসি হাসিয়াছেন। আমার মনে হয় এরূপ হাসি ন্যায়সঙ্গত নহে।

সামাজিক প্রহসন বা বিদ্রূপ অনেক স্থলে ব্যক্তিবিশেষের ব্যঙ্গ হইয়া

দাঁড়ায়। যাহার উপর রাগ আছে, যাহাকে দেখিতে পারি না, যাহার মতের সহিত আমার মতের ঐক্য নাই, যে আমার মতে সমাজের অহিতকারী, তাহার গুণের অপলাপ করিয়া, দোষের অতিরঞ্জন করিয়া ব্যঙ্গের সাহায্যে তাহাকে লোকসমাজের হাস্যাস্পদ করিতে বড় প্রলোভন হয়। সেই প্রলোভনের বশে কবি সময়ে সময়ে ন্যায়ের অসম্মান করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে প্রহসন বা বিদ্রূপের নায়করূপে উপস্থিত করেন।

ড্রাইডেন 'অ্যাবসোলম' কাব্যে তাঁহার রাজনৈতিক অরি ও কাব্য-প্রতিদ্বন্দ্বী সাফ্‌টসবেরিকে 'অ্যাচিটোফেল' সাজাইয়া তাহার শিরে চিরপোষিত বিদ্বেষ ও অভিমান-বিষ উদ্গীরণ করিয়াছেন। অমৃতলাল বসু তাঁহার 'বাবু' প্রহসনে জাতীয় মহাসভার অন্যতম সভাপতিকে নায়ক সাজাইয়া তাঁহার উপর অজস্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। এরূপ করা উচিত মনে হয় না। প্রহসনের বা বিদ্রূপের বিষয় ব্যক্তিবিশেষ হওয়া উচিত নহে। সামাজিক সম্প্রদায়ের মনঃসৃষ্ট প্রতিরূপই ব্যঙ্গের পাত্র হওয়া উচিত। ইতিপূর্ব্বে যে 'সার ফপলিং ফ্লাটার' ও 'লেডি লিওয়বেলে'র উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের আদর্শ ঐরূপ মনঃসৃষ্ট প্রতিরূপ—ব্যক্তিবিশেষ নহে। ডনকুয়িকসোট বা ভাড়ু দত্ত ও ঐরূপ মনঃসৃষ্ট প্রতিরূপ, ব্যক্তিবিশেষ নহে। অতএব সৎ কবির নজির মতে ব্যক্তিবিশেষকে প্রহসন বা বিদ্রূপের নায়করূপে উপস্থিত করা সঙ্গত নহে।

কিন্তু ব্যঙ্গের ইহা অপেক্ষাও এক দূষনীয় প্রয়োগ আছে; সে—উৎকৃষ্ট বস্তুর অপকর্ষ সাধন, উন্নত পদার্থের অবনতি করণ, ভাল জিনিষের উদ্দেশে উপহাস বর্ষণ। যে বায়ু জীবের জীবন, সেই যদি তাহার অপমৃত্যুর কারণ হয়, তাহা যেমন অসঙ্গত, ব্যঙ্গের অপপ্রয়োগও সেইরূপ অসঙ্গত।

সসীম মানুষের সকল গুণই অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট। যিনি পরিহাসরসিক, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সেই দোষের তিলটিকে তাল প্রমাণ করিয়া গুণের ভাগটুকুর সর্ব্বথা অপলাপ করিয়া গুণকে ব্যঙ্গের বিষয় করিতে পারেন। এইরূপ ব্যঙ্গকারের চক্ষে জগতে সকলই বিদ্রূপের বিষয়; পৃথিবীতে সকলই অসম্পূর্ণ সদোষ, অতএব সকল হইতেই নিঙাড়িয়া হাস্যরস বাহির করা যাইতে পারে। সেক্ষপীয়রের ইয়াগো এই জাতীয় পরিহাসরসিক। তিনি সকল পদার্থের উপর সমালোচকের তীব্র কটাক্ষপাত করেন।

I am nothing if not critical

এবং সেই কটাক্ষের গুণে সকল বস্তুতেই পরিহাসের রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

If she be fair and wise fairness and wit
The one's for use the other useth it
If she be black and thereto have a wit
She will find a white that shall her blackness fit
She never yet was foolish that was fair
For e'en her folly helped her to an heir
There is none so foul and foolish there unto
But does foul pranks which fair and wise ones do
She that was ever fair and never proud
Had tongue at will and yet was never loud

* * *

She was a wight—if ever such wight were
To suckle fools and chronicle small beer

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইয়াগোর উক্ত বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা।

ইয়াগো চিত্র প্রকৃতির অনুগত। জগতে ইয়াগো জাতীয় পরিহাস-রসিকের একান্ত অসদ্ভাব নাই। ইঁহারা বাস্তবিক নরদ্বেষী; তবে যে নর নারীর কথা লইয়া আন্দোলন করেন সে কেবল শুষ্ক অধরে ঘৃণার হাসি হাসিবার জন্য। মানুষের সৌভাগ্য যে এরূপ প্রহসন বা বিদ্রূপকারের সংখ্যা অত্যল্প; কারণ বিধাতার মঙ্গলময় নিয়মে হয় তাঁহাদের রচনার ক্ষমতা বড় অধিক থাকে না; না হয় পাঠকের অযত্নে তাঁহাদের রচনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর একটা সৌভাগ্যের কথা এই যে, মানবহৃদয়ে নরদ্বেষ ও নর-প্রীতি ঘটনাচক্রে স্থান বিনিময় করে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর প্রহসন বা বিদ্রূপকার ঘৃণার হাসির সহিত প্রায়ই করুণার অশ্রু মিশাইতে বাধ্য হয়েন। ইংরাজি সাহিত্যে সুইফট্‌কে ঐ শ্রেণীর বিদ্রূপকার বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার গলিভারস্ ট্রাভল (Gulliver's Travels) টেল অভ এ টাব (Tale of a Tub) প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িলে মনে হয় যে তাঁহার হৃদয়ে নরদ্বেষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। বাইরণও শেষ জীবনে ঐরূপ বিদ্রূপকার হইবার উপক্রম করিতেছিলেন—(তাঁহার ডন জুয়ান [Don Juan] এ কথার প্রমাণ); কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। কবিসুলভ সহৃদয়তা এবং উদ্দাম হৃদয়ের আবেগ তাঁহার অন্তরায় হইয়াছিল। এ দেশে

এখনও ইয়াগোজাতীয় পরিহাসরসিক ফুটিতে পান নাই—তবে যেন শনৈঃ শনৈঃ দেখা দিতেছেন।

ব্যঙ্গ অপপ্রযুক্ত হইলে তাহার যে বিপদ তাহার আলোচনা করিলাম। অতঃপর ব্যঙ্গের উপকারিতার বিষয় কিছু বলি।

যাহা সহস্র যুক্তি তর্কে হয় না, এক ব্যঙ্গে তাহার সমাধান হইতে পারে। সাধারণতঃ মানুষের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা যতটুকু, লজ্জার প্রখরতা তাহার অপেক্ষা অধিক। সেইজন্য জ্ঞানপথে মানবের বুদ্ধির পারে না গিয়া, পরিহাসের সাহায্যে তাহার অভিমানে ঘা দিলে সহজে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা। অতএব দেখা যায় যে, বক্তা ও লেখকের পরিহাস ব্রহ্মাস্ত্র। এ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে অতি স্থূল বুদ্ধিকেও আয়ত্ত করা যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন; যেহেতু সকল সুবক্তা ও সুলেখকই ইহার উদাহরণ।

সমাজসংস্কারে, সামাজিক দোষ ক্ষালনে ইহা অদ্বিতীয়। এ বিষয়ে প্রহসনকার ও বিদ্রূপকার সমাজের কত হিত সাধন করিতে পারেন এবং কত উপকার সম্পাদন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রহসন-দর্পণে সামাজিক নর নারী আপন আপন বদন নিরীক্ষণ করিয়া, যেখানে যে ক্ষত ব্রণ কালিমা কুৎসিৎভাব আছে তাহার অপনোদন করে। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি মানুষ ব্যঙ্গবাণে আহত হইলে অস্থির হয়। অতএব রাম যেমন মুকুরাস্ত্র সন্ধান করিয়া ধূম্রলোচনকে সংহার করিয়াছিলেন, কবিও সেইরূপ প্রহসন-দর্পণ সম্মুখে ধরিয়া সামাজিক দোষের বিনাশ সাধন করেন।

ডিকেন্‌সের উপন্যাসে ইংরাজী সমাজের কতই উপকার সাধন হইয়াছে! সে 'ফ্লীট' জেল—যেখানে ঋণদায়ে ও গুরুপাপে কারাবদ্ধ ব্যক্তিগণ একই কঠোর নিয়মে শাসিত হইয়া অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করিত—এখন সে জেল কোথা? সে অকালপক্কতালয় (forcing school)—যেখানে সুকুমারমতি শিশু শিক্ষার্থী শিক্ষকের দোষে ও শিক্ষার বিপাকে নির্বুদ্ধিতা ও অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত হইত—এখন সে আলয় কোথা? ডিকেন্‌সের কল্যাণে তাহারা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। আমাদের দেশের বড় লোক-দিগের নামের শেষে যে এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি বর্ণমালা সংযোগের বলবতী স্পৃহা আছে—'রাজা বাহাদুরে'র মত প্রহসনে তাহার কতটা খর্ব্বতা করিয়াছে! আমাদের সমাজে অধুনা যে পুত্র বিক্রয়রূপ দানব বিবাহের প্রচলন হইয়াছে—'বিবাহ বিভ্রাট' বা 'সভ্যতার পাণ্ডা'র মত প্রহসনে তাহার ঘৃণিত

ভাব কেমন প্রস্ফুট করিয়াছে। সেইজন্য বলিতেছি যে, সমাজ সংস্কার পক্ষে প্রহসন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হাস্যরসের উদ্বোধক হেতু স্বাভাবিকতা, সৌসাম্য বা সামঞ্জস্যের ব্যত্যয়। সকল মানুষেই এই ব্যত্যয় অল্প বিস্তর ভাবে বিদ্যমান আছে; আপনি আমি সকলেই এই ব্যত্যয়ের আধার। কিন্তু সকলেতেই আছে বলিয়া এবং অতিপরিচয়ের ফলে অনাদৃত হইয়া বিস্মৃত হয় বলিয়া এই ব্যত্যয়ের অস্তিত্বের বিষয় আমাদের ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপে অস্বাভাবিকতা অসৌসাম্য অসামঞ্জস্য ক্রমশঃ স্বাভাবিক এবং সৌসাম্য ও সামঞ্জস্যের অনুগত বলিয়া জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা। প্রহসন অসামঞ্জস্যের আবিষ্কার করিয়া আমাদের উক্ত ব্যত্যয়জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখে। তাহাতে আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, কারণ কোন চরিত্র ঘটনা বা ভাষা যদি রহস্যোদ্দীপক বলিয়া অনুভব হয়, যদি কবির সহিত একতানে আমরা তাহাদিগকে ব্যঙ্গের স্বরে আহ্বান করিতে পারি, বিদ্রূপের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারি, উপহাসের ভাবে আলোচনা করিতে পারি, তবে আর আমাদিগের জীবনে সেরূপ চরিত্র ঘটনা বা ভাষাগত ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব প্রহসনকার পরিহাসের পথ দিয়া আমাদিগকে স্বাভাবিকতা, সৌসাম্য ও সামঞ্জস্যের দিকে লইয়া যান; এইরূপে দিন দিন আমরা সম্পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হই। ইহা কি কম উপকার?

প্রহসন সম্বন্ধে যে সকল সাধারণ কথা বলিবার ছিল, একরূপ বলিয়া শেষ করিয়াছি। অতঃপর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রহসন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি।

'প্রহসন' শব্দটা নিতান্ত আধুনিক নহে, প্রহসন বস্তুটাও অনেক দিনের বোধ হয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ দৃশ্যকাব্যের যে আট প্রকার ভেদ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রহসনের উল্লেখ আছে। তৎকৃত প্রহসনের লক্ষণ এই—'ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্'। নিন্দনীয় ব্যক্তিদিগের কবিকল্পিত চরিত্র যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাই প্রহসন। এই প্রহসনকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; শুদ্ধের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন কন্দর্প কেলি; সঙ্কীর্ণের ধূর্ত্তচরিত নটকমেলক ইত্যাদি। এ সকল গ্রন্থ এখন চলিত নাই। অন্ততঃ আমি একখানিও সংস্কৃত প্রহসন পাঠ করি নাই।

সুতরাং তাহাদিগের পরিচয় দিতে অপারগ। বিশ্বনাথ সঙ্কীর্ণ প্রহসনের যে লক্ষণ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা ইহাতে কতকটা বুঝা যায়।

বেশ্যাচেট নপুংসক বিটধূর্ত্তা বন্ধকী চ যত্র স্যুঃ।
অবিকৃত বেশ পরিচ্ছদ চেষ্টিতকরণন্তু সঙ্কীর্ণম্॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বেশ্যা চেট বিট প্রভৃতি নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দর্শকের হাস্যরসের উদ্রেক করিত। তপস্বী ব্রাহ্মণ প্রভৃতির 'ধৃষ্টতা—বিসদৃশ চেষ্টা ও প্রহসনের বিষয় ছিল। তাহার প্রমাণ এই—

তপস্বিভগবদ্ বিপ্রপ্রভৃতিষত্র নায়কঃ। একো যত্র ভবেদ্ ধৃষ্টঃ।

এই সকল লক্ষণে মনে হয় যে সংস্কৃতে রচিত প্রহসন সামাজিক শ্রেণীভুক্ত ছিল; অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য ছিল দোষের আবিষ্কার, পাপের প্রতীকার, সমাজ সংস্কার। যাহাকে 'স্বাভাবিক' প্রহসন বলিয়াছি, সে শ্রেণীর প্রহসন সংস্কৃতে বিরল। সংস্কৃত কাব্যেও হাস্যরসের অবতারণা কদাচিৎ লক্ষিত হয়। তবে নাটকে বিদূষকের চরিত্রে কতকটা হাস্যরসের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদূষক পরোক্ষভাবে রাজার প্রেম অভিনয়ের সহায়ক; অধিকন্তু সে কিছু ভীরু স্বভাব ও উদারপরায়ণ বলিয়া বর্ণিত হয়। তাহার ভয় ও ঔদরিকতা অবলম্বন করিয়া নাটককার দর্শককে হাসাইবার চেষ্টা করেন আর সে চেষ্টা কতকাংশে ফলবতীও হয়। কিন্তু তাহা হইলেও বিদূষকে আমরা উচ্চ অঙ্গের প্রহসনের সাক্ষাৎ পাই না। তা' ছাড়া, বিদূষক নিতান্ত একঘেয়ে জীব—তাহাতে বিচিত্রতার বড় অভাব। সেই এক অভিন্ন ভীরু-প্রকৃতি উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ ধনুকের জ্যাঘোষ শুনিলে ভয়ে জড় সড় হন এবং পিণ্ড খর্জ্জুরের জন্য দিক্ বিদিক্ অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। কালিদাসের প্রতি নাটকেই ঐ জাতীয় এক এক জন বিদূষকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ভবভূতি বিদূষকের নিষ্ফলতা বুঝিয়া তাহাকে তাঁহার নাটক হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন।

সংস্কৃত কাব্যনাটকে যত হাস্যোদ্দীপক চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বোধ হয় মৃচ্ছকটিকের শকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শকার সেক্ষপীয়রের ক্লোটন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। হাস্যরস অবতারণার যে সকল প্রকৃষ্ট উপাদান, তাহা শূদ্রকের বেশ আয়ত্ত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি এক মৃচ্ছকটিক ব্যতীত অন্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

মোটের উপর বলা যায় যে, প্রহসন সংস্কৃত সাহিত্যে বড় ফুটে নাই।

ইহার কারণ কি ? সে কারণ আমি যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে এইরূপ মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের যখন উন্নতির অবস্থা, তখন দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনেকটা প্রচলন ছিল। জাতিভেদ এবং কর্ম্মভেদ থাকায় জাতীয় জীবনের অসামঞ্জস্য, অস্বাভাবিকতা, অসৌসাম্য—(যাহাকে প্রহসনের প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না) বড় একটা বিস্পষ্ট লক্ষিত হইত না। এই এক কারণ। দ্বিতীয় গুরুতর কারণ, হিন্দু কবির মনের গঠন—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অধ্যাত্ম-প্রবণতা—জগতের প্রতি অনাসক্তি। যে যাহা ভালবাসে না বা তাচ্ছীল্যের চক্ষে দেখে, সে তাহার প্রতি ততটা মনোযোগ দেয় না। হিন্দু কবি জগতের নশ্বরতা, মানবজীবনের অকিঞ্চিৎকরতা বেশ উপলব্ধি করিতেন। সেই জন্য মানবচরিত্র—যাহা সেক্ষপীয়র প্রভৃতি কবিরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—সেই মানবচরিত্রের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন প্রতিকৃতি আমরা সংস্কৃত কাব্যনাটকে দেখিতে পাই না। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র লহরী যাহা অনুধাবনের অনুবীক্ষণে দেখিলে হাস্যরসের উৎস বলিয়া প্রতীয়মান হয়,সে সকল হিন্দু কবির দৃষ্টিতে পড়িত না। সেই জন্য বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রহসন প্রণয়নের জন্য ধারাবাহিক প্রযত্ন বা উদ্যম লক্ষিত হয় না। এবং সেই জন্যই বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রহসন বড় একটা ফুটিতে পায় নাই।

অতঃপর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রহসনাংশের সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গালা নাটকে প্রথম প্রথম সংস্কৃত আদর্শের অনুকরণপ্রিয়তা বিশেষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নট নটী সূত্রধার প্রভৃতির সঙ্গে বিদূষকও বাঙ্গালা নাটকে প্রবেশ লাভ করে। সেই সংস্কৃত নাটকের পুরাতন বিদূষক—সেই ভীরুপ্রকৃতি ঔদরিক ব্রাহ্মণ। ইহার অবতারণায় বাঙ্গালা প্রহসনের বড় কিছু বিশেষত্ব নাই; সুতরাং বাঙ্গালা প্রহসনের আলোচনায় ইহাকে বাদ দিলেও বড় কিছু ক্ষতি হয় না।

বাঙ্গালা নাটকের বাল্যে যেমন সংস্কৃতের প্রভাব, কৈশোরে তেমনি ইংরাজি আদর্শের প্রভাব। তাহার ফলে আমরা সামাজিক প্রহসনের প্রবর্ত্তনা দেখিতে পাই। মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ঐ জাতীয় প্রহসন। ইহাদের উদ্দেশ্য সামাজিক দোষের আবিষ্কার করিয়া তাহার সংস্কার চেষ্টা। দীনবন্ধুর অধিকাংশ নাটক ঐ চেষ্টা প্রণোদিত। তাঁহার 'সধবার একাদশী' 'জামাই বারিক' 'লীলাবতী' প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক প্রহসন। তাঁহার নদের

চাঁদ, নিমচাঁদ, অটল, বাঙ্গালী চরিত্রের অনশ্বর চিত্র। দীনবন্ধুর জলধর ও বকেশ্বরে কতকটা স্বাভাবিক প্রহসনের অবতারণা লক্ষিত হয়; কিন্তু ঐ দুই চরিত্র তাঁহার নিজস্ব নহে, উহারা সেক্ষপীয়র সৃষ্ট ফলষ্ট্যাফ্ ও পরোলিশের আদর্শে কল্পিত।

বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক প্রহসন বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার জন্য বাঙ্গালা রঙ্গভূমির নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়। বিবাহ বিভ্রাট, রাজা বাহাদুর, বাবু, একাকার, বেল্লিক বাজার প্রভৃতিতে অতি উচ্চ অঙ্গের সামাজিক প্রহসনের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। কালক্রমে সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত এ সকল প্রহসনের উপযোগিতা কমিতে পারে; কিন্তু সাময়িক সমাজের সত্যমূলক নক্সা স্বরূপে ইহাদের যে মূল্য আছে, সহজে তাহার হ্রাস হইবে না।

বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রবর্ত্তক বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এ বিষয়ে তিনি একরূপ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতা যে কোন জাতির ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে। তিনি বঙ্গের ড্রাইডেন। তেমনি ভাষা সম্পত্তি ও ছন্দঃ প্রবাহের উপর আধিপত্য, তেমনি সরস বিদ্রূপভঙ্গিমা। কাব্য বিষয়ে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ছাত্র ছিলেন। প্রতিভাশালী গুরুর কৃতী ছাত্র। দীনবন্ধুর কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রূপের ক্ষমতাবিষয়ে তাঁহার মুচিরাম গুড় প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপাধি ব্যাধির এরূপ অব্যর্থ মহৌষধ বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্র নহেন কিন্তু তাঁহার ধারার অনুসরণ করিয়াছেন—শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার বাজিমাৎ, বাঙ্গালীর মেয়ে, আজব সহর কলিকাতার বর্ণনা প্রভৃতি পড়িলে এক ঈশ্বর গুপ্তকেই মনে পড়ে। হেম বাবুও ঈশ্বর গুপ্তের প্রণালী ও প্রতিভায় বিস্তর প্রভেদ। তবে ব্যঙ্গের ধারার অনেকটা ঐক্য দেখা যায় বলিয়া ঐরূপ বলিলাম।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পঞ্চানন্দ ওরফে পাঁচু ঠাকুরের বিদ্রূপ বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন জিনিষ। ইংরাজিতে ঐরূপ বিদ্রূপের প্রচার আছে বটে কিন্তু বাঙ্গালায় তিনি ইহার প্রবর্ত্তক। তাঁহার ভারত উদ্ধার কাব্য—যাহা তিনি হোমর চরণে সেলাম ঠুকিয়া রচনা করিয়াছেন—তাহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। তাঁহার বিদ্রূপে শ্লেষ ও কঠোরতার পরিমাণ কিছু অধিক; করুণা ও সহৃদয়তার ভাগ কম।

বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাভাবিক প্রহসনের বড় উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। মানবপ্রকৃতির সমালোচনা—কাব্যামোদের উদ্দীপনার জন্য যে হাস্যরসের অবতারণা, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। প্রাচীন কাব্যে যতদূর বুঝা যায় এক কবিকঙ্কণের ভাড়ুদত্তে স্বাভাবিক প্রহসনের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা মুকুন্দরামের চণ্ডী অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। আকার, আচার, ব্যবহার, চতুরতা, ধূর্ত্ততা, বাক্যবাগীশতা প্রভৃতি গুণে মণ্ডিত হইয়া ভাড়ু বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইয়াছে।

বঙ্কিমবাবুর কোন কোন উপন্যাসে এই স্বাভাবিক প্রহসনের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। দুর্গেশনন্দিনীর দিগ্‌গজ বা মৃণালিনীর গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের কাহিনী ঐ শ্রেণীর প্রহসন। যতদূর বুঝা যায় প্রহসন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অনুকূল ছিল না। সেই জন্য বোধ হয় তাঁহার উৎকৃষ্টতম উপন্যাস সকলে প্রহসনের অবতারণা দেখা যায় না।

পূর্ব্বে বাঙ্গালা যাত্রার একটা অঙ্গ ছিল সঙ। অতি বড় বিয়োগান্ত পালায়ও কোন কৌশলে সঙ আসরে নামিয়া দর্শকদিগকে একবার হাসাইয়া যাইত। এটা বঙ্গের চিরন্তন প্রথা। যাত্রায় সেই জন্য ভাঁড়, কালুয়া, ভুলুয়া, বড়াই প্রভৃতির আবির্ভাব হইত। বাঙ্গালীর এই রুচির অনুসরণ করিয়া শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার রচিত অধিকাংশ নাটকে (যাহা বাঙ্গালা রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া থাকে) বীররস অথবা করুণরসের সহিত হাস্য-রসের মিশ্রন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা অধিকাংশ স্থলেই সফল হইয়াছে। সেক্ষপীয়রের পাঠক অবগত আছেন যে, এ প্রণালী সেক্ষপীয়রের অনুমোদিত। তাঁহার প্রায় সকল নাটকেই ঐ প্রণালীর সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে। মরুভূমিতে যেমন শষ্পাবৃত স্থান—সেইরূপ তাঁহার নাটকে শোক তাপ অভিশাপের মধ্যে হাস্যরসের উৎস। গিরিশ বাবুর নাটকেও ঐ সেক্ষপীয়রোচিত গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তাঁহার নলদময়ন্তীর বিদুষকে, মুকুল মুঞ্জরার বরুণ চাঁদে অথবা জনার গঙ্গাপুত্রে (অন্যান্য চরিত্রেরও আব-শ্যক হইলে উল্লেখ করা যায়) তিনি যে 'স্বাভাবিক' প্রহসনের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যত্র বিরল।

প্রহসন সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহার সংক্ষেপে আলোচনা শেষ করিলাম।

আসামের ইতিবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

"আসাম" নাম আধুনিক। আর্য্য-সমাগমের প্রাক্কালে এই প্রদেশের কি নাম ছিল, আমরা অবগত নহি; তবে, দেশের নাম না জানিলেও, তত্রত্য আদিম অধিবাসীবর্গের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। আদৌ আসাম একটী অনার্য্য প্রদেশ,—অনার্য্য-সমাগমেই এই দেশের জনসংখ্যার সারভাগ সংগঠিত। অধুনা আর্য্যপ্রভাব প্রবল হইলেও তাহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠবর্ণের মধ্যেই নিবদ্ধ;—নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা, নামমাত্র হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও, পান-ভোজন ও বিবাহাদি বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের আদিম বর্ব্বর রীতি অনেকাংশে পালন করিয়া থাকে। কেহ কেহ অদ্যাপি তীব্র সুরা ও বরাহ-মাংসে পরিতৃপ্ত হয় এবং অকিঞ্চিৎকর ভাবে তাহাদিগের পতি-পত্নী পরিত্যাগ করে! শেষোক্ত প্রথা নিবন্ধন অধুনা ফৌজদারী বিচারালয় সমূহে "পত্নী-হরণ" বিষয়ক ক্লেশকর অভিযোগের সংখ্যা প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ বা বৃদ্ধগণের দ্বারা এই সমস্ত গৃহ-বিবাদ মীমাংসিত হইত, কিন্তু অধুনা ব্যবহারতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যবস্থা ও ব্যবহারজীবীর সংখ্যাবাহুল্য বশতঃ এই সকল ঘটনা সহজেই সরকারি বিচারালয়ের অধীন হয় এবং অপরিচিত বিদেশীয়েরও শ্লেষ ও বিদ্রূপের কারণ হইয়া থাকে। পর্ব্বত ও জঙ্গলসমূহে অনার্য্যবসতি অধিকতর প্রবল; তথায় হিন্দুত্ব অদ্যাপি প্রবেশলাভ করে নাই, সুতরাং তত্রত্য অধিবাসীবর্গ তাহাদিগের আদিম প্রথা অবাধে উপভোগ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র আদিম অসভ্য জাতি আসামের চা-ক্ষেত্র-সমূহে কুলীরূপে আনীত হইতেছে, এবং ইহারাই কালক্রমে বসতি স্থাপন করিয়া দেশের বিমিশ্র প্রজাপুঞ্জের সংখ্যা বর্দ্ধন করিতেছে। এতদ্দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনার্য্য জাতি সমূহ আসামেতিহাসের এক বিশেষ অঙ্গ সংগঠন করিয়াছে;—উত্তর ভারতের অন্যত্র এই বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত এই সকল অনার্য্য জাতি দলে দলে ধারা-প্রবাহে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাভূমে আগমন পূর্ব্বক শস্য শ্যামল সমতল ভূখণ্ডে সম্মিলিত হইয়া নগর ও রাজ্য সংস্থাপন করিত,—এক জাতি অপর জাতিকে দূরীভূত করিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিত, পরন্তু তাহারাও আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম্প্রদায় কর্তৃক বিতাড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইত ; কখন বা কোন সম্প্রদায় তাহাদিগের পার্ব্বত্য নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া অগ্নি ও তরবার সংযোগে আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের ও আপন আত্মীয় কুটুম্বের পল্লী লুণ্ঠন করিত। এইরূপে সমাগত ও সংগঠিত হইয়া ইহারা আসামের নিয়তিচক্র অনেকাংশে রূপান্তরিত করিয়াছে। এই সকল ঔপনিবেশিক দুর্দ্দান্ত জাতি সমূহের মধ্যে কাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—নির্ণয় করা দুরূহ ; তবে ভাষা ও জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্থূলতঃ পরস্পর একটা পার্থক্য-রেখা-সম্পাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।* অতি প্রাচীনকালের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে আমরা এক কদাকার কৃষ্ণকায় জাতি নির্দ্দেশ করিতে পারি ;—ইহাদিগের ক্ষুদ্র আকৃতি, ক্ষীণ তনু, সূচ্যগ্র নাসা, প্রসারিত নয়ন, শ্মশ্রুশূন্য মুখমণ্ডল এবং কুণ্ডলীকৃত কেশপাশ বিশেষত্ব পরিচায়ক। ইহাদিগের ভাষাবশেষের যে কিছু নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায়, তাহাতে বহুপদাংশবিশিষ্ট ও শ্রুতিমধুর বাক্য যোজনা লক্ষিত হয় ; পরন্তু কোন ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে ইহারা প্রথমে মূল কথাটির উল্লেখ করিয়া পরে তাহার ভাববোধক গুণারোপ করিত, বোধ হয়। তাহারা প্রায়শঃ পর্য্যটনপ্রিয় ছিল এবং মধুচক্রাকারে নিজ নিজ বাস-কুটীর নির্ম্মাণ করিত। সামাজিক আচারের মধ্যে বিবাহ-ব্যাপারে তাহাদিগের এক বিশেষত্ব ছিল,—পরিবারস্থ সকল ভ্রাতা মিলিয়া এক পত্নীর পাণিগ্রহণ করিত এবং সকল ভগ্নী মিলিয়া এক পতির অনুগামিনী হইত ! অদ্যাবধি এই প্রথা আসামে বিরল নহে ; ভুটিয়াদিগের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ইহা প্রবল রহিয়াছে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে ডফ্‌লাদিগের † মধ্যেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মিরিদিগের মধ্যেও নিঃস্ব সংসারে প্রত্যেক ভ্রাতার পৃথক্ পত্নী-ক্রয়ের (!) সঙ্গতি না থাকিলে তাহাদিগের সমবেত পরিশ্রমলব্ধ উপার্জ্জনে সকলের

* *Vide* Mr. S. E. Peal's article in the "English Mechanic and World of Science," December 14, 1894.

† Col. Dalton's "Ethnology of Bengal," page 36.

উপভোগের নিমিত্ত একমাত্র পত্নী ক্রয় করিয়া থাকে। * এইরূপ এক পত্নীর বহু পতি গ্রহণের প্রথা কিঞ্চিৎ পুরাকালে খাসিয়া ও গারোগণের মধ্যেও বিদ্যমান থাকার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সমস্ত জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতি-সূত্রে উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়, এবং রমণীগণ পতি সংসারভুক্তা না হইয়া আপন আত্মীয়ের মধ্যে অবস্থান করায় পুত্র-কন্যা মাতৃকুলেই বিদ্যমান থাকে,—পিতার পরিচয় বড় দিতে পারে না। † কিংবদন্তী আছে, 'সব্‌টঙ্গা' নামক স্থানবর্ত্তী প্রস্তর স্তম্ভ-মালা অতি পুরাকালে ত্রিংশৎ পতিবিশিষ্টা কোন সুন্দরীর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ প্রোথিত হইয়াছিল!—এতদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রথার প্রাচীনত্ব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

কালসহকারে উপরিবর্ণিত কৃষ্ণকায় জাতি দক্ষিণ চীন হইতে সমাগত এক জাতি কর্ত্তৃক স্থানভ্রষ্ট ও ক্রমশঃ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই আগন্তুকদিগকে মন-আনাম (Mon-Anam) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভাষাবিষয়ে এবং (আকৃতির ক্ষুদ্রত্ব ব্যতিরেকে) শারীরিক গঠনপ্রণালী বিষয়ে ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। ইহাদিগের বর্ণ জ্যোতিহীন, কেশ বিরল, চক্ষু ক্ষুদ্র ও অর্দ্ধনিমীলিত, নাসা অবনত ও দণ্ডশূন্য এবং মুখমণ্ডল সমতল। ইহারা স্তম্ভোপরি উত্থিত করিয়া বহু পরিবারের বাসোপযোগী সুদীর্ঘ গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আত্মীয়-স্বজনে মিলিয়া একই গৃহে বাস করিত ; পরন্তু, গ্রামস্থ অকৃতদার ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য অনেক স্থলে পৃথক্ গৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকিত। নাগা, আবর, খাম্‌টী প্রভৃতি জাতির মধ্যে এবং, কতক পরিমাণে, লালুঙ্‌ ও গারোদিগের মধ্যেও অদ্যাপি এইরূপ গৃহ বিদ্যমান আছে। এই সকল গৃহ দৈর্ঘ্যে ১০০ ফীট এবং উচ্চতায় ৩০ ফীটের ন্যূন নহে। ইহার অভ্যন্তর ভাগ—সদর, অন্দর, উভয়বিধ—বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, এবং শেষভাগ পরিজনবর্গের বৈঠকোপযোগী উন্মুক্ত বায়ুপূর্ণ রেল-বেষ্টিত সুন্দর বারাণ্ডাসংযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যেও বিবাহিত ও অবিবাহিতের জন্য পৃথক্ গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে। আবরজাতির মধ্যে 'ডেকা চাঙ্‌' নামক গৃহে গ্রামস্থ সমস্ত অবিবাহিত পুরুষ মিলিয়া প্রত্যহ রাত্রিযাপন করে, এবং অগ্নি, শত্রুভয় বা অপর কোন রূপ আকস্মিক দুর্ব্বিপাক প্রতিরোধ করণে সমর্থ

* Col. Dalton's "Ethnology of Bengal," page 33.
† Census Report of Assam, 1891, Vol. I, pp. 119-120.

হইবার নিমিত্ত কয়েক জন কৃতদার পুরুষও তথায় উপস্থিত থাকে। 'আও নাগা'দিগের মধ্যে ঐরূপ অকৃতদারের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট গৃহে অল্পবয়স্ক বালকেরা মাত্র বাস করে,—যুবাপুরুষদিগের পক্ষে প্রত্যেকের মনোমত কুমারীর সহিত একত্র শয়ন করাই প্রথা। অবিবাহিতা রমণীগণ অন্যথা নির্জ্জন বা কোন বৃদ্ধার অধিকৃত গৃহে দুই তিন জনে মিলিয়া শয়ন করে,—তথায় প্রতি রাত্রে তাহাদিগের নায়কগণের সমাগম হইয়া থাকে। 'সেমা নাগা'দিগের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষেরা সচরাচর তাহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে একত্র শয়ন করে, এবং কুমারীগণ অন্য গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠে তিন চারি জনে মিলিয়া নিদ্রা যায়; সায়ংকালে এই সকল গৃহে সমবেত হইয়া তাহারা বহুক্ষণ যাবৎ সূতা পাকায়, তুলা পরিষ্কার করে এবং সমাগত যুবকবৃন্দের সহিত রসালাপে বিভোর থাকে।

মন-আনাম জাতির কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে এক বিশেষত্ব ছিল। ইহারা প্রায় পর্ব্বত পার্শ্বস্থ কোন ভূখণ্ড কৃষির জন্য মনোনীত করিয়া তত্রত্য বৃক্ষ সমূহ কাটিয়া ফেলিত এবং তাহার মূলভাগ একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিত, পরে সেই জমি কর্ষণ পূর্ব্বক ঐ মূল দগ্ধ ভস্মের সার ক্ষেপন করিয়া তাহাতে স্বল্প পরিমাণে শস্য জন্মাইয়া লইত। এইরূপ দাহন দ্বারা পরিষ্কৃত ও কর্ষণোপযুক্ত ভূমিখণ্ডের নাম 'ঝুম'। পুনঃ পুনঃ ফসলের দ্বারা এক 'ঝুমের' উর্ব্বরতাশক্তি বিনষ্ট হইলে অন্যত্র উপরোক্ত প্রণালীতে অপর 'ঝুম' প্রস্তুত করিত। এই-রূপে বহু বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র সকল রচিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূখণ্ডের মূল্যবান বৃক্ষরাজি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। বংশপরম্পরাগত ঐরূপ অপরি-মিত 'ঝুম'—বাহুল্য বশতঃই খাসিয়াশৈলস্থ অত্যুন্নত মালভূমি সমূহের তরুহীন নগ্নভাব ঘটিয়া থাকিবে।

মন-আনামদিগের ভাষা একপদাংশময় শব্দ পরিপূর্ণ, সুতরাং জটিল স্বর ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ঝঙ্কার বিশিষ্ট; এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে 'ঙ'ই অধিকাংশ বাক্যের অন্ত্যবর্ণরূপে সংযোজিত দেখা যায়। তদ্ভিন্ন বাক্যের পূর্ব্বভাগে কা, টা, পা প্রভৃতি নির্দ্দেশবাচক উপপদ ব্যবহৃত হইত;—মণিপুরী, নাগা, খাসিয়া ও অন্যান্য জাতির ভাষায় ঐ সমস্ত উপপদের অদ্যাপি প্রচলন রহি-য়াছে। মন-আনাম জাতি ধীরে ধীরে ব্রহ্মদেশ হইতে ব্রহ্মপুত্রবিধৌত প্রদেশে আগমন করিয়াছিল; তাহাদিগের আচার, অবয়ব ও ভাষার নিদর্শন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাওয়া

যায়, তন্মধ্যে খাসিয়াদিগকেই তাহাদিগের অবিমিশ্র বংশাবশেষ বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বতিব্বত সমাগত দীর্ঘাকার জাতিসমূহের অভ্যুত্থান ও বিস্তৃতির সঙ্গে পরবর্ত্তী মহা জাতিবিপ্লবের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সকল জাতি ভারতসীমান্ত অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসে, এবং পূর্ব্বোক্ত জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্গণোক্ত 'তিব্বত-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) শ্রেণীতে পরিণত হয়; এই শ্রেণী খাসিয়াশৈল ভিন্ন 'মন-আনাম' অধিকৃত অপর সর্ব্বত্রই বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এইরূপে আসামেতিহাসের অতীত যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি কিরূপে সমাগত ও রূপান্তরিত হয়, তাহার আভাস পাওয়া যায়; প্রথমতঃ, ক্ষীণতনু, মৃদুভাষী, কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় (Dravidian) জাতি,—পরে ক্ষুদ্রাকার, বলিষ্ঠ, অনুনাসিক স্বরবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ (চীন বা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত) জাতি,—এবং তৎপরে হিমালয়ের পরপার হইতে উপনীত দীর্ঘাকার, কর্কশভাষী, এক গৌরবর্ণ জাতি আসিয়া এতদ্দেশে বাস করে। শেষোক্তগণের স্বর অস্পষ্ট ও কথা অনুচ্চার্য্য ব্যঞ্জন-বর্ণপূর্ণ; ভাবপ্রকাশোপযোগী ভাষা সংস্থান অভাবে ইহারা এক কথার পুনরুক্তি বা গুরু উচ্চারণ ও অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালন করিত। এই সকল জাতির পরে, ঐতিহাসিক সময়ে, আর্য্য, আহম ও কোচদিগের সমাগম ঘটে,—সে সমস্ত বৃত্তান্ত পরে আলোচনা করা যাইবে।

আসামের যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি অধুনা আমাদিগের নয়নগোচর হয়, তাহাদিগের কেহই আদৌ বর্ত্তমান আকারে উপনীত হয় নাই; প্রত্যুত, তাহারা উল্লিখিত, জাতিসমূহের সংমিশ্রণে এবং পরে পৌনঃপুনিক স্থানীয় বর্ণসঙ্করে গঠিত হইয়াছে। নাগা, লুশাই, বড়ো প্রভৃতি জাতির ভাষায় তাহাদিগের ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষদের প্রভাব লক্ষিত হয়। নাগার কথায় ব্রহ্মদেশীয় ভাব অল্প,—তাহা অপেক্ষাকৃত সুললিত এবং দ্বিপদাংশময় শব্দপূর্ণ; ইহাদিগের সর্ব্বনাম পদ সকল তিব্বতী, মন-আনাম ও দ্রাবিড়ী কথা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। বড়োদিগের ভাষা এতৎপক্ষে অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়াছে। পরন্তু, খাসিয়াদিগের কথায় একপদাংশবিশিষ্ট, শব্দবাহুল্য এবং আদিম গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব দেখা যায়। তবে, প্রথমে পদার্থের উল্লেখ ও পশ্চাৎ তাহার ভাববোধক বাক্যসংযোজনা রূপ তাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষানুগত বাক্‌পদ্ধতি উল্লিখিত সকল জাতির মধ্যেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ভিন্নদেশাগত এই সমস্ত আদিম বর্ব্বর জাতির মধ্যে কোন কোন শ্রেণী বড়ই নরহত্যাপরায়ণ ছিল। নাগা ও কুকীদিগের মধ্যে এই রক্তপিপাসা প্রবৃত্তি অদ্যাপি প্রবল রহিয়াছে। দুই দশ জন মানবের প্রাণবধ সাধন করিতে না পারিলে ইহারা স্বশ্রেণীস্থ লোকের নিকট সম্মানভাজন হয় না; পরন্তু, যে ব্যক্তি নরশোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিতে না পারে, তাহাকে কাপুরুষ বোধে, যুবতীগণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহে না। পুরুষ হউক, রমণী হউক, বালক হউক—যে কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিতে পারিলে হত্যাকারী আপন শ্রেণী বা গ্রামস্থ প্রথামত সম্মানসূচক অলঙ্কার ধারণের উপযুক্ত হয়; একারণ প্রত্যেকের হৃদয়ে নরমুণ্ডগ্রহণেচ্ছা নিতান্ত বলবতী থাকে। যুবকেরা বিপক্ষের বধসাধনার্থ বিগ্রহক্ষেত্রে ধাবমান হয়, একে অন্যের লক্ষীভূত 'শিকারের' প্রতীক্ষায় গোপনে অবস্থান করে, এবং প্রায়ই এক গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়া থাকে,—তখন বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল কেহই তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এইরূপে জয়লাভ করিলে বিজয়ী যোদ্ধাগণ বংশদণ্ডে নরমুণ্ডমালা বিদ্ধ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন পুরাঙ্গনাগণ তাহাদিগের অভ্যর্থনার্থ বিচিত্র পরিচ্ছদে সমুপস্থিত হয়। তৎপরে সেই শোণিতপিপাসু পিশাচগণ জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া গগনভেদী চীৎকার সহকারে ঐ সমস্ত নরশির লইয়া গ্রামের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ ও মদ্য মাংসে বিভোর হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে। পরিশেষে সেই সমস্ত নর-কপাল-মালা নরহন্তাগণের এবং তদীয় দলপতির গৃহপ্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া রক্ষিত হয় এবং তাহা ভবিষ্যবংশধরগণের নিকট বংশগৌরব ও শ্লাঘার পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রিটিশরাজের প্রবল হস্ত কর্ত্তৃক নাগাদিগের এই দুর্দ্দমনীয় রক্তপিপাসা অনেক পরিমাণে উপশমিত হইলেও, ইহা অদ্যাপি কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে, এবং দূরবর্ত্তী জাতিবর্গের মধ্যে প্রকাশ্যভাবেও, বিদ্যমান রহিয়াছে ও সামান্য সুযোগ পাইলেই প্রবল হইয়া উঠে।

এই সমস্ত আদিম জাতিগত আর এক প্রথা অদ্যাপি আসামে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। বিচিত্র বর্ণে অঙ্গ চিত্রিত করা তাহাদিগের পদ্ধতি ছিল। এই অঙ্গচিত্রণ নানা ভাবে সংসাধিত হইয়া থাকে। শিঙ্‌পো জাতীয় পুরুষেরা অতি অল্প মাত্রায় তাহাদিগের অঙ্গের একাংশ চিত্রিত করে, কিন্তু তাহাদিগের রমণীগণ উভয় পদের গুল্‌ফসন্ধিস্থল হইতে জানুদেশ

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাবে উল্কি ধারণ করে। আওনাগাদিগের কামিনীগণ চরণ ও কুচদেশ এবং পুরুষগণ বক্ষঃস্থল অঙ্কিত করিয়া থাকে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণিতানুরূপ নরহন্তাগণ তত্তৎকৃত শিরশ্ছেদের সংখ্যাজ্ঞাপক নরাকৃতি অঙ্কন দ্বারা স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রদান করে।

এতদ্দেশীয় আদিম জাতিবর্গের চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণের মধ্যে তাহাদিগের সম্প্রদায়গত সহানুভূতি ও প্রজাপরতন্ত্র প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবরদিগের মধ্যে কোন পুরুষ দারপরিগ্রহ করিলে সেই ব্যক্তি ও তাহার নবোঢ়া পত্নী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পর্ব্বক স্থানান্তরে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে দলস্থ সকলেই যথাসম্ভব আনুকূল্য করিয়া থাকে,—গৃহনির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত উপাদান পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত ও সুবিন্যস্ত থাকায় একদিনের মধ্যে সেই গৃহ প্রস্তুত হইয়া নবদম্পতীর বাসোপযোগী হয়। কোন কোন জাতির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ পীড়িত হইলে দলস্থ অন্যান্য কর্ত্তৃক তাহার ভূমি কর্ষিত ও শস্য উপচিত হইয়া থাকে। তবে, এই সমস্ত অসভ্য বর্ব্বরগণ পরস্পর সৌভ্রাত্রভাবের আকর্ষণে যে কার্য্য উৎফুল্ল হৃদয়ে সুসম্পন্ন করিবে, কেহ নিয়োগসম্মত আদেশ করিলে তাহা কদাপি পালন করিবে না। ফলতঃ, তাহারা কাহারও প্রাধান্য বা আধিপত্য স্বীকার করে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপ স্বাধীন ভাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশেষ আলোচনার বিষয়। সমাজের শৈশবাবস্থায় গৃহকর্ত্তা পরিবারস্থ সমস্ত লোকের উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, পরে পরিজন-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া পল্লীরূপে পরিণত হইলে দলস্থ কার্য্যকলাপ পরিচালনার্থ সাধারণ সম্মতিক্রমে এক জন দলপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। কিন্তু আদিম বর্ব্বরাবস্থায় কোন ব্যক্তি অপরের অধীনতা সহ্য করিতে চাহে না; তদবস্থায় দলপতির কর্ত্তৃত্ব নিষ্ফল, সুতরাং বিধি ব্যবস্থাও অকিঞ্চিৎকর ও অনিয়ন্ত্রিত। এই কারণে পার্ব্বতীয় মিরিদিগের মধ্যে সাধারণ শান্তিরক্ষার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না,—মাত্র দলপতি যথাশক্তি তদ্বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব অত্যাবশ্যক জাতীয় উপদ্রব-শান্তি বিষয়েও ব্যক্তিবিশেষের উদাম প্রকৃতি ও অব্যবস্থিতচিত্ততা এক মাত্র পরিচালক হইয়া দাঁড়ায়,—সমগ্র সম্প্রদায়ের সমবেত সহায়তা কর্ত্তৃক দলপতির শক্তিপ্রাধান্য বর্দ্ধিত হয় না।

নাগাদিগের মধ্যেও কোনরূপ আভ্যন্তরিক শাসননীতি নাই,—সদর্পে

আত্মস্বত্ব সমর্থন করাই তাহাদিগের প্রচলিত ব্যবস্থা। দলপতি কোনরূপ রাজস্ব প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু প্রজাসাধারণও তাহাদিগের মতানুকূল না হইলে দলপতির আদেশ পালন করে না। এইরূপ গ্রাম-মণ্ডলদিগের পদ ও মর্য্যাদা বংশপরম্পরাগত নহে,—ব্যক্তিবিশেষের অর্থ, সামর্থ্য ও গুণগ্রামের উপরেই তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। প্রাণের জন্য প্রাণ লওয়া এই উচ্ছৃঙ্খল জাতির একমাত্র পাশব নীতি এবং তন্নিবন্ধন জীবন-সংহারক গৃহ-সংগ্রাম ইহাদিগের মধ্যে নিত্য ঘটনা। এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের বিবাদ সূত্রে প্রায়ই প্রত্যেক গ্রামে পরস্পর বিষম বিদ্বেষী দুই বিপক্ষ দল থাকে, পরন্তু, তৃতীয় এক দল নিরপেক্ষভাবে ঐ উভয় দলের সহিত সখ্যতাবদ্ধ হইয়া বাস করে।

এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্রতার অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাব গঠিত এবং প্রজাসাধারণের ও ব্যক্তিবিশেষের অনুশাসনার্থ প্রণালীবদ্ধ কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্দ্বারা নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী লোকের অন্তরে সমবেত আত্মরক্ষার জ্ঞান সঞ্জাত হইয়া বহিঃশত্রু প্রতিরোধ করিবার শক্তি জন্মে। আবর জাতির মধ্যে এই ভাবের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহারা প্রজাতন্ত্র শাসননীতি সুন্দর ভাবে গঠন করিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় আভ্যন্তরিক ব্যাপারে স্ব স্ব বিধি অনুসারে চলিয়া থাকে; পরন্তু মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া বিরাট সভার অধিবেশন করে, তাহাতে ঐকমত্য ঘটিলে সকলে যুক্ত-রাজ্যের ন্যায় এক শাসনপ্রণালীর অধীন হইয়া কার্য্য করে। ইহাদিগের প্রত্যেক গ্রামে সাধারণ সভার উপযোগী 'মোরাঙ্' বা মন্ত্রণা-গৃহ আছে; তথায় 'গাম' বা বৃদ্ধেরা সভাপতির কার্য্য করে ও গ্রামস্থ অন্যান্য কলহকুশল কর্ত্তৃপক্ষেরা নানারূপ বাদ-বিতণ্ডা ও বক্তৃতাদি করিতে পায়। সাধারণ বিষয়-কার্য্য-পর্য্যালোচনার্থ গণ্য ব্যক্তিরা প্রত্যহ সমাগত হয়; তাহাদিগের তাৎকালিক পান-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য সাধারণের ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে সুরা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহারা অত্যাবশ্যক ও অতি তুচ্ছ সকল বিষয়েরই আলোচনা করে,—ফলতঃ, ইহাদিগের বিনা মন্ত্রণায় কোন কার্য্যই হয় না; ইহাদিগের মীমাংসিত আদেশ-বাণী বালকগণ অচিরে দ্রুতগমনে গ্রামের চতুর্ভিতে তারস্বরে প্রচার করিয়া আসে, এবং তদনুসারে দিবসের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। দলপতির কোন রূপ উপঢৌকন লইবার অধিকার নাই; সাধারণ কার্য্যসূত্রে কোন

দ্রব্য প্রদত্ত হইলে তাহা প্রজাসাধারণের হিতার্থ সার্ব্বজনিক কোষাগারে রক্ষিত হয়। এইরূপে 'মোরাঙে' সংরক্ষিত বরাহ-শিশু ও হংস-কুক্কুটাদি এবং অর্থদণ্ড বা স্বত্বনাশ দ্বারা অথবা উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে সাধারণ কোষে ন্যস্ত অন্যবিধ সম্পত্তি সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইহাদিগের এইরূপ নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক আবার আপনাকে জন্মগত স্বাধীন বলিয়া পরিচয় প্রদানে শ্লাঘা বোধ করে, পরন্তু, তদ্বিধ স্বাধীন ভাবাপন্ন পৌরজনের প্রতি সমাজের মধ্যে কাহারও প্রাণদণ্ড বা কোনরূপ কঠিন শারীরিক দণ্ড বিধান করিবার ক্ষমতা নাই। রাজ্যশাসন প্রণালীর ইহা কেমন অপরূপ আদর্শ!—এইরূপ অসভ্য ও অশিক্ষিত সমাজ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া কালের আবর্ত্তনে কেমন জটিলতা-ময় শাসননীতি গঠিত হইয়া থাকে; তখন কোথাও অপ্রতিহত প্রভাব একমাত্র নরপতি সমগ্র শাসনভার বহন করেন, কোথাও ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিনষ্ট হয়, আবার কোথাও বা সমাজস্থ অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে প্রভূত ধনসম্পত্তি ন্যস্ত হইয়া পড়ে।

শাসননীতি-ঘটিত ক্রমোন্নতির পরবর্ত্তী অবস্থা আমরা খাসিয়াদিগের মধ্যে দেখিতে পাই। প্রজাতন্ত্র-ভিত্তিবদ্ধ হইয়া ইহাদিগের শাসনযন্ত্র অল্প লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। কোন কোন খাসিয়া জনপদে বংশপরম্পরাগত 'সিএম্' বা রাজপুরুষগণ প্রাচীন লোকদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক আপনাপন নির্দ্ধারিত প্রভুত্বানুসারে স্বাধিকারভুক্ত ভূভাগ শাসন করে,—পুনশ্চ, অন্যত্র প্রজাসাধারণ কর্তৃক শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়; তবে উভয় ক্ষেত্রেই রাজকার্য্য বিষয়ে প্রজার মতই প্রবল হইয়া থাকে। ফলতঃ, রাজার অভিষেক বা পদচ্যুতি প্রজার সম্পূর্ণ আয়ত্ত; তাহারা স্বেচ্ছামত পূর্ব্বকথিত প্রবীণ ব্যক্তি-দিগকেও তাহাদিগের কার্য্যভার হইতে অপসারিত করিতে পারে। উৎসবাদি উপলক্ষে সাধারণ ব্যয়ে পানভোজনাদি দ্বারা প্রজাবর্গের পরিতৃপ্তি সাধন ও সর্ব্বথা তাহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করা রাজার পক্ষে বিধেয়; অধিকন্তু, অর্থদণ্ড বা বিপণি-লব্ধ দ্রব্যজাত সাধারণ হিতার্থ ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য,—রাজার তাহাতে কোন অধিকার জন্মিতে পারে না। এক পক্ষে রাজশক্তি এতাদৃশ সংযত হইলেও, অন্য বিষয়ে 'সিএম্'দিগের হস্তে অনেক পরিমাণে ক্ষমতা অর্পিত হয়। তাহারা প্রজার উপর কারাদণ্ড ও শারীরিক দণ্ড বিধান করিতে পারে; পুরাকালে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষগণকে যুদ্ধযাত্রায়

বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিতে পারিত। বহিঃশত্রু সম্মুখীন হইলে তাহারাও আবর জাতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ সাধন করিত;—ব্রিটিশ-সৈন্য কর্ত্তৃক খাসিয়া রাজ্য আক্রান্ত হইলে সুপ্রসিদ্ধ তীরৎ সিংহের কর্তৃত্বাধীনে ঐরূপে সকলে মিলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক সময়ের প্রাক্‌কালে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি আসামে বসতি করিয়াছিল, এবং যাহাদিগের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের বংশধরগণকে আমরা অদ্যাবধি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে আসামের চতুর্ভিতে দেখিতে পাই,—উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহাদিগের কতক তথ্য অবগত হওয়া যায়। অতঃপর, ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে যে সমস্ত জাতির সমাগম ঘটে, পরবর্ত্তী প্রস্তাবে তদ্বিষয়ক আলোচনা করা যাইবে।

কবিতা-কুঞ্জ।

(১)

আবাহন।

এস তুমি মম ঘরে, মঙ্গল লইয়া করে,—
নিরানন্দ গৃহে কর প্রীতির বিকাশ;
বিনাশি' আঁধার ঘন, জ্যোছনায় অনুক্ষণ
আলোকিত কর সখি! জীবন-আকাশ।
হৃদয়ের ভাঙা গান কর আসি' অবসান,
ছিন্নপ্রায় তন্ত্রীরাজি করিয়া নূতন,—
বরষ গো অনিবার প্রেম-গীতি-সুধা-ধার,—
মধুময় কর এই নিখিল ভুবন।
নিরাশার আঁখিজল, বেদনার হলাহল,
ঘুচে যা'ক্ চির তরে আগমনে তোর;
নবীন সুখের ছটা, প্রথম বিজলী-ঘটা
বিকাশি', হউক পুনঃ হৃদি মোহে ঘোর।

সংসারে আসুক ফিরে, শান্তি-দেবী ধীরে ধীরে,
উজলিয়া দশ দিশি নবীন প্রভায় ;
অলক্ষী করিয়া দূর, সৌন্দর্য্যে সাজায়ে পুর,
মুগ্ধ কর আঁখি-মন নিজ মহিমায়।
মুগ্ধ করি' নিজ গুণে, বসন্ত-প্রভাতারুণে,
বাঁধিও নাগের পাশে হৃদয় আমার ;
হানিও শকতি ভরি', কাঁপাইয়া থরথরি,
নয়নের শর যত, চপলার ভার।
নিভিলে অতীত-স্মৃতি, নব রাগ নিতি নিতি,
ফুটিয়া উঠিবে কত, ঢালিবে মাধুরী ;
মধুর উচ্ছ্বাস্ শত, হিয়া মাঝে অবিরত,
বহিবে অনন্ত ভাবে যাতনা পাশরি'।
ফল-ফুলে সুশোভিতা হ'য়ে সদা বিরাজিতা,
লভিও অক্ষয় পুণ্য,—দেব আশীর্ব্বাদ ;
খেলিয়া সংসার-খেলা, শত শত দেখি' মেলা,
রেখে যে'য়ো স্মৃতি তব,—দেবীর প্রসাদ।
এস তুমি এবে ঘরে, অলস-সোহাগ ভরে,
আবাহন করি আজি পূর্ণিমা যামিনী ;
নীরস সংসারে আসি,' আনন্দের স্রোতে ভাসি,'
প্রবাহিত কর সদা প্রেম-মন্দাকিনী।

---

(২)

বিসর্জ্জন ।

পূজেছি যাহারে চির হৃদি উপচারে,
আজি সে আরাধ্য ধনে ফেলিলাম দূরে—
বিসর্জ্জিনু সে প্রতিমা হৃদয় হইতে,—
নিশিদিন আর নিতি হ'বে না কাঁদিতে।

অশ্রুজলে গাঁথি' মালা দেবতা-চরণে
দিয়াছি,—পূজেছি কত হৃদয়-প্রসূনে,
তবু ত দেবতা মোরে হ'ল না সদয় ;
তাই আজি হৃদি হ'তে বিসর্জ্জিনু তায়।
ব'সাব আসনে তা'র ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরে,
পূজিব তাঁ'রেই হৃদে মানসোপচারে।
প্রণমি চরণে তব, পাষাণ-হৃদয়া,—
পলে পলে রক্ত-ধারা ল'য়েছ শুষিয়া ;
আর নয়,—যাও দেবি ! যাও দূরে চ'লে—
সঁপিনু তোমায় আজি অতল সলিলে।

---

(৩)

দু'খানি ছবি।

(বাল্য-সখি-দ্বয় দর্শনে লিখিত।)

(১)

মরি কি মোহন রূপের সরসে
যুগল নলিনী রাজে—
বিকাশি' সৌরভ, সৌন্দর্য্য-বৈভব,
হৃদি-বিমোহন সাজে !
কনক-উৎপল একটি তাহার
ছড়ায় কনক-কর,—
লহরে লহরে হাসির কিরণ
উথলে উজলি' ঘর।

(২)

আঁখি-স্নিগ্ধকর শ্যামল কমল
অপর একটি তা'র,
আধেক ফুটন্ত, আধ মৃদু জ্যোতিঃ,
মৃদুল সৌরভ-ভার।
সলাজ চাহনি, সুধীর চলন,
লজ্জাবতী লতা মত—
প্রিয়জনও হেরি' সঙ্কুচিতা হ'য়ে
ধরা পানে হয় নত।

সে নলিনী পানে চাহিলে যেন বা
নয়ন ঝলসি' যায়,
মধুর-উজ্জ্বল জ্যোতির সরসে
সকলি ডুবিতে চায়।
বুঝি বা তাহারে গড়িলা বিধাতা
বালার্ক-কিরণ দিয়ে,
বুঝি উগ্রতর চম্পক-সৌরভ
দিলা তায় মাখাইয়ে।
কত উজ্জ্বলতা, কত জ্যোতিরাশি,
তীব্র সে সৌরভ কত,—
মানবের ক্ষুদ্র গৃহ-মাঝে সে যে
জ্যোতির দেবতা মত!

কোমলতাময়ী মোহন মূরতি,
অতুল মাধুরী তায়,—
সে চারু সৌন্দর্য্য না পাই খুঁজিয়া
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-গায়।
নব প্রস্ফুটিতা বন যূথিকার
পাতা-ঢাকা মুখখানি,
স্বচ্ছ মেঘতলে পূর্ণ সুধাকর,
বড় মনোহর জানি;
কিন্তু সখি সনে সে তুলনা ছার,
সে যে গো স্বরগ-নিধি,—
ধেয়ানে বসিয়া অমিয় ছানিয়া
গ'ড়েছে তাহারে বিধি!

অতীত ও স্মৃতি।

ত্রিতাপ-বিজড়িত মানব আশার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া যখন এ সংসার-মরুভূমে স্বীয় অভিপ্রায় সাধনে অকৃতকার্য্য হয়, যখন পরিবর্ত্তন ও ক্ষণস্থিতিশীল জাগতিক কার্য্যের মূলে 'বিষাদ'ই জীবনের অন্তিম সহচর বলিয়া অবধারিত হয়, তখন হতাশ্বাসে এ দুঃখের সময়েও মুহূর্ত্তের জন্য—কে বলিবে, কেন?—তাহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়খানি প্রফুল্ল হইয়া উঠে এবং বিষাদপূর্ণ বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাসির ছায়া বিভাসিত হয়;—কে বলিবে, কেন?—তাহার আশা ও উদ্দেশ্যশূন্য বিদগ্ধ জীবনে ক্ষণকালের জন্য নীরবে একটী ভাবের আবছায়া উদ্ভাসিত হইয়া তাহাকে নব বলে বলীয়ান্ করিয়া তুলে।

ইতিহাসের মত অতীত ঘটনার দর্পণ স্বরূপ মানবের হৃদয়াগারে একটী অমূল্য ও অক্ষয় পদার্থ আছে; তাহা স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল হইয়া কাহারও

হৃদয়ের শোক-তিমির বিদূরিত, কাহারও বা শান্তিপূর্ণ সরস হৃদয় দুঃখজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্রমিক সুখ ও দুঃখের স্রোত সঞ্চালিত করে, এবং "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"—এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক নিয়তই মানবের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকে ;—ইহার সাধারণ নাম স্মৃতি।

'ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান'—এই ত্রিবিধ কালের সঙ্গে মানব-জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই অনন্ত ও অসীম বিশ্বে সীমাবদ্ধ মানবের কার্য্যাবলী, অনন্ত পারাবারে জলবিম্বের ন্যায়, ক্ষণিক অস্তিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বগ্রাসী কালের করাল গ্রাসে আত্মাহুতি প্রদান করে। বর্ত্তমানের সঙ্গে আমাদের শুধু মিলন,—কিন্তু কার্য্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। রেলপথে ভ্রমণকারী যেমন দেখিতে দেখিতে নিকটস্থ নগর, বন, উপবন, অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান, তদ্রূপ বর্ত্তমান কালের সঙ্গে আমাদের দেখা হইতে না হইতে উহা অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'এডামে'র কথায় এই বিষয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় ; তিনি বলেন—

"The present, just as we begin to recognise it and to fancy that it is ours, glides into the past ; and we are forced, if we would not look back, to look forward into that future which is ever narrowing its limits, because there is no real present."

আর ভবিষ্যৎ ?—উহা তমোময় ; তবে, উহার সহচরী কল্পনা আমাদের হৃদয়-রাজ্যে সময়ে সময়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়া তুলে। কিন্তু উহার কার্য্য আকাশ-কুসুম সদৃশ ফলপ্রদ ;—ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলিবার ক্ষমতা বিধাতা এ ক্ষুদ্রপ্রাণ মানবদিগকে প্রদান করেন নাই ; তাই মানবের সহিত উহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ নহে।

তবে নিরাশার তপ্তশ্বাসে প্রপীড়িত মানবের মনে মুহূর্ত্তের জন্য কেন প্রফুল্লতার ছায়া বিকশিত হইয়া তাহার বিষাদভরা বদন খানি হাসাইয়া তুলে ?—কেন বা তাহার নিরতিশয় শোকের মধ্যেও ক্ষণস্থায়ী সুখের ক্ষীণালোকে হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে ?—স্মৃতি ও কল্পনা একাধারে জন্মগ্রহণ করিয়া, কালক্রমে বিভিন্ন বরে পরিণীতা হইলেও, বংশমর্য্যাদা ও কুলপ্রথা অনুসারে উভয়ে একই ধর্ম্ম ও কার্য্য-সূত্রে আবদ্ধা ;—কল্পনা—ভবিষ্যতে স্বয়ংবরা, স্মৃতি—অতীতে আত্মহারা; এই স্মৃতিই জীবনের যুগান্তর সংসাধিনী।

আর অতীত ?—আমরা উহাকে বড় ভাল বাসি; অতীতের প্রাণে প্রাণে আমাদের এ ক্ষুদ্র হৃদয় কি-যেন-কি স্নেহের সূত্রে বিজড়িত; তাই আমরা বলিয়া থাকি—"যে দিন যায়, সে দিন সুখের।" অতীত—মরু-দেশের ন্যগ্রোধ তরু, জলহীন দেশের জীবন; উহাতে নয়নানন্দপ্রদায়িনী কোন শক্তি নাই,—চিত্তাকর্ষণকারী কোন ভাব নাই,—আছে শুধু নীরবতা। ঐ নীরবতা এমনই শান্তিময়, এমনই সুখের আধার যে, যে একবার মাত্র স্মৃতির সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ রম্য কাননে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, সেই আত্মহারা হইয়া অনুক্ষণ তাহারই চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকে। স্ত্রীজন-সুলভ সরলতা বশতঃ স্মৃতি যদিও অতীতের যবনিকা উন্মোচিত করিয়া মানস-দর্পণে তাহাকে প্রতিবিম্বিত করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না, তবু হৃদয় তাহার পাষাণময়;—যে অশ্রুপূর্ণ লোচন অবলোকনে কত রাজ্যের উত্থান-পতন জগতের ইতিহাসে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সেই অশ্রুতেই স্মৃতির আনন্দ ও তৃপ্তি। স্মৃতি হাসিতে জানে—হাসাইতে জানে না, ভুলাইতে জানে—কিন্তু সুখী করিতে পারে না। অতীতের সঙ্গে সে প্রাণে প্রাণে বাঁধা; কর্ম্মক্ষেত্রে বিফলকাম মানব যখন নীরবে ও মনের দুঃখে আপনার অকৃতকার্য্যতার বিষয় ভাবিতে থাকেন, স্মৃতি তখনই মোহিনী বেশ ধারণ পূর্ব্বক অতীত ঘটনা-কুসুমের ডালা সাজাইয়া হৃদয়ের প্রান্তদেশে ধীরে ধীরে হাসিতে হাসিতে উপনীত হয় এবং মনকে সেই দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, পরে একে একে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের চিত্র তৎসমক্ষে প্রতিচিত্রিত করিয়া নীরবে চলিয়া যায়, আর ভ্রান্ত মানব সেই মনোমোহন চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে স্মৃতির পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বাল্যের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়েন ও দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিতে থাকেন—"কোথা সাধের ধুলা-খেলা?—কোথা বা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি পবিত্রচেতা বাল্যসখাগণ?"—কিন্তু, হায়! এ জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার-মরুভূমে মায়া-মরীচিকাময় বিভ্রান্ত মানব বাল্যের সেই স্বর্গীয় সুখলাভে কখনই সমর্থ হয়েন না, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য স্মৃতির সহবাসে উৎফুল্ল ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠেন।

অমানিশায় দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক বিদ্যুতালোক দর্শনে ক্ষণকালের জন্য যেমন অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন, জীবন-আঁধারে চিন্তাশীল মানব তদ্রূপ মুহূর্ত্তের জন্য স্মৃতির উজ্জ্বলালোকে আত্মবিস্মৃত হয়েন। কল্পনা অপেক্ষা স্মৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কল্পনার চিত্র শূন্যে প্রতিচিত্রিত, কিন্তু স্মৃতির আলেখ্য

ঘটনা-পটে সন্নিবেশিত। স্মৃতির সঙ্গে কতকটা বসন্তের ভাবের সৌসাদৃশ্য আছে;—বসন্তাগমে কোকিল ডাকে, ভ্রমর ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়,সহকার মুকুলিত হয়; স্মৃতির উদয়ে হৃদয়ের ছিন্ন তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হয়, কত নুতন ভাব অলক্ষ্যে উদ্গত হইয়া মনের মধ্যে প্রফুল্লতা সঞ্চারিত করে। বসন্তের নব মারুতহিল্লোলের ন্যায় স্মৃতি যেন ক্ষণেকের জন্য উদাস প্রাণে সুস্নিগ্ধ শান্তি-ধারা বর্ষণ করে!—অতীতই স্মৃতির এই কার্য্যে একমাত্র পৃষ্ঠপোষক; ফলতঃ, অতীতের স্মৃতি বড়ই মধুর—অন্ততঃ রোগশয্যায় শায়িত ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিফলমনোরথ অবসাদ-প্রপীড়িত মানবের পক্ষে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত।—শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য চারি আনা।—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের 'নবজীবন' অবধি বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মেরও ক্রমোন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল উহা "নেড়া-নেড়ীর কীর্ত্তনে" পর্য্যবসিত হইয়াছিল; এখন শিক্ষিত বাঙ্গালী উহার যথেষ্ট আলোচনা করিয়া প্রেম-ভক্তির পবিত্র রস উপভোগ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের আলোচনার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া অপর সাধারণকেও সেই রসে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছেন। ধর্ম্ম ও সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ;—জাতীয় ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গসাহিত্যে আমরা এই তত্ত্বের সত্যতা দেখিতে পাই। স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের নিকট বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য অনেক পরিমাণে ঋণী, এবং "তত্ত্ববোধিনী" প্রবর্ত্তিত বঙ্গভাষা লইয়াই আমরা আজ পর্য্যন্ত জাতীয় সাহিত্যের অভ্যুদয়-কাল গণনা করিয়া থাকি। চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গেও বঙ্গ-

সাহিত্যের এক যুগান্তর ঘটিয়াছিল,—এমন কি, ঐ সময়ই বঙ্গভাষার সৃষ্টিকাল বলা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায়, জাতীয় সাহিত্যের হিসাবেও, বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ সহৃদয় সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই আলোচনার সামগ্রী। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থ সকলও বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল; অধুনা, স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত, ভক্তিনিধি শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত, চৈতন্যপ্রাণ শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ঘোষ, ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ সেই সকল গ্রন্থের উদ্ধার ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আলোচনা দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের বিলক্ষণ উপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে সকল মহাত্মারা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকলের রচয়িতা ও সাধারণতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা প্রচারক, তাঁহাদিগের পবিত্র জীবনী পাঠ করায় পুণ্য আছে; স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় চৈতন্যলীলামৃত ও লীলাশুক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা ঐরূপ পুণ্য সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের দেবদুর্ল্লভ চরিত্র ব্যাখ্যান করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছেন,—রস-লোলুপ পাঠক সেই দেব-চরিত্রের শেষাংশ দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থখানি ঐরূপ জীবনীর অন্যতম। ইহার সঙ্কলনকার শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় শিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে সুপরি-চিত। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি তাঁহার বৈষ্ণব-সাহিত্যাভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ইতিপূর্ব্বে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সম্প্রতি, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, ভক্তমাল, হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, চৈতন্যচরিত প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল মন্থন পূর্ব্বক শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামীর এই জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়াও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রাচীন কবি বা ধার্ম্মিক মহাত্মাগণের জীবনের ধারাবাহিক ঘটনা অবগত হওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। তবে, যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি বলে, তাঁহারা সংসারে চিরায়ুষ্মান্ রহিয়াছেন, চেষ্টা করিলে অনেক স্থলেই সেই কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনের যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। চৌধুরী মহাশয়ও শ্রীমৎ গোপালভট্টের জীবনীতে অকিঞ্চিৎকর ঘটনা-পরম্পরা সংযোজনের

প্রয়াস না পাইয়া গোস্বামীজীর প্রেমভক্তির অতুলনীয় মহিমা যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৈলঙ্গপ্রদেশান্তর্গত কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী শ্রীরঙ্গক্ষেত্রস্থ বলঙ্গুণ্ডী নামক গ্রামে ১৪২২ শকে গোপালভট্ট জন্মগ্রহণ করেন, এবং আনুমানিক ১৫০৯ কিম্বা ১৫১০ শকের শ্রাবণমাসীয় কৃষ্ণা পঞ্চমীতে বৃন্দাবন-ধামে শ্রীরাধারমণ জীউর সেবা করিতে করিতে তিনি মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতার নাম বেঙ্কটভট্ট এবং স্বনামখ্যাত বৈষ্ণবপ্রধান প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার পিতৃব্য। তাঁহার অনিন্দ্য গৌরকান্তি, সুদীর্ঘ নয়ন, পীন বক্ষঃ, সুবঙ্কিম গ্রীবা, সুললিত মুখচ্ছটা—সকলেরই চিত্তাকর্ষী। অসাধারণ প্রতিভাবলে "তিনি অভাবিত অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন," এবং পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিক্ষকতায় কালক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ হইয়া তৈলঙ্গদেশবাসী পণ্ডিতগণের মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন ও নানা বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদন করেন। এইরূপ দুই চারি কথার দ্বারা তাঁহার "প্রকৃষ্ট পরিচয়" হইতে পারে না। যে অমানুষী ঐশীশক্তিবলে তিনি বৈষ্ণবজগতে চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন, তাহার প্রভাব তাঁহার জীবনের পরতে পরতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রীড়াকুশল বালকের বাল্যখেলাতেই তাঁহার ভগবদ্ভক্তির নিদর্শন দেদীপ্যমান—"দেবতার পূজা এবং মহোৎসবাদিই সে খেলার অঙ্গ।" তাঁহার একাদশবর্ষমাত্র বয়ঃক্রমকালে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি; —"করুণার সূক্ষ্ম আকর্ষণে করুণাময় স্বয়ং উপস্থিত! সেই হইতেই বালকের বালকত্ব ঘুচিয়া গেল, তিনি নানা ভাবে বিভাবিত হইয়া পরমানন্দে চতুর্ম্মাস কাল গৌরাঙ্গ-সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন, এবং গৌরাঙ্গের স্থানান্তর গমনান্তে ভক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যা ও গৌরাঙ্গ-মহিমা-প্রচারই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ও মুখ্যধর্ম্ম হইয়া উঠিল।"

আলোচ্য গ্রন্থে চৌধুরী মহাশয় গোপালভট্টের ভক্তিময় জীবনের এই অঙ্কুরাবস্থা হইতে কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে পাঠকের সম্মুখীন করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণ গৌরাঙ্গের অভেদাত্মা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল, ভাব বিশুদ্ধ এবং উদ্দেশ্য সাধু। চৈতন্য ভক্তমাত্রই এই গ্রন্থ পাঠে মধুর রস উপভোগ করিতে পারিবেন এবং সাধারণতঃ সাহিত্য সেবীগণেরও ইহা বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম কর্তৃক বঙ্গসাহিত্যের

যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, মহাত্মা গোপালভট্টের জীবনীতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনী-লেখক সহৃদয় চৌধুরী মহাশয় এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর কথা লিখিয়াছেন—

"গোপালভট্টের বঙ্গভাষায় বিরচিত দুইটি পদ পাওয়া যায়। গোপাল-ভট্ট বাঙ্গালী নহেন। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বঙ্গভাষার প্রতি অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি ছিল, তখন একজন তৈলঙ্গী বিপ্র প্রেমের কোমল ভাষায় প্রেম-গীতি রচনা করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। গোস্বামীগণ কখনই বাঙ্গালা ভাষার অনাদর করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা আর বাঙ্গালীর আদর্শ পুরুষ শ্রীমহাপ্রভুই বৈষ্ণববৃন্দের প্রাণ।"

চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে একজন তৈলঙ্গী বিপ্র বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, আর অধুনা বাঙ্গালী বিপ্রগণ বাঙ্গালা নামটুকু পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয় দিতেছেন! কালধর্ম্মে সকলই সম্ভবে, তজ্জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। এখন সেই বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ কোমল প্রেম-গীতি একটী আমাদিগের পাঠকগণকে উপহার দিয়া এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার উপসংহার ও জীবনী-লেখক চৌধুরী মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি :—

"দেখ রে সখি! কঞ্জনয়ন কুঞ্জমে বিরাজ হে।
বামেতে কিশোরী গোরী, অলসে অঙ্গ অতি বিভোরি,
হেরি শ্যাম-বয়ন চন্দ মন্দ-মন্দ হাস হে॥
অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়, পুছত বাত অতি নিবিড়,
প্রেম-তরঙ্গে চমকি পড়ত, কঙল মধুপ সঙ্গ হে॥
সারী শুক পিকু করত গান, ভঙরা ভঙরী ধরত তান,
শুনি ধ্বনি উঠি বৈঠত, চোর চপল জাত হে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট-আশ, বৃন্দাবন-কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি, ভুলল মন আপ হে॥"
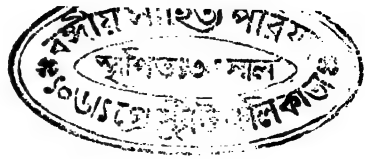
প্রার্থনা।

এস এ হৃদয়ে, নাথ,—ব'স আসি' ক্ষণকাল,
হেরি' ও পবিত্র পদ ছিন্ন করি মোহ-জাল।
আঁধার!—আঁধার শুধু!—চৌদিক আঁধারময়!—
নাশিয়া কলুষ-রাশি এস হৃদে দয়াময়।
কি যে এক মহা ভ্রান্তি আবরি'ছে দু'নয়ন,—
বিপথে লইয়া, বুঝি, নাশে সার ধর্ম্ম-ধন।
বুঝি না তোমার লীলা, অচিন্ত্য মহিমাময়,—
তব এ পবিত্র রাজ্যে কেন অমঙ্গল হয়?
মঙ্গল-নিদান তুমি,—কাঙ্গালের সার ধন,
লভিয়া তোমার দয়া কৃতার্থ অনাথ জন।
কত শত যোগী ঋষি আজীবন ধ্যান করি'
পায় না যে পাদ-পদ্ম, কেমনে তা' পা'ব হরি?
নির্ভরের বল নাই,—অসার দুর্ব্বল মন,—
যাতনা পীড়নে তাই জ্বলি, নাথ, অনুক্ষণ;
ভুলিয়া বিবেক-বাণী কুপথে সদাই ধাই—
কি করিব, দয়াময়?—কাতরে সুধাই তাই।
বিশ্বাসের বল, প্রভু, কর হৃদে বরিষণ,—
তব পদ-প্রান্তে যেন বদ্ধ সদা রহে মন।
নিমেষের তরে যেন ভুলি না ও পদযুগ,
ফেলিয়া বিপথ মাঝে ফিরা'ও না পুণ্য মুখ।
যখনি নির্ভর ছাড়ি' কুপথে ধাইবে মন,
ধরিয়া অভয় করে দেখাইও প্রেমানন।
চাহি মাত্র পদ-ছায়া,—অন্য ধনে নাহি কামী,—
হৃদে আসি' পদ-ছায়া বিতর জগত-স্বামী।

সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ ও সাহিত্য সাধনা।

আমাদিগের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে অনেক বিচার সমাবেশিত রহিয়াছে। কাব্যের সার উপাদান সঙ্কলনে অনেক সমালোচনা ব্যয়িত হইয়াছে। কাব্যের এই নিগূঢ় তত্ত্বজিজ্ঞাসা বহু পূর্ব্বেই আলঙ্কারিক-দিগের সুমার্জ্জিত মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইয়াছিল। বহুপূর্ব্বেই তাঁহারা গবেষণার সুকৌশলসম্পন্ন যন্ত্রযোগে কবিতায় প্রকৃত আত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বতোমুখী অনুসন্ধিৎসা বলে বহু পূর্ব্বেই তাঁহারা কবিত্ব উপকরণ সকল সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের সহিত তাঁহাদিগের পূর্ণ পরিচয় স্থাপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

কাব্যে আত্ম অভিব্যক্তি, সামাজিক অভিব্যক্তি, জাতীয় অভিব্যক্তি থাকিলেও তাহাদের অন্তরালে তাহাদের প্রাণ শক্তিরূপ যেন কি একটী শক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, তাহাকে ধরিতে না পারিলে কবিতায় প্রকৃত আত্মার পরিচয় পাওয়া যাইবে না, সুধু তাহার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদই করিতে হইবে।

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই কবিতার রাজ্য,—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভাবরাশির উপর তাহার সিংহাসন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন গগনমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভগবান্ সবিতা দেব আপনার সপ্তবর্ণময় রশ্মিজাল দ্বারা সমস্ত জগৎ সত্বকে উজ্জীবিত ও প্রকটিত করিতেছেন, সেইরূপ কবিতাদেবীরও বিভিন্ন প্রভাব দ্বারা বিভিন্ন ভাবরাশি উদ্বেলিত ও উদ্ভাসিত হইতেছে। অন্তস্তত্ত্বদর্শী পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই ভাবসমুদ্র মন্থন করিয়া নয়টী রত্ন কবিতাদেবীর প্রিয়তম উপহার স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারাই তাঁহার কণ্ঠভূষা প্রদান করিয়াছেন।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র প্রণেতা কাব্যের পরিচয়ে বলিতেছেন—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"—রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য। তাহা হইলেই রসকে এখানে বাক্যের এবং তদানুসঙ্গিক কাব্যেরও আত্মা বলা হইতেছে। কাব্যের এই সংজ্ঞা যে সমস্ত সাহিত্যকে ব্যাপ্ত করিতেছে, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না; এই লক্ষণকে মূল করিয়াই বিশ্বনাথ স্বগ্রন্থের নাম দিয়াছেন "সাহিত্য-দর্পণ।" এই স্থলে 'রস' কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে; 'রস'শব্দে সাধারণ মাধুর্য্যকে কখনই বুঝাইতেছে না;—কাব্যপাঠে যে মনের পূর্ণ সুখ ও পরিতৃপ্তি জন্মে,

তাহাই বুঝাইতেছে। ইংরাজীতে ইহাকে Enjoyment বলা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা কাব্যের একটী নিত্য লক্ষণ সুখভোগ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এই সুখকেও আবার সাধারণ সুখ হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হইবে। যাহাতে আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া তত্তৎকালের জন্য সত্তাকে কাব্যভাবে নিমজ্জিত করিয়া প্রাণমন বিমোহিত করিয়া রাখে, সেই সুখকেই এই সুখ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। হিন্দুর বেদান্তাদি দর্শনে মোক্ষের যেরূপ সুখাবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ তন্ময় সুখাবস্থাই বুঝিতে হইবে। জীবন্ত নিত্যভাবের প্রতিচ্ছায়া লইয়াই কাব্য রচিত হয়। যখন বহুদিন অদৃষ্ট বন্ধুর আলেখ্য দর্শনের ন্যায় আমাদের হৃদয়স্থ নিত্যভাব সেই কাব্যরূপ চিত্রপটে সেই মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে, তখন তাহার সেই মিত্রের স্মৃতিই যেন তাহার সমস্ত হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া তাহার প্রণয়-পীযূষ-পানে তাহাকে সম্মোহিত করিয়া রাখে। বহুদিন প্রবাসোচিত প্রাণপ্রিয় প্রণয়ীর আগমনে যেমন হৃদয়ে যুগপ্রলয় উপস্থিত হয়,—হৃদয় দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া যেমন একত্র মিশিয়া সমস্ত দূরত্বচ্ছেদ করিয়া শান্তি পাইতে চায়,—সেইরূপ কাব্যের ভাবে আত্ম অস্তিত্ব যখন বিলুপ্ত হয়, তখনই কাব্যের সঙ্গে প্রকৃত প্রীতি প্রমাণিত হইবে; সুতরাং উপভোগই কাব্যরূপ কাঞ্চনের কষ্টিপাথর। যে কাব্য যে পরিমাণে অধিক উপভুক্ত হইতে পারিবে, সে কাব্য সেই পরিমাণে অধিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বলিয়া গণনীয় হইবে। কাব্যের আদরও এই হিসাবেই হইয়া থাকে। কোন কোন কাব্য একবার বা দুইবার পড়িলেই আর তাহা হস্তে লইতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু কোন কোন কাব্য আবার প্রতিদিন পড়িলেও তাহার নূতনত্ব যায় না। বিশুদ্ধ দম্পতীপ্রেম যেমন চিরনিত্য নব নব সুখের নির্ম্মল উৎস খুলিয়া দেয়, বিশুদ্ধ কাব্যও সেইরূপ চিরনিত্য নব নব রসে মনকে মাতাইয়া তুলে। এই রসের অনুভব সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এতদুর উচ্চ মত পোষণ করিতেন যে, তাঁহারা ইহাকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সুখের সঙ্গে তুলনা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, ফলতঃ ইহাকে "অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আস্বাদ-সহোদর", "বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য রসরূপ ব্রহ্ম" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এক্ষণে কাব্যের উপাদানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা যাউক। পূর্ব্বমনীষিগণ কাব্যোপযোগী ভাব সকলকে সুক্ষ্মজ্ঞানবলে নয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—কাব্যরূপ নির্ঝর হইতে এই নব ধারাতেই রস ক্ষরিত হইতেছে। শৃঙ্গার (আদি) হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত—এই নয়টী নামেই

ইহারা অভিহিত হয়। রসরূপ নদীতে ইহারাই বীচিমালা, সুতরাং ইহারাই রসাত্মক কাব্যের সার উপাদান। এই রসগুলির নাম হইতেই সকলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, এবং যাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বিশেষরূপ জানেন, যে কাব্য শাস্ত্রের কোন ভাবই ইহাদিগের মুদ্রাঙ্কিত না হইয়া কোনরূপেই প্রচলিত হইতে পারে না। যত ভাবপরম্পরা কাব্যেতে লীলা-ক্রীড়া করিতেছে, উদিত প্রকটিত হইতেছে, সমস্তই ইহাদিগের কাহারও না কাহারও বংশধর।

পূর্ব্বেই একরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, রস ভাব সকলের সুখকর পরিণতি ও পরিতৃপ্তি। রসই কাব্যভাবের প্রকৃত স্পর্শমণি তুল্য;—কাব্যে কেবল রসহীনভাবের সমাবেশ হইলে কিছুই হইবে না,—তাহাতে সেই অন্তর্জ্যোতিঃ, সেই দিব্য লাবণ্য, অনুপ্রবিষ্ট না করিলে তাহা কেবল জড়দেহবৎ উপেক্ষার বিষয় হইবে। সুতরাং রস সঞ্চারেই প্রকৃত কবিত্বের পরিপুষ্টি। এই রসকে অবলম্বন করিয়াই ভাব ও ভাষা গজাইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রসতত্ত্ব সমস্ত ভাবের সমষ্টি তত্ত্ব; সুতরাং রসতত্ত্বে অধিকারী হইবার জন্য প্রথমতঃ ভাবতত্ত্বে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া চাই,—সমস্ত ভাবজগৎ জ্ঞাননেত্রে পাঠ করা চাই। আবার ভাবের সহিত ভাষার অভেদ্য সম্বন্ধ থাকাতে ভাবতত্ত্বে ভাষাতত্ত্বেরই মধ্য দিয়া আসিতে হয়। এইরূপে ভাবজীবনের পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়। তাহার দুইদিক্ আমাদের নিকট উন্মুক্ত হয়; বহির্দিক বা শরীরের দিক্ ভাষাতে, আর অন্তর্দিক বা আত্মার দিক্ রসেতে। রসরূপ আত্মা বাক্যরূপ শরীরে এইরূপে অধিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত কাব্যের উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু রসের সাধন বড় সহজ ব্যাপার নহে; রস সমস্ত ভাবের সার নিষ্কর্ষ,—সমস্ত ভাবের সার বিজ্ঞান দ্বারাই রসের স্বরূপাবধারণ করিতে হয়, সমস্ত ভাবের মূলতত্ত্ব দ্বারাই রসের উদ্ভেদ করিতে হয়, রসের নিকট হইতেই সমস্ত ভাবের মর্ম্মগাথা শুনিতে হয়। এইরূপে রস আয়ত্ত হইলেই কাব্যের প্রকৃত প্রাণের কথা জানা যাইবে, তখন তাহাকে বুঝিতে বা প্রকাশ করিতে আর কোন কষ্টই হইবে না। তখনই সেই সুমহান্ নিখিল কবিগুরুর অনন্ত কবিত্বশক্তি আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইবে। তখনই সেই ভাষার সঙ্গে সুর বাঁধা ভাব—ভাবের সঙ্গে সুরবাঁধা রসময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাব্য-ভাণ্ডার—আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। তাহা হইতে যে রত্ন বাছিয়া আনিতে পারিব, সেই অকৃত্রিম রত্ন; তাহার আলোকে জগৎ দীপ্ত হইবে,

তাহাই অমূল্য আদরের ধন হইবে, তাহা অক্ষয় অমর হইয়া চিরকাল জগৎ কাব্যভাণ্ডারের শোভাবৃদ্ধি করিতে থাকিবে, জগৎকে পুলকিত ও সুখী করিতে থাকিবে। এইরূপ ভাব-সাধক সকল প্রকৃতির মুখর শিশু; তাঁহাদের জিহ্বা হইতে কবিতা স্বতঃ উচ্ছ্বলিত হইয়া থাকে। এই জন্যই যোগমগ্ন ঋষিদিগের কণ্ঠভেদ করিয়া জগতের অতুল ধর্ম্মকাব্য বেদ উদ্গত হইয়াছিল, এইজন্যই সাধকপ্রকল্প রামপ্রসাদ সামান্য শিক্ষিত হইলেও অপূর্ব্ব ধর্ম্মসঙ্গীত গাইয়া গিয়াছেন,—এই জন্যই রামকৃষ্ণ পরমহংস নিরক্ষর হইলেও তাঁহার মুখ হইতে গভীর জ্ঞানপূর্ণ অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ নির্গলিত (নিঃসৃত) হইয়াছে। বাস্তবিক, সেই নিত্য ঐশ্বরিক সত্তাদ্বারা কাব্য অনুপ্রাণিত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব, তাহার প্রভাব, তাহার শোভা, কিছুই সম্ভবে না। ভগীরথ যেমন সুরধনীকে স্বর্গ হইতে অবতারিত করিয়া পৃথিবী পবিত্র করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বর্গীয় সুধাধারা কাব্যে প্রবাহিত করিতে না পারিলে কাব্য কখনই পবিত্র হইতে পারে না। এইজন্যই তত্ত্বদর্শী অতুল প্রতিভাসম্পন্ন পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণ কাব্যাদিকে সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, সাহিত্য দর্পণে—

"কাব্যালাপাশ্চ যেচান্যে গীতান্যাখিলানিচ।
শব্দমূর্ত্তিবরস্যেতে বিষ্ণোরংশ মহাত্মনঃ॥"

কাব্য গীত প্রভৃতি সকলই শব্দরূপ বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ। ইহা অপেক্ষা উন্নত প্রকৃষ্ট সুমার্জ্জিত চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত সাহিত্য সম্বন্ধে কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

এক্ষণে দেখিতে পাওয়া গেল যে, সহৃদয়তা যেমন কাব্যের আস্বাদে প্রয়োজনীয়, তাহার সৃষ্টিতে তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। আস্বাদনে নিষ্ক্রিয় বা ধারণাবতী সহৃদয়তা (Passive Sympathy), আর সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল সহৃদয়তা (Active Sympathy)—উভয়ের এই প্রভেদ। কাব্য উপভোগে সৌন্দর্য্যের আস্বাদ (Enjoyment of beauty), আর তাহার বিরচণে সৌন্দর্য্যের জ্ঞান (Sense of beauty)—কাব্যের প্রকাশ ও বিকাশে এই প্রভেদ। সংস্কৃতে এই উভয়েরই এক নাম 'রস' প্রদত্ত হইয়াছে;—সুতরাং সরল ভাষায় সৌন্দর্য্যতত্ত্বই (Principle of beauty) কাব্যের মূলতত্ত্ব, নিত্যতত্ত্ব। এই সৌন্দর্য্যকে ভাষা ও ভাবের সমাবেশে বিকশিত করিলেই তাহা প্রকৃত কাব্যের সৃষ্টি করিবে। এস্থলে বোধ হয় ইহাও বলা আবশ্যক যে, সৌন্দর্য্য অর্থে সাধারণ সুন্দরতা নহে—ভাবের প্রকৃতরূপের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়া;—এই অর্থেই ভবভূতির

শ্মশান-বর্ণনা বীভৎস হইয়াও সুন্দর—সেক্ষপীয়রের আয়োগো নরপিশাচ হইয়াও পাপচরিত্রের অতি সুষ্ঠু চিত্র। যেমন হস্তপদ মুখ প্রভৃতি সকল অঙ্গের সুসংযোজনে সম্মিলিত সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন ভাবের সুবিন্যাসে অতি চমৎকার সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন ভাষা ও ভাব একতানে বাঁধা হইবে, এক সূত্রে গাঁথা হইবে, তখনই কাব্যের পরাকাষ্ঠা হইবে। যখন ভাষা ভাবের প্রতিধ্বনি—ভাব সৌন্দর্য্যের প্রতিধ্বনি—হইবে, তখনই কাব্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইবে। এইরূপ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন সৌভাগ্যবানেরাই সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া আখ্যাত হন, তাঁহারাই সরস্বতীকে 'বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে' বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন।

এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কাব্যরূপ বৃক্ষের রস বা সৌন্দর্য্যই রসস্বরূপ, ভাব কাণ্ডস্বরূপ, ভাষা পুষ্পস্বরূপ, ও উপভোগই ফলস্বরূপ। রস হইতেই যেমন বৃক্ষের সারমজ্জা, পুষ্টি, কান্তি সকলই গঠিত হয়, রসই যেমন সর্ব্বত্র প্রাণশক্তি সঞ্চালিত করে,—যেখানে রস সঞ্চারিত হইতে পারে না সেই অঙ্গটীই যেমন শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়, সেইরূপ সৌন্দর্য্য বা রসই কাব্যের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া তাহার সার শোভা, স্বাস্থ্য সকলই সম্পাদন করে—তাহাকে প্রকৃত জীবন প্রদান করে—যে কাব্যে রসাভাব তাহা শীঘ্রই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব রসই কাব্যের প্রকৃত জীবনীশক্তি।

এ পর্য্যন্ত আমরা স্পষ্টরূপে পাশ্চাত্য মতের অবতারণ করিতে অবসর পাই নাই। ইতিপূর্ব্বে পাশ্চাত্য মতে জাতীয় অভিব্যক্তি, সামাজিক অভিব্যক্তি বা স্বকীয় অভিব্যক্তি প্রভৃতি সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত। এই সকল মতের একটু সম্প্রসারণ করিলেই আমাদিগের আলঙ্কারিক মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইতে পারে। ভাবাভিব্যক্তি বা রসোৎপাদনের পরিণামরূপে যদি তত্তৎ অভিব্যক্তি সকলকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর কোন গোলই থাকে না। অধিকতর আধুনিক সময়ে অনেকে সৌন্দর্য্যবাদের আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকট অনেকটা অস্ফুট রহিয়াছে। সম্প্রতি ইংরেজী সাহিত্য-সমাজের অন্যতম নেতা Dequincey সাহিত্যকে—অনুপ্রাণাত্মক সাহিত্য (Literature of power) ও জ্ঞানাত্মক সাহিত্য (Literature of knowledge)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই রূপ দেখাইয়াছেন,—তাহার দ্বিতীয় রূপে আমাদিগকে আলোকিত করে, প্রথম রূপে আমাদিগকে বিভোর করে। উল্লিখিত দ্বিতীয় রূপটীকে অনেকে প্রথমেরই

অন্তর্ভূত বা আনুসঙ্গিক মাত্র মনে করেন। এই প্রথম রূপটাকে যদি প্রাগুক্ত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সহিত গ্রথিত করা যায়, তবে পাশ্চাত্য মতকে সংস্কৃত মতে পরিণত করিতে আর কিছুই বাকী থাকে না। সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণতা অন্তর্নিবিষ্ট করিবার জন্য আমাদিগকে ভাবের অন্তস্তল নিরীক্ষণ করিতে হইবে,—সেই বিশ্ব-ভাবুকের প্রাণে প্রাণ মিশাইতে হইবে; এইরূপে বিশ্বশিল্পীর নিকট শিল্প সাধন করিলে আমাদের হৃদয়ে ভাবের পূর্ণোজ্জ্বল চিত্র উদ্ভাসিত হইবে। ইহাই আমাদিগের রস-সঞ্চার। এই চিত্রকে জগতের সমক্ষে ধারণ করিলে দ্বিতীয় প্রকৃতির ন্যায় তাহা জগৎকে মোহিত করিবেই করিবে—বিভোর করিবেই করিবে; ইহাই Dequincyর অনুপ্রাণতা—আমাদিগের রসাস্বাদ। সুতরাং এই-খানেই আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সূত্র ধরিতে পারিতেছি।

জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

(১)

এই জগতে কোন একটি পদার্থ লক্ষ্য করিবার পর যদি আমরা অপর সাধারণ বস্তু জাতের প্রতি নিরীক্ষণ করি, তবে আমাদের মনে যুগপৎ দুইটি ভাবের উদয় হইয়া থাকে; একটি সাদৃশ্যের, অপর বৈসাদৃশ্যের। আপাত-দৃষ্টিতে একটি পদার্থের সহিত কতকগুলির সাদৃশ্য ও তদ্ভিন্ন অপর পদার্থ নিচয়ের বৈষম্য পরিলক্ষিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান করিলে, যাহা উক্ত পদার্থের বিসদৃশ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও সেই পদার্থেরই গভীর সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে;—এই আবিষ্কারই বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য। দুইটি পদার্থের মধ্যে অতিশয় বৈষম্য লক্ষিত হইলেও, বৈজ্ঞানিক তন্মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য সংঘটন করিতে চেষ্টা করেন। যেমন ধরুন, হীরক ও কয়লা; আপাত-দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে কত প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে! কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ দুইটি সম্পূর্ণ অভেদ পদার্থ। এই সকল পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, কালে বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইলে জগতে পদার্থ নিচয়ের মধ্যে সর্ব্বত্রই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক। বৈজ্ঞানিকদিগের ইহাই স্থির বিশ্বাস যে, জগতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, সকলের মধ্যেই

একটি সাদৃশ্য অন্তর্নিহিত আছে বা থাকিবে। বর্ত্তমানে যে সর্ব্বত্র এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সাদৃশ্য দেখিতে পাই না, তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত। আবার আমরা কোন ঘটনারই কারণ ভাল করিয়া জানিতে চাহি না, পরন্তু অনেক ঘটনার কারণ আমরা "কাকতালীয়" ন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। তথাপি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য উপলব্ধি করাই মনুষ্যের প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্ম। কলিকাতার ময়দানে শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদিগকে কামান আওয়াজ করিতে দেখিয়া একটি পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে বলিতে শুনিয়াছি—"ঐ যে কামানের আওয়াজ হইতেছে, ঐগুলি ঠিক যেন ঘন ঘন মেঘের ডাকের মত,—আর ঐ যে সিপাই দাঁড়াইয়াছে, ঠিক বোধ হয় কে যেন পাঁচীল দিয়াছে।"

প্রকৃতি-বলে কত নূতন নূতন ঘটনা আমাদের ইন্দ্রিয় সমক্ষে প্রতিনিয়ত উপনীত হইতেছে,—কত অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অবলোকন করিতেছি, আবার পরক্ষণেই সেই সকল আমাদের নিকট পুরাতন বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? নূতন যাহা দেখি, তাহাই বড় মনোহর বলিয়া বোধ হয়; কুতূহল পরবশ হইয়া আমরা তাহাই পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। কেন না বিচিত্র অভিনব ঘটনাতে আমাদের মনোযোগ সহজেই আকৃষ্ট হয়। যে দৃশ্য আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ধারণা শক্তির বলে অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের অন্তঃকরণে অনেক দৃশ্য এবং ঘটনার একটি বিচিত্র তালিকা যেন লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপরে তর্কশক্তি দ্বারা বিচার ও সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা নূতন এবং পুরাতন দৃশ্য ও ঘটনাবলীর পরস্পর তুলনা করি, ও ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাও উপলব্ধি করি। ক্রমে বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি তাহার সহিত সম্প্রতি যাহা দেখিতেছি তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে; এবং তখনই সিদ্ধান্ত করিয়া বসি যে, আজ যাহা ঘটিল তৎসদৃশ কোন দৃশ্য বা ঘটনা অন্য এক দিন ঘটিবেই ঘটিবে। প্রবল ঝটিকা দ্বারা কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা দেখিয়াছি, সুতরাং ঝড়ের একটু উপক্রম দেখিলেই মনে আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। বৃষ্টির সময় মেঘান্তরাল হইতে সূর্য্যদেব একটু উঁকি মারিলে বিচিত্র রামধনুর সৃষ্টি হয়, দেখিয়াছি; বৃষ্টি হইলেই মনে হয়, যদি এখন ঐ মেঘখানি সরিয়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্যদেব কিরণ দিতে পারেন—আর তাহা হইলে আর একবার 'রামধনু'র শোভা দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। গ্রীষ্মান্তে

বর্ষা হয়, বর্ষে বর্ষে দেখিয়া আসিতেছি,—জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে যদি ছাতা ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ভয় হয়, বর্ষাকালে ভিজিয়া মরিতে হইবে। মরুতক দ্রাবকে (Nitric acid) তাম্রখণ্ড (Copper filings) ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মরুতবাষ্প সকল (Nitrous fumes) নির্গত হয়, তাহার দুর্গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে যে কতদূর কষ্ট হয় তাহা জানি,—আবার উক্ত কার্য্য করিতে হইলে যাহাতে ঐ বাষ্প নাকের নিকট আসিতে না পারে এই বিষয়ে সাবধান হই। মরুতকীয় রজত (Silver Nitrate) হাতে পড়িয়া গেলে কি অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছি,—এখন ভুলিয়াও আর মরুতকীয় রজত হাতে করি না, অতি প্রয়োজন হইলে চিমটা (Forceps) দিয়া তুলিয়া লই। এইরূপে অর্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, যাহা কোন বস্তু দ্বারা একবার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা তদ্ধর্ম্মী অন্য বস্তু দ্বারা পুনশ্চ সংঘটিত হইতে পারে। কতকগুলি কারণে যে ঘটনা একবার সংঘটন হইতে দেখিয়াছি, সেই কারণরাজির পুনঃ সমাগম দেখিলেই আমরা স্বভাবতঃ তদ্রূপ ঘটনার পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা অনুমান করিয়া থাকি। ইহা আমাদের সহজাত সংস্কার নহে, অভিজ্ঞতা মূলক জ্ঞান; জগতের ঘটনানিচয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই জ্ঞান জন্মে।

যে ভাবে অক্ষ-ক্রীড়ার দান পড়ে, কিম্বা যদ্দ্বারা ভাগ্যক্রীড়া (lottery) পরিচালিত হয়, যদি সেই ভাবে জগৎসংসার পরিচালিত হইত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক আলোচনার এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যত্ন, চেষ্টা এবং পরিশ্রম সকলই ব্যর্থ হইত। কবিবর মিল্টন অগাধ তমোরাশি (Chaos) কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, অনেকেরই বিদিত। সেখানে অসীম অনন্ত অণু এবং পরমাণুর সমুদ্র কিরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিত আছে, তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় রাশি রাশি অণু পরমাণু যেন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ দলপতির আধিপত্য স্থাপনের জন্য ভয়ঙ্কর গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে;—যেন এই গোলযোগের আদিও নাই অন্তও নাই!—

"———A dark
Illimitable ocean, without bound,
Without dimension, where length, breadth, and height,
And time, and place, are lost, where eldest Night
And Chaos, ancestors of Nature, hold
Eternal anarchy, amidst the noise
Of endless wars, and by confusion stand.

For Hot, Cold, Moist and Dry, four Champions fierce
Strive here for mastery, and to battle bring
Their embryon atoms ; they around the flag
Of each his faction, in their several clans,
Light - armed or heavy, sharp, smooth, swift, or slow,
Swarm populous, * * * * * "

এইরূপ অনন্ত কোলাহল কি আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? আমরা সংসার মধ্যে একটি সামান্য গণ্ডগোল ঘটিলে কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়া যাই, কোন জনতার মধ্যে যদি একটি সঙ্গী হারাইয়া গেল তাহাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা কত কাতর ও হতাশ হইয়া পড়ি। আবার হয়ত এইরূপ স্থলে কখন কখন অল্পায়াসেই সফল মনোরথ হইয়া থাকি। একই কার্য্য করিতে গিয়া একবার আমাদিগকে এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইল, পুনর্ব্বার করিবার সময় সেই কার্য্যই অল্পায়াসে সাধিত হইল, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান-শক্তির অনায়ত্ত একমাত্র 'ভাগ্য'ই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। এখন মনে করুন, আমাদের এই পৃথিবী কিম্বা এই সচরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দ্বারা পরিচালিত কিম্বা কোন "অনন্ত ভাগ্য-ক্রীড়া" * দ্বারা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সদৃশ ঘটনার যে সদৃশ ফললাভ হইবে এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখাইতে পারা যাইত না। পৃথিবীর এইরূপ অবস্থায় দুইটী ঘটনার সৌসাদৃশ্য একটা আকস্মিক ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত, এবং যাহা আজ ঘটিল ভবিষ্যতে তাদৃশ ঘটনা পুনশ্চ ঘটিবে বলিয়া আমরা কদাপি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। ফলতঃ, 'গ্রাবু' খেলার 'রঙ্' পরিবর্ত্তনের মত, আমরা কেবল ঘটনাপরম্পরার আবির্ভাব ও তিরোধান দেখিয়া যাইতাম, উহার মধ্যে কোন-রূপ শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতাম না। বলা বাহুল্য, 'গ্রাবু'-খেলায় 'রঙ্' চারিটী মাত্র, কিন্তু জগৎ সংসারের ঘটনারাজি অসংখ্য অনন্ত। এরূপ অবস্থায় একটি ঘটনা ঘটিলে তাহার পূর্ব্বে কি ঘটিয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত না, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহাও বলা অসম্ভব হইত। তাদৃশ অবস্থায় আমাদিগের পূর্ব্ব-দৃষ্ট সদৃশ ঘটনার একটা অস্ফুট স্মৃতি ব্যতীত অপর কোন জ্ঞানই জন্মিত না; পরন্তু, আমাদের বিচার শক্তি, বোধ হয়, লোপ পাইত,—ভবিষ্যতে কি

* "Infinite Lottery"—*Condorcet.*

হইবে, ভূত এবং বর্ত্তমানের লক্ষণ দৃষ্টে বিচার-শক্তি দ্বারা তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারিতাম না।

সুখের বিষয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকস্মিকতা (Chance) দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রযুক্তই আমরা অনেক সময়ে ঘটনা নিচয়ের কারণ "দৈব" বা "অদৃষ্ট" বলিয়া নির্দ্দেশ করি, যে নিয়মাবলী দ্বারা সংসারের ঘটনাসমূহ ঘটিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। "অমুকের কেন এই চাকুরীটা হইল না, অমুকের কেন হইল, ইহার অপেক্ষা উহার বিদ্যাবুদ্ধি ত যথেষ্ট অধিক" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমরা আজকাল "ভাগ্য" "দৈব" "অদৃষ্ট" প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তদধিক কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ অক্ষমতার কারণ বোধ হয় এই যে, সংসারের সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। শুনিয়াছি, আমাদের ফলিত জ্যোতিষ এবং যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেহ কেহ এই সকল সমস্যারও মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন। তবে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতি অল্প এবং ঐ সকল শাস্ত্রও অতীব দুর্জ্ঞেয়, সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে একরূপ অনধিগম্য। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ অজ্ঞতাকেও অনেকে "অদৃষ্ট"-মূলক বা "দৈব" বলিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল বিষয়ে একাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অস্ফুটতা মাত্র নির্দ্দেশ করেন। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। মরীচিকা যে কি তাহা আজকাল অনেকেই জানেন। কিন্তু কত অজ্ঞ লোক এখন পর্য্যন্ত জলভ্রমে উহার প্রতি ধাবিত হইয়া মারা পড়িতেছে! বহুদিন ইহার কারণ জগতে অবিদিত ছিল; অবশেষে আফ্রিকা দেশের মরুভূমে মরীচিকা দেখিয়া ফরাসি দেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা ইহার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহা আতপক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগের পথ ভুলাইবার জন্য মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহা উত্তাপরশ্মি সকলের গাঢ় বায়ুস্তর (Dense medium) হইতে তদপেক্ষা তরল বায়ুস্তরে (Rarer medium) গমন কালে যে বিক্ষারণ (Refraction) ঘটে তদ্দ্বারা উৎপন্ন; এবং তাহাতেই যে লোকে এরূপ একটি অলীক দৃশ্য শূন্যমার্গে কিম্বা ভূতলে দেখিয়া থাকে, ইহা বর্ত্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ "আলেয়া" সম্বন্ধেও জন সাধারণের একটা ভ্রান্ত সংস্কার ছিল। কে বলিতে পারে যে, ভূতাদি মহাশয়গণ আমাদের কল্পনায় যে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া আছেন, তাহাও কোনদিন বিজ্ঞানের দ্বারা একেবারে চূর্ণীকৃত

হইবে না? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের জ্ঞান অনেক বিষয়ে নিতান্ত অল্প বলিয়া আমরা তত্তদ্বিষয়ের যথোচিত কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু সকল ঘটনাই জগদ্ব্যাপী কারণ সমূহের মধ্যে কোন কারণের যে অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা স্থির। এই জড়জগতে যৌগিক পদার্থ সমূহ (Compound Substances) নির্দ্দিষ্ট অণুনিচয়ের এবং শক্তি সমূহের সংযোগে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। মৌলিক পদার্থ সকল (Elements) * চিরকাল মৌলিক ভাবেই থাকে; অম্লজনক বাষ্প (Hydrogen gas) কখন দাহক বাষ্পে (Oxygen gas) পরিণত হয় না; লৌহ কখন স্বর্ণ হয় না। † একটি পদার্থের যে চিরকাল একই রূপ গুণ থাকে, বিশেষ ধীরভাবে দেখিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের পৃথিবী অসংখ্য উপাদানে গঠিত। তন্মধ্যে কোন একটি উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, উহা ভিন্ন ভিন্ন অণু-পরমাণুর একটি রাসায়ণিক সমষ্টি মাত্র। এইরূপ বিশ্লেষণে আমাদের পদে পদে ভুল হইয়া থাকে, কারণ আমাদের জ্ঞান অতীব সঙ্কীর্ণ। পৃথিবীতে যে যে উপাদান আছে তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা আমরা কখনও করিয়া উঠিতে পারিব না; জ্ঞান ও আলোচনা বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইবে এবং তন্নিহিত অণু পরমাণুর বিশ্লেষণে, হয় ত, পূর্ব্বকৃত মীমাংসার মধ্যে অনেক ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে, সুতরাং পূর্ব্ব নিরূপিত তালিকা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, দুইটি পদার্থ বাহ্যতঃ প্রায় একরূপ এবং তাহাদের গুণও প্রায় একই জাতীয়, কিন্তু পরে তাহাদের মধ্যে এমন গুহ্য বিভিন্নতা প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্ব্বে কেহ তাহা অনুভবই করিতে পারেন নাই। পৃথিবীতে কত অনন্তরূপী পদার্থ—কত অনন্তরূপিনী শক্তি—আছে, তাহা আলোচনা করিতে গিয়া ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, ভ্রান্ত মনুষ্য যে পদে পদে 'দিশাহারা' হইয়া পড়িবে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

---

* রসায়ণ শাস্ত্রের উন্নতির সহিত অনেক মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং আমরা যে যে পদার্থকে বর্ত্তমানে মৌলিক বলিয়া জানি, তাহাতে অন্য পদার্থ মিশ্রিত আছে কিনা ঠিক বলা যায় না। যে পদার্থ মধ্যে অন্য কোন পদার্থ নাই কিম্বা বাহির হইবে না বলিয়া অবিসংবাদী ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইরূপ পদার্থকে আমরা এস্থলে মৌলিক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

† আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্পর্শমণির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। উহা যতদিন তাহাদের হস্তগত না হয়, ততদিন কেনই বা স্বীকার করিবেন?

তথাপি বিজ্ঞানে অবিশ্বাস করা সঙ্গত নহে; বরং যতদূর পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করাই উচিত। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অনেক ঘটনাবলির প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সাধারণ "নূতন পঞ্জিকা" ইহার প্রধান উদাহরণ স্থল। বর্ষারম্ভের বহুদিন পূর্ব্বে "নূতন পঞ্জিকা" প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে যে সমস্ত তত্ত্ব লিখিত থাকে তাহা প্রায়ই অবিকল মিলিয়া যায়। কোন্ দিন কখন্ চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হইবে, কখনই বা উহাদের উদয়াস্ত ঘটিবে, কখন্ গঙ্গায় জোয়ার ভাটা খেলিবে—সকলই প্রায় "কাঁটায় কাঁটায়" মিলিয়া থাকে। এস্থলে বিজ্ঞানের এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। ফলতঃ যতই মানবের বিজ্ঞতা বাড়িবে, ততই গবেষণা ও অনুসন্ধান-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভুল-ভ্রান্তি হ্রাস পাইতে থাকিবে। এইরূপে এই পৃথিবীর অতীত অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদি কি কি উপাদানে গঠিত তাহা নিরূপণ করিবার জন্য যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ও তদ্দ্বারা এই পৃথিবীর অন্তর্গত অনেক উপাদান,—এমন কি, মানব-দেহের অঙ্গীভূত অনেক মৌলিক পদার্থ—ঐ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদিতে বিদ্যমান থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরন্ত, আমাদের পৃথিবী যে যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, সেই শক্তি সমূহই যে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিচালক ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঘটনা নিচয়ের মধ্যে সাদৃশ্য উপলব্ধি করা মনুষ্য-বুদ্ধির যেন একটি বিশেষ ধর্ম্ম। পরন্ত, সেই সমস্ত ঘটনার সম্যক্ আলোচনা ভিন্ন তদ্বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জন্মে না। এইরূপ আলোচনা করিতে গেলে "ঘটনা নিচয়ের কারণ কি?"—এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়, এবং তাহার মীমাংসার নিমিত্ত একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, জড় জগতের সমস্ত ঘটনাই "পদার্থ" (Matter) ও "শক্তির" (Force, Energy) সংযোগে সংঘটিত। ফলতঃ, জড় বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ই এই দুইটি। যেদিকে দৃষ্টিপাত করুন, প্রত্যেকঘটনার মূলে এই "শক্তি" ও "পদার্থে"র সংযোগ দেখিতে পাইবেন। আকাশে মেঘ উড্ডীন হইতেছে,—বায়ু প্রবল্ বেগে বহিতেছে, গ্রহ নক্ষত্রাদি ছুটাছুটি করিতেছে, স্রোতস্বিনী নদী নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে দৌড়িতেছে। কোথাও মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদ হইতেছে, মেঘের কোলে সৌদামিনী ঝলসিতেছে। আবার সেই বিশ্ববিমোহিনী সৌদামিনী কর্ত্তৃকই ঘোর দুর্দৈব সংঘটিত হইতেছে।

পরক্ষণেই বৃষ্টি প্রায় থামিল, মেঘের আড়াল হইতে সূর্য্য কিঞ্চিৎ বাহির হইল, অমনি কোথা হইতে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত একটা প্রকাণ্ড ধনু নয়নগোচর হইল। দেখিতে পাই, জলের উপর তৈলবিন্দু-সম্পাতে কত নয়নরঞ্জন বিচিত্র বর্ণ যেন বৃত্তাকারে * ছড়াইয়া পড়ে। শুনিতে পাই, বালুকাময় মরুভূমে মার্ত্তণ্ডদেবের প্রখর কিরণে সুদূরস্থ পাদপ শ্রেণী ভূমধ্যে নিম্নশীর্ষে ঝুলিয়া যেন অদৃশ্য কোন বিরাট দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে! এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা সহসা ইহার কারণ বুঝিতে না পারি, কিন্তু জড় বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, এই সকল আপাত-অজ্ঞেয় ঘটনানিচয় কেবল মাত্র "পদার্থ" ও "শক্তির" সংযোগেই সংঘটিত হয়। বিজ্ঞান বলে মনুষ্য যে কত আশ্চর্য্য যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়াছে, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে, তাহা-দেরও মূলে সেই 'পদার্থ' ও 'শক্তি' বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, জড় জগতে যে কোন ঘটনা হয় কিম্বা হইবে, তৎসমস্তই কেবল "পদার্থ" ও "শক্তি"র অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহাই বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব।
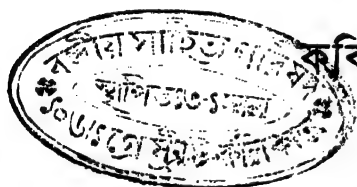
কবিতা-কুঞ্জ।

(১)

বিদায়।

'বিদায়' 'বিদায়' ক'রে কাতর কোরো না মোরে—
শুন সখি এ মিনতি মোর;
'বিদায়' নিঠুর বাণী সহসা হৃদয়ে হানি'
বা'র কর কেন আঁখি-লোর?
স্নেহের সামগ্রী যা'রা সদা নিকটেতে তা'রা
শত ক্রোশ ব্যবধানে থেকে;—
চ'খের আড়াল যত মনেতে উদয় তত,
চিন্তায় ভরিয়া চিত্ত রাখে।

* Newton's Rings.

আশায় বাঁচিয়া র'ব আবার দর্শন পা'ব
স্নেহমাখা তব মুখখানি ;—
'বিদায়' শেষের কথা, নিরাশার মর্ম্মব্যথা
কভু আর বোলো না সজনি।

---

(২)

ভালবাসা তোমার আমার।

নীলকণ্ঠ কণ্ঠস্থিত গরল মন্থনোত্থিত
জীয়ন্তে মরণ ব্যথা নিত্য দুর্নিবার!
সাহারার মাঝখানে আকুল পিপাসা প্রাণে
বাণবিদ্ধ মৃগী মত ছুটাছুটি সার!
ভালবাসা তোমার আমার!

রাবণের দগ্ধ চুলী আজন্ম জ্বলিবে খালি,
একটু একটু করি', করি' ভস্মসার!
সংক্ষুব্ধ তরঙ্গ হায় আছাড়ে শৈলের গায়
ফিরে আসে মনোখেদে হ'য়ে চুরমার!
ভালবাসা তোমার আমার!

বৈশাখে সাঁঝের বেলা মেঘের দারুণ খেলা,
নাহি কোথা বারিবিন্দু, শুধু হাহাকার!
নিস্ফল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে
শুধু দেখা অন্ধকার অকূল অপার!
ভালবাসা তোমার আমার!

হৃদয়ে দারুণ শূল, নাই মাথা, নাই মূল,
টানিতে কলিজা ছিঁড়ে, যন্ত্রণা অপার!
অপূর্ণ বাসনা যত, চুম্ব আলিঙ্গন কত
কত অশ্রু নিশ্বাসের শ্মশান-সৎকার!
ভালবাসা তোমার আমার!

---

(৩)

ডাকে বঁধুয়া।

আজিকে অন্তিম সাঁজে বিপাসার কূলে
বহিল মলয়ানিল শিশির প্রপাতে,
ফুটিল তারকারাজি জ্যোছনা-মুকুলে,—
খেলিছে লহরী মালা রজতের পাতে।
ফুটিল নিদাঘানিলে দু'চারিটি ফুল,
মুইল কমল পুষ্প—আঁখি ভরা ঘুম—
ছুটিল সুরভি-কণা, হরষে বিভুল,
গড়িতে আকাশ পথে চন্দ্রিকা কুস্কুম।
সুদূরে-সোনার চাঁদ সুশান্ত মুরতি—
সুপ্তোত্থিত ঘুম ঘোরে আধ অচেতন—
কূলে কূলে ঢালিতেছে সুবর্ণের ভাতি,
সিন্ধু-বক্ষে করিতেছে সাদর চুম্বন!
একটু আড়ালে, বুঝি, একখানি শাখে
ঘুমাইয়া রহিয়াছে একটি কুসুম;
সারাদিন চেয়ে ছিল নির্নিমেষ আঁখে,—
তাই ক্লান্ত চোখে তার স্বপ্নময় ঘুম।
একটি বকুল গাছ আছিল আঁধারে,
উপরে ঘুমা'য়ে তার একটি পাপিয়া
ভাসাইয়া শ্যামতনু নীহারের ধারে,—
সেইখানে 'রাধা রাধা' ডাকে বঁধুয়া।

ফুল।

বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রের একজন মহারথী, স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, সংসারের রমণীগণকে তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে এক স্থানে পদ্মফুলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় সে তুলনাটা কেবল তোষামোদ—কতকটা

বেয়াদবীও বটে। স্ত্রীলোক হাজার কুৎসিত হইলেও, এমন কি বায়সী বা কৃষ্ণ পেচকী হইলেও সুন্দরী পদবাচ্য তাহা জানি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারে পদ্মফুল কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? যাঁহারা আবার রূপে গুণে পদ্মফুল, কুল-মর্য্যাদায় তাঁহাদিগের সকলের সহিত পদ্মের তুলনা বেজায় বেয়াদবী নহে কি? পচা পুকুরের পাঁকে পদ্ম ফুটে সত্য বটে, কিন্তু সংসারের সকল রমণী-পদ্মই ত পঙ্কোৎপন্ন নহে—কুলে শীলে, ধনে মানে উজ্জ্বল বড় বড় ঘরেও অনেক পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি এক একটা ঘর কেবল পদ্মেরই জন্মস্থান, অন্য ফুল তথায় কদাচ ফুটে, যদি স্ত্রীজাতিকে ফুলেরই সহিত তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল গোলাপ বা পদ্ম একটা ফুলের সহিত তুলনা খাটে না—রূপ, গুণ, বর্ণ, গঠন, স্বভাব ইত্যাদিতে বৈচিত্র্য অনুসারে সমস্ত ফুলবাগানটারই সহিত তুলনা খাটিতে পারে। প্রবীণ কমলাকান্ত শর্ম্মা কিন্তু অহিফেণের ঝোঁকে এক দিন সমস্ত রমণীগণকে মাছের সহিত তুলনা করিয়া পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

হরি! হরি! বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখি, বিদেশীয় বিলাতী ফুলে বাগান ভরিয়া গিয়াছে—যেখানে যুঁই, মল্লিকা, চামেলী প্রভৃতি দেশীয় ফুল ফুটিলে কতই সুন্দর হইত সেখানে লাটিন ভাষায় কথিত কতকগুলি উৎকট বিকট নামধারী ফুল আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। সাহেবী চক্ষে সেগুলি ভাল ফুল হইতে পারে এবং সাহেবী মেজাজবিশিষ্ট দেশীয় মহাপুরুষেরাও তাহাদিগের মর্ম্ম বুঝিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমি ত একটু বর্ণের চাকৃচিক্য ব্যতি-রেকে আর কিছুই দেখিতে পাই না। এ সকল ফুল দেবসেবায় লাগে না, আঘ্রাণেরও উপযুক্ত নহে। কোনটা নির্গন্ধ, কোনটা দুর্গন্ধ—নাসিকার নিকট-বর্ত্তী হইলেই বমি। এ সকল ফুল কেবল বাগান সাজান—তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া টেবিলের উপরে রাখ, কিন্তু কখনও আঘ্রাণ লইও না। কোন ফুলটার বা অতি সামান্য একটু গন্ধ আছে সহজে নাসিকায় প্রবেশ করে না, গন্ধ লইবার যদি চশমা থাকিত তাহা হইলে তৎসাহায্যে কিঞ্চিৎ গন্ধ পাইলেও পাওয়া যাইতে পারিত। সে গন্ধ কিন্তু দেশীয় নাসিকায় মিষ্ট লাগে না; ফুলের পক্ষে সে গন্ধ আদৌ উপযুক্ত নহে—মদের বা চাটনীর গন্ধ তদ্রূপ হইলে এক দিন চলিলেও চলিতে পারে। তবে এ ফুলগুলির আছে কি? বলিয়াছি, একটু বর্ণ বৈচিত্র্য আছে—এ জাতীয় রমণীগণের বেশ ভূষাটা বিলাসবতীর উপযুক্ত বটে, তদ্দ্বারা কোন উপকার সাধিত না হইলেও লোককে দেখাইতে নিতান্ত মন্দ

নহে। এ ফুলের আর আছে—নানা হাঙ্গামা, নানা উৎপাত। অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক অর্থব্যয়ে এ ফুল বাগানে রাখিতে হয়; নহিলে বিলাতী ফুল দেশীয় বাগানে টিকিবে কেন? এ ফুলের 'পাট' করিতে করিতে মালিকের প্রাণান্ত, 'সার' যোগাইতে মাথার ঘাম পায়ে পতিত, তাহার উপর আবার উৎকট চিন্তা—এত সাধের গাছটা পাছে শুকাইয়া যায়, বা ছাগলে খায় বা পোকা পতঙ্গে নষ্ট করে। এ ফুল বাগানের কোন উপকারে না আসিলেও, ইহাকে বাগানে স্থান দিয়া মালিকের সুখও নাই, স্বস্তিও নাই। যদি বল, তবে এমন ফুল বাগানে আনা কেন? তাহার উত্তর এই যে, এ ফুল সাহেবেরা পছন্দ করেন এবং প্রতিবাসীর বাগানে যত্নে রোপিত হইয়াছে; এমত অবস্থায় আমার বাগানে এ ফুল না থাকিলে তোমার কাছে 'কলিকা' পাইব কেন?

বিলাতী ফুলের পরেই গোলাপ। গোলাপসুন্দরী ছিলেন বিদেশিনী, তবে বহুকাল এ দেশে থাকিয়া এখন স্বদেশিনীই হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার গায়ে এখনও একটু যাবনিক গন্ধ আছে। যাহা হউক, সাহেবেরা সে টুকুর আদর করেন বলিয়া সাহেবী-মেজাজ-বিশিষ্ট দেশীয় মহাত্মাদিগের নিকটেও গোলাপের বিলক্ষণ পশার হইয়াছে। গোলাপ দেবসেবাতে লাগে, সুগন্ধের জন্য তোড়াতেও তাহার স্থান অতি উচ্চ; কিন্তু হয় না কেবল মালা গাঁথিয়া গলায় পরা। সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদিগের ভাবটা কেমন যেন একটু আড়-আড় ছাড়-ছাড় গোছের। রূপে গুণে গোলাপের বিলক্ষণ আদর—শুকাইলেও তাহার আদর কমে না। গোলাপ গন্ধ মসলায় লাগে, ঔষধে লাগে, তাহাতে গুলকন্দ হয়, আর আতর গোলাপ জলের জন্য ত জগদ্বিখ্যাত। গোলাপ, কলি, ফুটন্ত, শুষ্ক সকল অবস্থাতেই সুগন্ধ বিতরণে মুক্তহস্ত; রূপের চটকও সামান্য নহে—বাগান আলো করিয়া ফুটিয়া থাকে, এক বৃন্তে ফুটেও অনেকগুলি। তাহার দোষের মধ্যে এই যে, গাছে বড় কাঁটা, ফুল তুলিতে গায়ে আঁচড় লাগে, হাতে কাঁটা ফুটে। বর্ণটা বড় চটকদার, কেমন বেহায়া রকমের, যেন অবলা সরলা কুলবালার যোগ্য নয়—বোধ হয় রূপ গুণের গর্ব্বটা সামান্য নয় এবং মেজাজটাও একটু চড়া চড়া। অধুনা গোলাপ আখ্যাযুক্ত শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণের তজ্জাতীয় ফুল আমাদের বাগানে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগকে আমরা এখনও ভাল চিনি না। যাঁহার হরিদ্রাবর্ণ, তাঁহার আকার বেশ বড় বটে, রূপের চটকও সামান্য নয়; কিন্তু কেবলই পিত্তলের কাটারী—রূপ যেমন গুণ তেমন নয়। যাঁহার বর্ণ শুভ্র, তাঁহার গড়ন পিটনে একটু লালিত্য নাই, গন্ধটাও কেমন অম্ল

গন্ধ। এ সকল সাহেব-পছন্দ ফুল—আমরা ইহার মর্ম্ম বড় বুঝি না; তথাপি বাগানে স্থান দেওয়া একটা মহা ভুল।

বেল, মল্লিকা, যুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি বিমল শুভ্র পরিমল-বাহী দেশী ফুল এখনও বাগানে বিস্তর আছে; কিন্তু কেমন যেন অযত্নে পালিত অনাদৃত, থাকে-থাকে যায়-যায় ভাবে সম্বর্দ্ধিত। বাগানের কোনে সঙ্কীর্ণভাবে জড় সড় হইয়া ফুটিতেছে, 'যেন কত অপরাধী' ভাবে স্থান অধিকার করিয়া আছে—গর্ব্ব নাই, অহঙ্কার নাই, 'বিনয়াবনত' ভাবে যেন অশুচি অঙ্গে গঙ্গা জল, ফুল, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য, ধুপ, দীপ বাহিনী দেবমন্দিরে পূজার্থগামিনী স্নাত পট্টাম্বরধারিণী পবিত্র ভামিনীদিগকে পথের পার্শ্বে জড় সড় ভাবে দণ্ডায়মানা হইয়া পথ দিতেছে। দেবপূজা এক প্রকার দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে; সুতরাং এ সকল ফুল আর পূজায় লাগে না। দানবপূজা দেশে বিলক্ষণ আছে সত্য; কিন্তু বিলাতী ফুলেই তাহা সম্পন্ন হয়; তাহার জন্য যুঁই মল্লিকা আবশ্যক হয় না। হীন, দরিদ্র, স্বধর্ম্মনিরত যে জনকয়েক ব্যক্তি এখনও দেশে আছে, তাহারাই দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে, তাহাদিগের জন্যই দেশী ফুল কয়েকটা এখনও ফুটে। নতুবা অন্যে ইহাদিগের আদর করে না, মর্ম্মও বুঝে না। এ সকল ফুলের পরিমল এখনকার নাসিকায় আর ভাল লাগে না, ইহাদিগের পবিত্র শুভ্র বর্ণও চক্ষে ভাল দেখায় না। যাহার বাহ্য চাকচিক্য নাই, বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয়তার দিনে তাহার আবার আদর কেন? সমস্ত ফুলের মধ্যে শুভ্র ফুলেরই প্রাচীন কালে অধিক আদর ছিল, পূজাতে অধিক পরিমাণে শুভ্র ফুলই ব্যবহৃত হইত এবং শুভ্র ফুলই অধিক পবিমল বিশিষ্ট।* কিন্তু এখন আর লোকে বড় পরিমল চাহে না, পূজাও করে না; সুতরাং অমল ধবল ফুল বাগানে বড় অধিক যত্ন পায় না। বেল, মল্লিকা, যুঁই, কুন্দ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল গুলি ফুলের মধ্যে সতী সাধ্বী পতিব্রতা কুলবধু, সকলেই ফুটন্ত অবস্থায় রসবতী গুণবতী; তবে কেহ একটু তরল চপল, কেহ একটু ভারি গম্ভীর। যে গুলি ভারি গম্ভীর, সে গুলি গৃহের গৃহিণী, পুত্র কন্যার জননী; আর হাল্কা পাত্লা গুলি নবীনা, নবীন যৌবন তরঙ্গে কলকলায়মানা, হাস-পরিহাসে তাহারা কিছু অগ্রসর, হেলিয়া দুলিয়া বাতাসের সহিত ক্রীড়া করে, পত্রমধ্যে মুখ ঢাকিয়া মধুমক্ষিকার সহিত রহস্য করে। যুঁই প্রভৃতি কোন কোন ফুল একটু অধীরা,

* শরীর ও মনের পক্ষে বিশেষ উপকারী অজোন (Ozone) নামক পদার্থ শুভ্র ফুলেই অধিক থাকে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেলা থাকিতে থাকিতেই ফুটিয়া বসিয়া থাকে—গন্ধরাজ প্রভৃতি কোন কোন ফুল অধিক ধীরা, রজনী গভীরা না হইলে তাহারা মুখের সমস্ত ঘোমটা খুলে না। আবার যাহারা অধিক অধীরা তাহারাই শীঘ্র ঝরিয়া পড়ে; যাহারা ধীরা, বয়স হইলেও তাহারা যেন যৌবনসম্পন্না থাকে। এ সকল ফুলের সাধারণতঃ বৃন্ত বড় দীর্ঘ নহে, ইহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে না, আপনার গৌরবে আপনি নতশির। সুতরাং এ সকল ফুলে ভাল—বা কোনটায় আদৌ—তোড়া প্রস্তুত হয় না,—হয় কেবল সাজি ভরা, আর মালা গাঁথিয়া গলায় পরা। কাহারও গ্রন্থনে আবার সূতারও প্রয়োজন হয় না, বিনা সূতাতেই মালা গাঁথা চলে। বৃন্তচ্যুত হইলে এ সকল ফুলে আর পদার্থ থাকে না, সজীবতা থাকে না, গন্ধ থাকে না, মধু থাকে না, তাহার নিকটে ভ্রমরও আনাগোনা করে না; তখন তাহাদিগের থাকে কেবল নির্ধন সম্ভ্রান্ত কুলের পূর্ব্ব মর্য্যাদার ছায়া।

বক, টগর, শ্বেত করবী প্রভৃতি ফুলগুলি হিন্দুর ঘরের বিধবা রমণী—রূপের ছটা, পরিমলের ঘটা, কিছুই নাই; আছে কেবল পবিত্রতা, সুতরাং কেবলই দেবদেবীর পূজায় লাগে, অন্য কোন কাজে লাগে না, কেহ তাহাদিগের তোড়াও বাঁধে না, মালাও গাঁথে না। তাই কি ছাই সকল দেবতার পূজায় লাগে? বাছা বাছা দেবতার পূজায় বাছা বাছা ফুলের প্রয়োজন—যাহাদিগের পরিমল নাই, তাহারা কেন সকল দেবতারই পূজায় লাগিবে? ধুতুরা ফুলে মহাদেবের পূজা হয়—যেমন নাগা সন্ন্যাসী দেবতা, তেমনই উদাসিনী ফুল! ঘেঁটু ফুলে ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে—যেমন সৃষ্টিছাড়া দেবতা, তেমনই লক্ষ্মীছাড়া ফুল! জবা ফুলে শ্যামা পূজা—যেমন তমোময়ী ঠাকুরাণীটী তেমনই উগ্রচণ্ডা ফুল! ঘর সংসারের সকল কাজে বিধবা ঠাকুরাণীরা লাগেন না—কোন কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে তাঁহাদিগের একেবারে হাত নাই, এমন কি তৎসম্বন্ধীয় কোন দ্রব্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, কোন কার্য্যস্থলে উপস্থিত থাকিতেও মানা। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বক টগর জাতীয় ফুলকে বাগান হইতে বহিস্কৃত করি নাই, এত দিন আদরেই স্থান দিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখন আর তাহাদিগের বড় শুভ দেখি না—হয় পরিমলযুক্ত হইয়া ভ্রমর আহ্বান কর, না হয় বাগান হইতে দূর হও, বৃথা স্থান অধিকার করিয়া থাকিও না; থাকিলেও কেহ তোমায় আর জল দিবে না, কেহ তোমার পাট যত্ন করিবে না, সুতরাং শুকাইয়া মরিতে হইবে। যদি বল দেব দেবীর পূজা—সে

'পাঠ' প্রায় তুলিয়া দিয়াছি; একান্ত যদি করিতে হয়, সুখে থাকুক আমার ভার্বিনা, বিগ্‌নোনিয়া, ক্রোটন ইত্যাদি।

ফুলের মধ্যে শেফালিকা ফুলটা বালবিধবা—পরিমলে ভরা, কিন্তু বোঁটা আল্‌গা। বারোতে পা দিয়াছিল কি না সন্দেহ; রাত্রিতে ফুটিল, রাত্রিতেই ঝরিল—যেমন আবাহন তেমনই বিসর্জ্জন। রূপটী নয়নরঞ্জন, গন্ধটুকু অতি মনোহর; কিন্তু ভ্রমরের তাহাতে লাভ নাই—ভ্রমর বসিতে গেলেই শেফালিকা সুন্দরী অমনি ধরাশায়িনী। এ দেশী ভ্রমরগুলাও বড় দুষ্ট—ঝরা ফুলে মধু থাকিলেও তৎপ্রতি অগ্রসর হয় না। ধন্য কিন্তু হিন্দুর ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ! তাঁহারা দেখিলেন যে, পরিমলময়ী শেফালিকা ঝরিয়া পড়িল, অমনি ব্যবস্থা করিলেন, তজ্জাতীয় কুড়ান ফুলেও দেব দেবীর পূজা চলিতে পারিবে। সুতরাং শেফালিকার যে আদরটুকু ছিল তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল। তথাপি ফুলটী বড় সরম কুমারী, মরম পিয়ারী—শিশির সিক্ত অবস্থাতেই তাহার লাবণ্য; একটু রৌদ্রের 'আঁচ' গায়ে সহে না; আছাড় মারিলেও দলিত গলিত হয় না, এবম্প্র-কার ফুলের মত কাষ্ঠপ্রাণী নয়।

অনেক প্রকার ফুলের গাছ বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—অশোক, চাঁপা, নাগেশ্বর প্রভৃতি বড় গাছ। দ্বিতীয়—কামিনী, শেফালী, গন্ধরাজ প্রভৃতি মধ্যমাকারের গাছ। তৃতীয়—গোলাপ, যুঁই, চামেলী প্রভৃতি ছোট গাছ। চতুর্থ—ভুঁই চাঁপা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন গাছ। পঞ্চম—গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ওষধি জাতীয় গাছ। ষষ্ঠ—মালতী, মাধবী প্রভৃতি লতা। সপ্তম—চন্দ্রমল্লিকা, লজ্জাবতী প্রভৃতি অর্দ্ধলতা। তৎপরে—কমল, কুমুদ প্রভৃতি জলজ ফুলের গাছ। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার গাছ (Orchid) দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অন্য গাছে জন্মে, মাটীতে তাহাদিগের মূল থাকে না। বলিতে লজ্জা করে, এ জাতীয় গাছের ফুলগুলি যেন কেমন-কেমন, যেন ফুলের মধ্যে বারবিলাসিনীর মত—নহিলে এ গাছ সে গাছ করিয়া বেড়াইবে কেন? গুণ যত থাকুক না থাকুক, ইহাদিগের 'দেমাক্' বিলক্ষণ আছে। দেখিতে একটু চাক্‌চিক্যযুক্ত বটে, কিন্তু গন্ধে প্রায় সকলগুলিই ন্যক্কার উৎপাদক। এক এক করিয়া সকল ফুলের বিচার করা আমার কর্ম্ম নয়, সকল ফুলেরই যে গুণাগুণ জানি, তাহাও নয়; তবে জলজ ফুলের মধ্যে যিনি রাণী, সেই কমলিনী সম্বন্ধে একটা কথা আছে। ইহার যেমন রূপ গুণও তেমনই, কিন্তু ফুলের এত প্রফুল্লতা কি ভাল? সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে উজ্জ্বল দিবালোকে, জলজই

হউক আর স্থলজই হউক, যে সকল ফুল ফুটে, তাহারা বড় মুখরা, বড় লজ্জা-হীনা। লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ—যে তাহা ত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে কি প্রকারে তুমি বিশ্বাস করিতে পার?

অশোক, কিংশুক, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা প্রভৃতি ফুল বড় ঘরের বউ-ঝি, তাঁহাদিগের কথায় আমার কাজ কি? কিন্তু কাহারও কাহারও বড় গর্ব্ব, অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না, আকর্ষী সাহায্য নহিলে তাঁহাদিগকে পাওয়া ভার, হস্ত প্রসারণে তাঁহারা গ্রাহ্য নহেন। কাহারও গুণ আছে যাহাতে ভুবন মোহিত হয়, কাহারও বা কেবলই রাগ, কেবলই চক্ষু রাঙ্গান। লতার ফুলগুলি প্রায় সকলই মধুর, যে গাছকে আশ্রয় করে, তাহাকে ছেদন করিলেই লতার প্রাণ যায়। মালতী, মাধবীর সৌরভে দিক্ আমোদিত, ঝুমকা লতার শোভা ও কোমলত্ব সামান্য নয়, মধুমালতী মধুতে ভরা। সাধারণতঃ মধ্যম ও ছোট গাছের ফুলেই সৌরভ অধিক; রূপের চটক অধিক না হইলেও ইহারাই সংসারে গুণবতী, ইহাদিগের জন্যই বাগান টীকিয়া আছে। যে গুলি ওষধি, আজ আছে কাল নাই, তাহাদিগের কেবল চটক, সাধারণতঃ গুণহীণা। স্কন্দজাত গাছের ফুলও অনেকটা এই শ্রেণীস্থ,- রজনীগন্ধা প্রভৃতি দুই একটা ব্যতিক্রম মাত্র। অর্দ্ধলতা জাত ফুলের পক্ষেও ঐ কথা, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ব্যতিক্রম। রূপ গুণ সংসারে উভয়ই প্রয়োজনীয়, পরীক্ষার জন্য কোথাও বা কেবল একটারও প্রয়োজন আছে—কে কিসে আদর করে সেটা ত জানা চাই!

কালিদাসের কাহিনী।

(২)

কিন্তু গল্প লিখিতে বসিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, পূর্ব্বে ইহা জানিলে, এ কাজে হাত দিতাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল গল্পের মূল জন-শ্রুতি; বাজারে আজকাল আসল "শ্রুতি"রই ততটা বিশ্বসনীয়তা নাই, এ ত 'জন'-শ্রুতি। তুমি বলিলে, "তোমার এই কাহিনীর মুখপাতই ঘোরতর অবিশ্বাস্য; কেন না, এত বড় পণ্ডিত কালিদাস,—তিনি যুবা বয়সেও নিরেট মূর্খ ছিলেন, এটা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা; দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যোত্তমা হেন প্রতিভাশালিনী রাজ-

কন্যাও কিনা বাসর ঘরে না যাওয়া পর্য্যন্ত একটা গণ্ডমূর্খের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইতে পারিলেন না! ইতিমধ্যে একটা বিবাহক্রিয়াও ত নিষ্পন্ন হইয়া গেল? মনূক্ত দশবিধ বিবাহ, কিংবা সুধীবর কালীপ্রসন্ন ঘোষের "প্রমোদলহরী"তে উল্লেখিত অশেষবিধ বিবাহ, ইস্তক '৭২ সালের কৈশবী-সংহিতা-বিহিত বিবাহ, এতৎ সমুদয়ের পদ্ধতিরাশি খুঁজিয়া দেখিলাম, কৈ কোন পদ্ধতিতেই ত একেবারে একটা বিকট মূর্খ প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত বলিয়া পার পাইতে পারে—এরূপ কোনও ফাঁক দেখা গেল না—জানি না, বিদ্যোত্তমার সঙ্গে কালিদাসের কিরূপে নিরাপদে বিবাহব্যাপার সম্পাদিত হইয়া গেল!" আমি তোমার এই পূর্ব্ব পক্ষের যুক্তি ত পূর্ব্বেই অনুমোদন করিয়াছি। কিন্তু তথাপি তুমি যে দুই কারণ প্রদর্শন করিতেছ, তাহার বিরুদ্ধে আমার কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ আছে। (১) জীবনের মধ্যবয়স পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিয়াও জগতে অনেকে পরিণামে প্রগাঢ় বিদ্যাবান্ হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে কোনও দৃষ্টান্ত তুমি প্রামাণ্য বলিয়া না মানিতে পার, কিন্তু সচরাচর কালিদাসকে যাহার সঙ্গে উপমিত করা হয়, সেই পাশ্চাত্য কাব্যকুঞ্জের কোকিল সেক্সপীয়রকেই ধর না কেন? যিনি যৌবনের প্রারম্ভে উদ্দাম অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেন, সেই ব্যক্তি জীবনের গভীর সমস্যারাজি নাটকমুখে ব্যক্ত করিবে, কে অনুমান করিয়াছিল? ভারতে ইংরেজ রাজ্যের প্রবর্ত্তক সুচতুর লর্ড ক্লাইবের কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া তদীয় বৃদ্ধ জনক নাকি বলিয়াছিলেন "after all, Booby has sense!"—(যা' হউক, বুবিরও দেখ্‌চি বুদ্ধি আছে!)। আরও দৃষ্টান্ত চাও ত ৺ বিদ্যাসাগরের "চরিতাবলী" খুঁজিয়া দেখ। (২) যাঁহারা বিচারসভায় একটা দিগ্‌গজ মূর্খকে মহামহোপাধ্যায় * করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিতের দল বিবাহসভাতেও অবশ্যই হাজির ছিলেন; তখন দশচক্রে যেমন ভগবান্ ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভূতকল্প কালিদাসকে উহাঁরা দশজনে মিলিয়া 'ভগবান' করিয়া তুলিলেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বিশেষতঃ কালিদাস মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রূপের অভাব ছিল না; বরং তিনি যে সুশ্রীক যুবা-পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সবিশেষ প্রমাণ আছে—তাহা পশ্চাৎ বলিব। এক ত "কন্যা কাময়তে রূপং", তায় বিদ্যোত্তমা বিদুষী হইলেও যুবতী,—এ অবস্থায়

---

* বঙ্কিমের কৃপায় জানি, 'দিগ্‌গজ' অর্থে গণ্ড মূর্খ'। কিন্তু তদ্বিপরীত "মহামহোপাধ্যায়" শব্দের যে কি অর্থ, উপাধির গেজেট দেখিলে, তদ্বিষয়ে কিছু গোলযোগ ঘটে বটে।

মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়, সূক্ষ্মদর্শন চলিয়া যায়, 'বলবদিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি!—"পাশ্চাত্য জগতেও অনুরাগকে 'অন্ধ' বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সুতরাং রাজকন্যা প্রতিভাশালিনী হইলেও এ ক্ষেত্রে প্রতারিত হইবেন, ইহা বড় বিস্ময়কর নহে। যাহাই হউক, প্রাচ্য রীত্যনুসারে "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" এই বচনের দোহাই দিয়া মদীয় বক্তব্যের মধুরেণ সমাপন করিলাম। এই উত্তর তোমার হৃদয়গ্রাহী না হয় ত আমি আর কি বলিব? এস্থলে স্পষ্টই বলা ভাল,—আমি আর এইরূপ কৈফিয়তের অধীন হইতে চাই না—দিবার চেষ্টাও করিব না—তোমার জন্য আমি গল্পের রসভঙ্গ করিতে পারিব না।

আজ মাসেক হইল কালিদাস নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবিকাল প্রসিদ্ধ কতকগুলি কথা আছে, তন্মধ্যে "পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি * * যোষিতাং",—অর্থাৎ সুন্দরীগণের পদপল্লবাঘাতে অশোকতরুর মুকুলোদ্গম হইয়া থাকে, কবি কালিদাস বহুবার এই প্রসিদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারই জীবনের অবস্থাবিশেষের আভাস পাওয়া যায়;—তিনি নিজেই অশোকতরু জাতীয় কিছু ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, কেননা স্বীয় বনিতার পাদাভিহত হইবার পরই যেন তদীয় জ্ঞানমুকুল উদ্গত হইল। তিনি অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিদ্যাদেবীর উদ্দেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দর্শনে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাকে সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। একাগ্রচিত্তে বহুদিন সরস্বতী সাধনার পর তাঁহার প্রতি অভীষ্ট দেবতার দয়া হইল—এমনই হইল, যে আজিও বাগ্দেবীর আরাধনা সময়ে ভক্ত বলেন—দেবি, অধমের প্রতি ঐরূপ কৃপা প্রদর্শন কর, "যা কালিদাসে করুণা তবৈব।"

কালিদাস যে স্থলে সাধনা করিতেছিলেন তাহার সন্নিকটেই একটি কুণ্ড ছিল, তাহার নাম "সরস্বতী-কুণ্ড"। সাধনার সম্যক্ ফলপ্রদান মানসে দেবী আদেশ করিলেন, "বৎস, সরস্বতী কুণ্ডে অবগাহন কর, তোমার অভীষ্ট ফললাভ হইবেক। কালিদাস কুণ্ডে একবার ডুব দিয়া উঠিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলে?" কালিদাস প্রাকৃত ভাষায় বলিলেন "পাঁক"। দ্বিতীয়বার ডুব দিতে আদিষ্ট হইয়া, তৎকরণান্তর প্রশ্ন হইল "এবার কি দেখিলে" কালিদাস তখন সংস্কৃতে বলিলেন "পঙ্ক"। তৃতীয়বার ঐ প্রকারে ডুব দিয়া দুই হস্তে দুইটি ফুল লইয়া ভাসিলেন, এবং পুনশ্চ ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিলেন "পঙ্কজ"।

তখন কালিদাসের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে—তিনি তখন সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া কবিতা রচনা করিলেন ঃ—

পদ্মমিদংমমদক্ষিণহস্তে
বামকরে লসত্যুৎপলমেকং।
ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে
কর্কশনালমকর্কশনালম্॥

হে কমললোচনি! আমার দক্ষিণ হস্তে এই একটি পদ্ম, আর বাম করে একটি সুন্দর উৎপল রহিয়াছে; বল, কোন্‌টি তোমাকে দিব,—কর্কশনাল পদ্ম না মসৃণ নাল উৎপল?

আরাধ্যদেবতা ভারতী বরপুত্রের মুখে এইরূপ সামান্য নায়িকার ন্যায় সম্বোধন শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং বলিলেন, "বৎস! দেবতার পাদ-মূলে দৃষ্টি না করিয়া একেবারে মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করা সুরুচিবিরুদ্ধ; যদিও তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে, তথাপি তোমার বুদ্ধিদোষে তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া গণিকা গৃহে প্রাণ হারাইবে।" কালিদাসের অন্তিমকাহিনী এস্থলে আলোচ্য নহে, নতুবা দেবীর অভিশাপের সফলতা প্রদর্শন করা যাইত। কিন্তু কালিদাস তদবধি সাবধান হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; তাই কুমারসম্ভবে উমার রূপবর্ণনা কালে পাদপদ্ম হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। হায়! কবির এই জ্ঞানটুকু যদি সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন মাত্রেই জন্মিত তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কলঙ্ককাহিনীও শুনিতে পাইতাম না, তাঁহার অকালে শোচনীয় মৃত্যুও ঘটিত না —যাউক্, সে সকল কথা পশ্চাৎ বলিব।

দেবী-বরে জ্ঞানলাভ হইলে কালিদাস গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কালিদাস 'জ্ঞানী' হইলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই উহার প্রমাণ। তাই অবমাননাকারিণী স্বীয় বনিতার গৃহাভিমুখেই তিনি ধাবিত হইলেন, কারণ বিদগ্ধী কলায়সজ্জা রাজকন্যার সহবাসে অর্থকামলালসার সম্যক্ পরিতৃপ্তি সাধনের আশাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। রাজবাটীতে পৌঁছিয়া কালিদাস বরাবর বিদ্যোত্তমার কক্ষের কবাটে গিয়া আঘাত করিলেন। কে, কি জন্য আগমন, এইরূপ কিছু প্রশ্ন হইলে, কালিদাস বলিলেন, "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ।" * বিদুষী বিদ্যোত্তমা এই সংস্কৃতোত্তর

* উত্তরটা কিছু 'খাপ্-ছাড়া' বোধ হইতে পারে;—এই কি ভারতীর বর-পুত্রের প্রাথমিক

শুনিয়া দ্বার উদ্ঘাটন পুর্ব্বক, পরিণেতার আকস্মিক পুনরাগমন এবং অবস্থান্তর-প্রাপ্তি দেখিয়া, অবশ্যই যুগপৎ সন্ত্রস্ত হৃষ্ট ও লজ্জিত হইলেন; এবং বোধ করি, উভয়ের মধ্যে প্রণয়সন্ধি স্থাপন করিতেও বেশীক্ষণ লাগিল না। প্রিয়তমের প্রথম সম্ভাষণ প্রণয়িণীর হৃদয়ে অবশ্যই অপূর্ব্ব স্মৃতি-মূলক হইয়া বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাই বিদ্যোত্তমা "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ" এই কথা কয়টি যাহাতে জগতে চিরদিন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে অটুট বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া যায়, তাহারই বিধান করিলেন। ভার্য্যা বিদ্যোত্তমার অনুরোধেই কবি "অস্তি" † শব্দে "কুমার-সম্ভবে"র, "কশ্চিৎ" ‡ শব্দে "মেঘদুতে"র, এবং "বাগ্বিশেষঃ" পদের প্রয়োজনী-য়াংশ "বাক্" § শব্দে "রঘুবংশে"র ভিত্তিসংগঠন পূর্ব্বক তিন খানি অমূল্য কাব্য গ্রন্থন দ্বারা জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

কালিদাস এতদ্ভিন্ন প্রিয়তমাকেই সম্বোধন করিয়া দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন,—একখানি "ঋতুসংহার" নামক ষড়্ ঋতু বর্ণনামূলক খণ্ডকাব্য, অপরখানি সাধারণতঃ প্রচলিত কতকগুলি ছন্দের লক্ষণাত্মক "শ্রুতবোধ" নামক পুস্তিকা। ইহাতে কালিদাসের প্রণয়িনী যে একজন কাব্যরসজ্ঞা ও লাবণ্যবতী রমণী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "বিক্রমোর্ব্বশী"তে কাননমধ্যে উর্ব্বশীকে হারাইয়া পুরুরবার, "রঘুবংশে" ইন্দুমতীর বিয়োগে অজের এবং "মেঘদুতে" প্রণয়িণীর নিমিত্ত যক্ষের যে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ বর্ণিত আছে, কে জানে ঐ সকল কচিৎ-প্রোষিত, অথবা মৃত-ভার্য্যা, কবির আত্মানুভূতির ফল কি না?

প্রিয়া-সম্ভাষণ? কিন্তু কিংবদন্তী মুল গল্পের অনুসরণ করিতে হইলে ইহা কেন, এতদপেক্ষা 'বেথাপ'-ভর কথাও বলিতে হইবে।

† অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, ইত্যাদি।

‡ কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, ইত্যাদি।

§ বাগর্থ বিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে, ইত্যাদি।

অপূর্ব্ব বাসর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঘেঁটু ঠাকুর।

বিষম সংক্রামক রোগের অত্যাচারে কন্দর্পপুর এক্ষণে নিতান্ত হতশ্রী হইলেও, গ্রামস্থ কয়েক জনের বিশেষ যত্নে তথায় আপনাপন সন্তানগণের বিদ্যা-শিক্ষার্থ একটী সামান্য পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। কন্দর্পপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী অপর দুই একখানি গ্রামের কয়েকটী বালক তথায় শিক্ষালাভ করিত। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক গ্রামস্থ একটী যুবক তথাকার শিক্ষক। ঈশ্বর অত্যন্ত দরিদ্র; অল্প বয়সেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয়,—তখন তাহার মাতা দুঃখ-কষ্টে গ্রামস্থ লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহাতেই কোন রূপে তাহাদিগের দিনপাত হইত। ইহাদিগের ঈদৃশ কষ্ট দেখিয়া সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঈশ্বরকে তথাকার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন; সকলে ভাবিলেন, তদ্দ্বারা যাহা উপার্জ্জন হইবে তাহাতে মাতাপুত্রের একরূপ গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে। তাঁহাদের সে আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা আমরা এইক্ষণেই দেখিতে পাইব।

ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু এ অবস্থায় লোকের যেরূপ বিনয়-বিনম্র ধীর স্বভাব হওয়া আবশ্যক, ঈশ্বর তদ্বিপরীত প্রকৃতির লোক। লেখা পড়া সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বলরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তালপাতের লেখা সমাপ্ত করিয়া কলাপাত ধরিয়াছিল,এবং কাঠাকালী ও ত্রৈরাশিক প্রভৃতি কয়েকটী অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিল; পরন্তু, চারুপাঠ প্রথম ভাগখানি সে এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া পড়িতে পারিত, এবং নাম্‌তাটীও তাহার আমূল কণ্ঠস্থ ছিল; তদ্ভিন্ন, সর্ব্বোপরি, ঈশ্বরচন্দ্র কয়েক পাত ইংরাজিও পড়িয়াছিল। এই হিসাবে তাহার বিদ্যার কিছুতেই ক্রটী ছিল না!—অন্ততঃ ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ ভাবিত। সুতরাং এই বিদ্যার নেশায় তাহার ন্যায় লোক যে দিশেহারা হইবে, ইহা বড় বিচিত্র নহে।

পাঠশালা হইতে "আউট" হইয়াই ঈশ্বরচন্দ্র মাথার মাঝখানে সিঁতা কাটিল এবং টেড়া মেজাজে চলিতে লাগিল; তবে অর্থাভাবে বাবুগিরির আনুসঙ্গিক অন্যান্য কার্য্য করিতে না পারায় 'মরমে মরিয়া' থাকিল। এমন সময় গ্রামের লোকের অনুগ্রহে তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল,—ভাবনা দূর হইল,—দুঃখের পর সুখের হাসি দেখা দিল!—ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। "তক্তে" বসিয়াই সে আপনাকে "পণ্ডিত" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। যে তাহাকে উক্ত নামে অভিহিত না করিত, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সহিত কথা কহিত না।—এমন কি, কোন বালক ভুলক্রমে তাহাকে "পণ্ডিত মহাশয়" না বলিয়া "গুরু মহাশয়" বলিলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

কিন্তু এত করিয়া বাবু হইয়া, নব্য যুবক সাজিয়া, "পণ্ডিত মহাশয়" নাম ধারণ করিয়াও, ঈশ্বরচন্দ্র এক বিষম দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারিল না। বিধাতার বিড়ম্বনাবশতঃ বাল্যকাল হইতেই বারটী মাস তাহার সর্ব্বশরীর বিষম চুলকণা পাঁচড়ায় আচ্ছন্ন। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। এই জন্য তাহার সমবয়সীরা আদর করিয়া তাহাকে "ঘেঁটু ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত।—কোন কোন সুভাবুক "ঘেঁটু ঠাকুর" কথাটী "কপাল-কুণ্ডলা"র ন্যায় কিছু রূঢ় হয় বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে "ঘণ্টাকর্ণ" বলিয়াও অভিহিত করিত। প্রথম অপেক্ষা শেষোক্ত উপাধিটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল; সে ইহাতে অত্যন্ত রাগ করিত এবং বক্তাকে তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি কটুবাক্য বলিতেও কুণ্ঠিত হইত না। অবশেষে এমন হইল যে, কেহ ঘণ্টা বাদনের ন্যায় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নাড়িলেই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বলিয়া উঠিত।

অন্যবিধ চরিত্র বিষয়েও ঈশ্বরচন্দ্র আপন অবস্থার বিপরীত হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ লোকেরা যে উদ্দেশে তাহাকে পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। দুই এক টাকা হাতে পাইয়াই ঈশ্বরের মন-পাখী পাখা বিস্তার করিল। অমনি শ্যামাচরণ প্রভৃতি কতকগুলি ইয়ার আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যে ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িল। তাহার দুঃখিনী মাতার যে দুঃখ সেই দুঃখই রহিয়া গেল! ঈশ্বরচন্দ্র আজ এখানে, কাল ওখানে ইয়ারদিগের বাড়ীতে খাইয়া বেড়াইত,—যে দিন কোথাও কিছু না জুটিত সেই দিন মাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তাঁহাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিল বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করিত। তাহার মাতা প্রত্যহ প্রতিবাসীদের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা

পাইতেন, তাহাই কোনরূপে বেলা দুই প্রহরের সময় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আহার করিতেন, কিন্তু ভয়ক্রমে ঈশ্বরকে কিছু বলিতে পারিতেন না। ঈশ্বর তাঁহার একমাত্র সন্তান,—কিছু বলিলে পাছে রাগ করিয়া সে কোথাও চলিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না—এই আশ-ঙ্কায় তিনি তাহাকে কোন কথা বলিতেন না। তিনি স্বয়ং যতই কষ্ট পান না কেন, দিনান্তে একবার মাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেই তাঁহার পরম সুখ!

আজ ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালে গম্ভীরভাবে বসিয়া সংস্কৃত ভাষার সপিণ্ড-করণ করিয়া গদ গদ ভাবে "চাণক্য-শ্লোক" পাঠ করিতেছে, বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময় তাহার মাতা আসিয়া সকাতরে বলিলেন,—"ঈশ্বর! আর ত পারিনা বাবা! এরূপ প্রত্যহ প্রতিবাসীদের কাছে হাত পাতিতে লজ্জা বোধ হয়! তুমি ছেলে পড়াইয়া যাহা পাও তার অর্দ্ধেকও যদি আমাকে দাও তাহা হইলে আমি সুখে কাল কাটাইতে পারি!"

ঈশ্বর আট দশ টাকা মাত্র উপার্জ্জন করে, ইহাতে তাহার বাবুয়ানার আনু-সঙ্গিক সমুদয় খরচ-পত্রেরই উত্তমরূপ সংকুলান হয় না, মাতা আবার তাহার অর্দ্ধেক ভাগ বসাইতে চাহেন—এ অন্যায় কি সহ্য হয়? ঈশ্বরচন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল, আরক্তনয়নে বলিল,—"যাও, যাও, আবার এখানে এসে ত্যক্ত কর্‌তে লাগ্‌লেন!" মাতা ততোধিক কাতর স্বরে বলিলেন,—"তা বাবা, যাই কোথা? পোড়া মরণও ত হয় না, যে হাড় জুড়াব!"

"তাহা হইলে আমিও বাঁচি,—আমারও এ জ্বালা আর সহ্য হয় না।"

পাপিষ্ঠের এই উত্তরে অভাগিনী জননীর চক্ষে জল আসিল, তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"আমারও যে সেই প্রার্থনা ঈশ্বর! কিন্তু পোড়া মরণ যে হয় না? তোকে রাখিয়া যাইতে পারিলে আমার মরণেও যে পরম সুখ! তা, তুই যদি উপযুক্ত ছেলে হইয়া আমাকে না খাইতে দিস্, তবে আমিও আর লোকের দ্বারে যাইব না, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।"

"উপযুক্ত ছেলে হইয়া না খাইতে দিস্"—এই শ্লেষবাক্যে ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল; সে ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিল—"কি, আমি কি কিছু লেখা পড়া করিয়া দিয়াছি, যে তোমাকে খাইতে দিব?"

ঘৃণা, লজ্জা, দুঃখ, ক্রোধে অভিমানিনী মাতা উত্তর করিলেন,—"না বাবা, তুমি দাও নি, কিন্তু তোমার পিতা দিয়েছিলেন!" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হতভাগিনী সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই মর্ম্মভেদী স্পষ্ট উত্তরে ঈশ্বরচন্দ্রের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল! সেই মহাগ্নি বর্ষণের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল, এমন সময় দেখিতে পাইল—একটী বালক মুদিতনেত্রে মুখের অপরূপ ভঙ্গিমা করিয়া দুই হস্তে সর্ব্বশরীর চুলকাইতেছে, আর কয়েকটী বালক তাহা দেখিয়া হাসিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভাবিল, যে বালক তাহারই মূর্ত্তিমান অভিনয় করিতেছে। অমনি বীরপুরুষের ন্যায় বিষম গর্জ্জন করিয়া সে বেত্রহস্তে এক লম্ফে তাহার নিকটে যাইয়া আপনার সেই দারুণ ক্রোধের উপসংহার করিল। এইরূপ অভিনয়কালে শ্যামাচরণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং প্রিয় সুহৃদকে সহসা এরূপ ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ঈশ্বরচন্দ্র মাতা সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব ঘটনা গোপন করিয়া বলিল,—"এই লক্ষীছাড়া ছেলেগুলা গর্দ্দভ অবতার; কিছু পড়া শুনা করে না।" শ্যামাচরণ হাসিয়া উত্তর করিল,—"তা, আর অমন করিয়া মারিলে কি হইবে? গাধা পিটিয়া যদি ঘোড়া হইত তাহা হইলে আর আজ আমরা তোমায় পাইতাম না!—এখন এদিকে এস দেখি, তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে।"

এই বলিয়া শ্যামাচরণ ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্যামাচরণ।

প্রথম সাক্ষাৎকালে পাঠক মহাশয় শ্যামাচরণের সবিশেষ পরিচয় জানিতে পারেন নাই। আমাদিগের এই আখ্যায়িকার সহিত তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতএব, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

রামহরি মুখোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়-দেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতার কোন বিশেষ ঘটনাসূত্রে অত্যন্ত প্রণয় হয়। ক্রমে সেই বন্ধুতাসূত্র আরও দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিবার জন্য হেমলতার পিতামহ রামহরিকে রাঢ়দেশের বাস উঠাইয়া কন্দর্পপুরে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। একে কন্দর্পপুর তৎকালে সৌভাগ্যশ্রীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল,

তাহাতে রাজধানী কলিকাতা নগরীর অতি সন্নিকটে, বিশেষতঃ সর্ব্বপাপহারিণী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে উহা অবস্থিত,—প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া দেহ পবিত্র, জন্ম সফল করিতে পারিবেন ভাবিয়া রামহরি শিবপ্রসাদের পিতার প্রস্তাবে সহজেই সম্মতি প্রদান করিলেন। কন্দর্পপুরে রামহরির বাসের পক্ষে এই সময় একটী বিশেষ সুবিধাও হইয়া উঠিল। হেমলতার পিতামহের একজন জ্ঞাতি নিঃসন্তান থাকায় বাটী ঘর ও বিষয়াদি বিক্রয়পূর্ব্বক কাশীবাস করিতে সংকল্প করেন। শিবপ্রসাদের পিতা ঐ সমস্ত সম্পত্তি রামহরি মুখোপাধ্যায়ের জন্য ক্রয় করিলেন। রামহরি অচিরাৎ রাঢ় দেশের বাস উঠাইয়া সপরিবারে কন্দর্পপুরে আসিয়া ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই বাটী শিবপ্রসাদের বাটীর সংলগ্ন, এমন কি বাহির হইতে দেখিলে দুটীকে এক বলিয়া বোধ হয়। ঐ বাটীর অন্দরমহলের সহিত শিবপ্রসাদের বাটীর অন্দরমহল সমান্তরালে অবস্থিত,—কেবল মধ্যস্থলে রামহরির একটী একতালা রন্ধন গৃহ উভয়কে ব্যবচ্ছেদ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ছাদের উপর দাঁড়াইলে শিবপ্রসাদের অন্দরমহলের সমস্তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং উভয় বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা কহিবার বিশেষ সুবিধা।

শ্যামাচরণ রামহরি মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ইহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ লালমোহন কলিকাতায় কর্ম্ম করেন। যখন লালমোহনের বয়ঃক্রম বিশ এবং শ্যামাচরণের বার বৎসর, তখন তাহাদিগের পিতৃ-বিয়োগ হয়। সুতরাং লালমোহনকে অল্প বয়সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া সংসার মাথায় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার যেরূপ আয়, ব্যয় তদতিরিক্ত। তাহাকে অনেক গুলির ভরণ পোষণ করিতে হয়। সংসারে তাহার মাতা, স্ত্রী, সহোদর শ্যামাচরণ এবং দুইটী কনিষ্ঠা ভগ্নী। যদিও লালমোহন যথা সময়ে ভগ্নী দুইটীর বিবাহ দিয়া এক দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের ভরণ-পোষণের দায় হইতে অব্যাহতি পান নাই। ভগ্নী দুইটী বয়ঃস্থা বটে, কিন্তু তাহারা এ পর্য্যন্ত একবার ব্যতীত শ্বশুরালয় কিরূপ তাহা কখন চক্ষে দেখে নাই। ভগ্নীপতিরা কোন জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে; বেতন অতি অল্প, পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই, সুতরাং ভগ্নী দুইটী লালমোহনের গলগ্রহ হইয়াছিল। ইহার উপর তাহাদিগের স্বভাব অতি চমৎকার! চিরকাল পিত্রালয়ে পড়িয়া থাকা তাহারা একরূপ সৌভাগ্য মনে করিত। স্বামী কষ্টে সৃষ্টে তাহাদের দুই চারি খানি মোটামুটী গহনা দিয়াছিলেন—এই গর্ব্বে তাহারা আর মাটীতে পা দিত না,

—সকলের সহিত 'রগ টানিয়া' কথা কহিত; লালমোহনের স্ত্রী এই দুই জটিলা-কুটিলার যন্ত্রণায় সর্ব্বদা অস্থির।

পিতৃবিয়োগের পর হইতেই লালমোহন শ্যামাচরণের লেখা পড়ার বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী হইলেন। নিজের যাহা আয় তাহাতে কোনরূপে কষ্টে-সৃষ্টে দিন-পাত হয়। ভাবিলেন,শ্যাম মানুষ হইলে তাঁহার অনেক সাহায্য হইবে—সাংসারিক কষ্ট ঘুচিবে। এই ভাবিয়া তিনি কন্দর্পপুরের নিকটবর্ত্তী একটী ইংরাজী মিশনরী স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। শ্যামাচরণ প্রথম প্রথম বেশ মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিতেছিল—দেখিয়া লালমোহনের সেই আশার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অচিরাৎ তাঁহার সে অঙ্কুর নিরাশার জ্বলন্ত তাপে শুখাইয়া গেল! শ্যামাচরণের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহার মন-পাখী ততই পাখা বিস্তার করিতে লাগিল! দিন দিন তাহার বাবুগিরির 'সখ' বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—লেখা পড়া সুতরাং এক প্রকার বন্ধ হইল। শ্যামাচরণ স্কুলে যাইত মাত্র, কিন্তু ক্লাসে বসিয়া মৃদুস্বরে টপ্পা গাহিত,কখন বা সমশ্রেণীর কয়েকটী "বাস্ত" ছেলের সহিত মিলিয়া স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া মাঠে বসিয়া তাস খেলিত!—এই সময়ে সে ইয়ারকির প্রধান সহচর তামাক খাইতেও শিক্ষা করিল।

স্কুলে এক জন পাদরী সাহেব ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কয়েকটী শ্রেণীতে বাইবেল পড়াইতেন। তাঁহার অন্যান্য উপদেশের মধ্যে তিনি বলিতেন "তোমরা সকলের সহিত প্রেম কর, ঈশ্বর তোমাদের সহিত প্রেম করিবেন।" এই "প্রেম করার" প্রকৃত অর্থ শ্যামাচরণই সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিল। স্কুলে যাইবার পথে একজন বৈষ্ণবীর একটা বাঁদরী ছিল,শ্যামাচরণ সর্ব্ব প্রথমে তাহার সহিত "প্রেম" করিল। পাদরী সাহেব যে প্রেম শিক্ষা দিতেন তাহাতে অর্থের আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু শ্যামাচরণের এই নূতন "প্রেমে" পয়সার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিল। সে প্রথম প্রথম পড়িবার বই গুলি এক একখানি করিয়া বিক্রয় করিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে লাগিল—জ্যেষ্ঠকে বলিত যে স্কুল হইতে চুরি গিয়াছে। লালমোহন তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আবার নূতন বই কিনিয়া দিতেন। কিন্তু শ্যামাচরণ এ উপায়টী আর তত সহজ বোধ করিল না, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে মাতার নিকট কিছু চাহিতে লাগিল। শ্যাম একে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—তাহাতে আবার অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়াছে,সুতরাং তাহার সকল প্রকার আব্দারই তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। এই ভাবিয়া মাতা সংসার খরচ হইতে অতি কষ্টে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে দিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি স্বপ্নেও জানিতে

পারেন নাই যে, তাঁহার আদরের ধন কিরূপ সৎকার্য্যে এই অর্থ ব্যয় করিতেছে!

শ্যামাচরণের এই "প্রেমের" কথা তাহার সমবয়সীরা সকলেই জানিতে পারিল এবং ক্রমে ক্রমে লালমোহনের কর্ণেও উঠিল। কিন্তু তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া শ্যামকে সে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া গ্রামের অপর প্রান্তে কিছু দূরবর্ত্তী অন্য একটী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এ বিষয়ের জন্য শ্যামাচরণ কিম্বা অন্য কাহাকে কিছু না বলিবার অনেক কারণ ছিল। একবার তিনি লেখা পড়া সম্বন্ধে শ্যামকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন, তাহাতে তাঁহার মাতা বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে "শ্যামের জন্য কাহারও ভাবিতে হইবে না; সে আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান,—কখনই কষ্ট পাইবে না, বিশেষতঃ তার কপালে 'রাজদণ্ড' আছে।" লালমোহন তদবধি আর শ্যামাচরণকে কিছু বলিতেন না। এ দিকে মাতার মুখে আপনার সু-লক্ষণের কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ আরও যেন "ধিঙ্গিপদ" পাইল,—ভাবিল, সে লেখা পড়া করুক আর না করুক, নিশ্চয়ই একটা "বড়লোক" হইবে! সুতরাং অধঃপথে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইল।

লালমোহন শ্যামাচরণকে পূর্ব্ব স্কুল হইতে ছাড়াইয়া অন্যত্র ভর্ত্তি করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। শ্যামাচরণের অস্থি-মজ্জায় তখন "প্রেমের" তরঙ্গ বহিতেছিল, সুতরাং অচিরাৎ সে আর একটী "প্রেমপাত্রী" সংগ্রহ করিয়া লইল। লালমোহন এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া, নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে উপায়ান্তর স্বরূপ পরিবারাদি লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাসা করিয়া থাকিলেন, এবং সেখানে শ্যামাচরণকে একটী স্কুলে পড়িতে দিয়া সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন,—ভাবিলেন, এইবার তাহার চরিত্র সংশোধন হইবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তিনি তাঁহার সে ভ্রমও বুঝিতে পারিলেন;—শ্যামাচরণ কতকগুলি অসচ্চরিত্র যুবকের সংসর্গে মিশিয়া এমন এক কাজ করিয়া ফেলিল, যে তাহাতে লালমোহনের পর্য্যন্ত জনসমাজে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল।—পরিশেষে তিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাহাকে কন্দর্পপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই সময় তাঁহার কিছু বেতন বৃদ্ধি হওয়ায়, একটী দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা বিধবাকে বাটীতে আনাইয়া রাখিলেন, ও শ্যামাচরণ এবং তাঁহার মাতার মাসিক প্রয়োজনীয় খরচের জন্য কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি

শ্যামকে আর এক পয়সাও দিতেন না ; ভাবিলেন, এরূপ কষ্টে পড়িলে তাহার চৈতন্য হইবে, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না।

শ্যামাচরণ বাটীতে আসিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া একেবারে যেন কু-কর্ম্মের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল। কলে কৌশলে গ্রামের দুই একটী নিঃসহায়া দুঃখিনী বালবিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাকে "রসিক" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল! দিন দিন প্রকাণ্ড "শণ্ডা" হইয়া উঠিল। গ্রামের প্রান্তভাগে কয়েক ঘর বাগ্‌দীর বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাসী বাগ্‌দী নামে একজন লাঠিয়ালের নিকট শ্যামাচরণ দিন কয়েক লাঠিখেলা শিক্ষা করিল, এবং কাহারও সহিত কলহ হইলে, যখন দেখিত যে তাহার সহিত বলে পারিয়া উঠিবে না, তখন "জানিস্, আমি লাঠিয়াল সন্ন্যাসী বাগ্‌দীর সাক্‌রেদ", বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইত।

শ্যামাচরণের ৺ গুরুদেবের নামের অগ্রে "লাঠিয়াল" শব্দটী ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল। আজকাল যেরূপ গবেশচন্দ্র, হবেশকৃষ্ট প্রভৃতি নামের অগ্রে "রায় বাহাদুর", "রাজা বাহাদুর" প্রভৃতি অপূর্ব্ব উপাধিমালা সন্নিবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব শ্রুতিমধুর হইয়াছে,—গৌরবের ধূমে দশদিক অন্ধকারময় হইতেছে, শ্যামাচরণ সেইরূপ, তাহার গুরুদেবের নামের অগ্রে "লাঠিয়াল" উপাধি সংযোগ করিয়া পরম গৌরব বোধ করিত।

সব হইল, কিন্তু এক পয়সার অভাবে শ্যামাচরণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম জুয়াচুরি করিয়া গ্রামের লোকের নিকট যাহা সংগ্রহ করিত, তাহাতে এক প্রকার চলিত, কিন্তু আর সে সদুপায়ে (?) চলে না,—গ্রামের লোক অচিরেই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। শ্যামাচরণ বিশেষ ভাবনায় পড়িল,—অবশেষে এক উপায় স্থির করিল ;—আজকাল নাটক লিখিলে বেশ দু-পয়সা লাভ আছে, বই ভাল হউক মন্দ হউক, "নাটক" হইলেই তাহা বিক্রয়ের ভাবনা নাই,—এই ভাবিয়া নাটক লিখিয়া শ্যামাচরণ অর্থকষ্ট দূর করিতে সংকল্প করিল।—কিন্তু প্রথমেই এক ভাবনা উপস্থিত হইল,—নাটকখানির কি নাম হইবে? "লীলাবতী", "প্রভাবতী, "পদ্মাবতী", প্রভৃতি ভাল ভাল নাম গুলি ত সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে,—শ্যামাচরণ অত্যন্ত বিরক্ত হইল ও তাহার জন্য একটীও ভাল নাম রাখা হয় নাই বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে শত অভিশাপ প্রদান করিল!—যাহা হউক, তিন চারি দিন গভীর চিন্তার পর একটী নাম তাহার মনোনীত হইল, "জয় জগদম্বা!" শ্যামাচরণ নাটক লিখিতে আরম্ভ

করিল ; তিন চারি মাস ভূতগত পরিশ্রমের পর প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পর্য্যন্ত লেখা হইল। কি যে লিখিল, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বশতঃ বলিতে পারি না, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তবে দুই একটী মূর্খ যুবক সমালোচকের মুখে শুনা গিয়াছিল যে, "শ্যামাচরণের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার একটী মহৎ উপকার সাধিত হইল,—এতদিনের পর বটতলার বাগ্‌দেবীর পিণ্ডদান হইল ;—আর কাহারও ঘাড়ে চাপিবার ভয় নাই !" কার্য্যতঃও তাহাই হইল বটে ;—শ্যামাচরণের কল্পনাদেবী সহসা পাখা বিস্তার করিয়া কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন, তাহার গ্রন্থখানির ঐখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল !

কিন্তু এই সময়ে শ্যামাচরণের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। গ্রামের কোন নিঃসহায়া বিধবার কিছু অর্থ ও বিষয়াদি ছিল, একমাত্র অপোগণ্ড শিশু ব্যতীত তাহার আর কোন অভিভাবক ছিল না। সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া গ্রামের কতকগুলি কুচক্রী লোক পরামর্শ করিয়া বিধবার বিষয়গুলি আত্মস্মাৎ করিবার চেষ্টা করিল। বিধবা অত্যন্ত বিপদে পড়িল, এমন একটী লোক পাইল না যে, তাহার হইয়া মোকর্দ্দমা করিয়া তাহার সেই অনাথ বালকের বিষয় রক্ষা করে। এই সুযোগ বুঝিয়া শ্যামাচরণ এ সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত করিব বলিয়া তাঁহার নিকট অত্যন্ত আত্মীয়তা দেখাইল। ইতিমধ্যে শ্যামাচরণ কয়েকবার জুয়াচুরী ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া, কখন বেত খাইয়া, কখন হাজত ভোগ করিয়া, কখন বা কায়ক্লেশে নিষ্কৃতি পাইয়া, গ্রামের ইতর লোক ও স্ত্রীলোকদিগের নিকট বিষম 'মোকদ্দমা বুঝ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল ; সুতরাং উক্ত বিপন্না বিধবা সহসা তাহার চাতুরী-জালে পতিত হইল ! শ্যামাচরণ অচিরাৎ কৌশলক্রমে তাহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া "গা'ঢাকা" দিল !—অনাথিনী সর্ব্বস্বান্ত হইল।

এই টাকা পাইয়া শ্যামাচরণ দিন কয়েক খুবই বাবুয়ানা করিতে লাগিল। তাহার প্রতাপের নিকট দাঁড়ায় কাহার সাধ্য ? আজ অমুকের জমিদারী, কাল অমুকের তালুক ক্রয় করিতে যায় ! গ্রামের লোক তাহার কার্য্য দেখিয়া অবাক্ ! শেষে শ্যামাচরণ রটাইয়া দিল, যে, সে শ্যামনগরের সুবৃহৎ জমিদারী আপন নামে ক্রয় করিয়াছে। লোকের মনে এই প্রসঙ্গ বিষয়ক দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনের পক্ষে বিধিমত চেষ্টারও ক্রটী ছিল না। এক দিন ইয়ার সঙ্গে শ্যাম কোন দূরগ্রামে আপন নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়াছিল, পর দিন বেলা এগারটার সময় ছিন্ন ভিন্ন বেশে এক হাঁটু ধূলা মাখিয়া গ্রামে উপস্থিত।

এক ব্যক্তি তাহার এই অভিনব বেশ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ?" শ্যামাচরণ তাহার প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "তালুকে"। লোকটী শুনিয়া একটু হাসিল ; সে শ্যামকে ভালরূপ চিনিত।

এই সময় হেমলতার রূপরাশি প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছিল ; তদ্দর্শনে হেমলতা লাভের প্রবল বাসনা তাহার মনে উদিত হইল। মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সে এক দিন শিবপ্রসাদের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সে একবারও ভাবিল না যে, তাহার ন্যায় সুপাত্রে শিবপ্রসাদ কন্যাদান করিতে কতদূর স্বীকৃত হইবেন, বরং মনে মনে চিন্তা করিল—তাহার "জমিদার" নাম ঘোষিত হইয়াছে, শিবপ্রসাদ লোভে পড়িয়া জমিদারের হস্তে অবশ্যই কন্যাদানে অমত করিবেন না। শিবপ্রসাদ শ্যামের অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "বাপু! আমার মেয়ে তোমার উপযুক্ত পাত্রী নয়, তোমার গুরুদেবের পাড়ায় তোমার অনুরূপ অনেক কন্যা আছে।" এই বলিয়া শ্যামকে আরও কয়েকটী সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহার এই ভর্ৎসনা বাক্যে—এই রূঢ় ব্যবহারে—অত্যন্ত রুষ্ট হইল, এবং মনে মনে এক ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি জল্পনা করিল। পরে হেমলতার উপলক্ষে পথমধ্যে প্রবোধচন্দ্র কর্ত্তৃক পাপিষ্ঠের যেরূপ প্রতিফল হয়, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। আজ আবার শ্যামাচরণ তাহার প্রধান ইয়ার ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কি পরামর্শ করিতে আসিয়াছে জানি না। দুই জনে অনেকক্ষণ পরামর্শ করিল, শেষে শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে, "কার্য্য সফল করিতে পারিলে বিলক্ষণ পুরস্কার পাইবে" এই আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিল। ঈশ্বরও "দেখি, আমার হাত-যশঃ, আর তোমার কপাল," বলিয়া হাসিতে হাসিতে আপন 'তক্তে' আসিয়া বসিল।

প্রাণহীন প্রকৃতি।

বঙ্কিমবাবু একস্থানে সুখ সম্বন্ধে বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন—"আমাদের বৃত্তি-গুলির অনুশীলন জন্য তিনটী সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময় (২) শক্তি এবং (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান। এখন আমার সময় ও শক্তি উভয়ই সংকীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলনসাপেক্ষ, তাহার অনুশীলনে সকল সময় টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনু-শীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, শক্তি সম্বন্ধেও এই একই কথা ঘটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে তাহাও পরিমিত। জীবিকা নির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনুশীলনে নিয়োগ করিলে অন্য বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় কিছু থাকে না।—বিশেষ পাশববৃত্তির সমধিক অনুশীলন শক্তি-ক্ষয়কারী।" তৃতীয় সামগ্রী উক্ত বৃত্তিরাশি অনুশীলনের উপাদান। এই উপা-দানেরও উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া সম্প্রতি এ বিষয় পরিত্যক্ত হইল।

এখন দেখিতেছি এই অনুশীলন ধর্ম্ম আমাদের সুখের উৎস বলিয়া অনেকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার মধ্যে সত্য আছে। বাস্তবিক, প্রবৃত্তির অনুশীলন ও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতা জনিত আমাদের মনে যে একটী শুদ্ধ ও অনবদ্য শ্লাঘা ও সুখের সঞ্চার হয়, ইহা অনেক সময়েই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—কখন এমনও দেখিয়াছি, অনুষ্ঠান ঈপ্সিত ফললাভের যেমন অনিবার্য্য কারণ, আত্মপ্রসাদ ও গৌরব তেমনি অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য সহচর। আমরা অনেক সময়,প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষ ভাবে,যেন বুঝিতে পারি,এই কার্য্যনিষ্ঠা বা ক্রিয়া-নুরাগ আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত ধর্ম্ম। শিশুর অবাধ বাল্যক্রীড়া হইতে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি ও দার্শনিকের ধৃতিতে এই একই অনুরাগ অনুস্যূত রহিয়াছে। বিশ্ব-শৃঙ্খলার অদ্ভুত মাধুর্য্যের মধ্যে বহুবার এই অত্যদ্ভুত, অতি মাধুর্য্যময় অনুশীলন তত্ত্বের অপরিস্ফুট অথচ অলৌকিক আকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে।

তাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি—কর্ম্মনিষ্ঠা ও ক্রিয়ানুরাগ আমাদের ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতি।

এখানে "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলাঃ"র প্রভাব সম্যক্ খর্ব্ব হইতেছে। বাস্তবিক, নিবৃত্তি-প্রণালী সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যধর্ম্মের প্ররোচক, এবং প্রবৃত্তি-প্রণালীই সৃষ্টিরক্ষার পরিপোষক। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যুক্তি সহকারে কীর্ত্তন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও গীতায় কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ফলতঃ, কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত ধর্ম্ম।

এই কর্ম্মনিষ্ঠা সুখের একটি কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে আমরা নিশ্চয়ই সুখ অনেক পরিমাণে আস্বাদন করি নাই। আমরা শ্রমবিমুখ—একথাটি, বাস্তবিক, আমাদের স্বভাব-সূচক নহে। শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম যে আমরা আদৌ করি না তাহা নহে, তবে কার্য্য সম্পাদনে আমরা যে শক্তি ও অনুরাগ প্রয়োগ করি তাহা অনেক সময়েই স্বেচ্ছাপ্রসূত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত নহে বলিয়া আমরা তাহার প্রকৃত রসাস্বাদনে সমর্থ হই না। বলিতে কি, আমরা এরূপ প্রাণহীন ক্রিয়ার জন্য অনেক সময়ে দায়িত্ব-ভাগীও নহি। আমরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন্ অজ্ঞাত প্রেরণায় শোণিত-তর্পণ করিতেছি তাহার একটী সুস্পষ্ট ও অত্যুজ্জ্বল ধারণা না থাকায় আমাদের এই জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম একটী প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকার ন্যায় আমাদের হৃদয়ের চারিদিকে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার একটী সুখসৌন্দর্য্যময় অস্ফুট আলোক বিকীর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে।

অনুষ্ঠিত কার্য্যের আস্বাদন না বুঝিয়া তাহাতে ষোল আনা শক্তি প্রয়োগ করাতে একটী বিষময় ভাব আমাদিগকে অলক্ষিত ভাবে আচ্ছন্ন করিতেছে। সেটী অবসাদ বা হতাশ। কার্য্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ ও গৌরবের সম্মোহন শক্তি অনুভব না করিলে কার্য্যের প্রতি একটী স্বাভাবিক বিদ্বেষ সঞ্জাত হওয়া অতি স্বাভাবিক। এইরূপ বিদ্বেষের ভাব অধিক দিন আমাদিগকে সঞ্জীবিত থাকিতে দেয় না এবং ক্রমে আমাদিগকে নীরস-নিঠুর নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া বাস্তবিক নির্জ্জীব করিয়া ফেলে।

আহার্য্য সামগ্রীর আস্বাদন না বুঝিয়া রাশি রাশি গলাধঃকরণ করিলে যেমন অচিরেই উৎকট রোগের সঞ্চার হয়, তেমনি অনুষ্ঠিত কার্য্যের মহিমা ও গৌরব আস্বাদন করিতে না পারিলে কর্ম্মানুরাগ অন্তর্হিত হইয়া যায়—অবসাদ হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই "অবসাদ" আমাদের

ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ,জাতীয় জীবনেও ঠিক তদ্রূপই অনর্থ সংঘটন করিতেছে।

কার্য্য মাত্রেরই যে একটী স্নিগ্ধ শীতল মধুর জ্যোতিঃ, একটী প্রীতি-প্রফুল্ল ভাব, আছে—ইহা আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে ; নতুবা আমাদের এ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা কল্পনা মাত্র। কাজ করিলে স্বতই প্রাণে একটী আনন্দ সঞ্চাত হয়, কর্ম্মী ভিন্ন এ কথা অপরে সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন। প্রতি মুহূর্ত্ত কিরূপে সংচিন্তা, জীবন্ত প্রসঙ্গ বা সংকার্য্যে পর্য্যবসিত করিতে হয়—এ কথা আমাদের মধ্যে অনেকেই জানি না। সংচিন্তা এবং সং-কার্য্য বাদ দিলে "জীবন্ত প্রসঙ্গ"মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আমরা বস্তুতঃ এই "জীবন্ত প্রসঙ্গে"ও অতি কচিং সমবেত হইয়া থাকি।

আমাদের আলাপ এবং প্রসঙ্গ অনেকটা অন্তঃসারশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিয়া আমরা ক্রমে নিজের জীবনী শক্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছি, এবং অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বোধ হয়, অনতিবিলম্বে আমরা এক একটী "দগ্ধ পল্লবা ব্রততী"র ন্যায়, হৃতা-ভরণা অনাথিনীর ন্যায়, বা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা যে হৃতসর্ব্বস্ব বঙ্গদেশে বাস করিতেছি তাহারই একটী জীবন্মৃত প্রতিকৃতির ন্যায়, আমাদের এক একটী ক্ষুদ্র সংসারের শ্মশানবক্ষে পড়িয়া রহিব।

ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে আমরা ক্রমে কার্য্য করিবার শক্তি হারাইব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতেছি আমরা কার্য্যকারী শক্তি হারাইয়াছি। প্রাতঃ-স্মরণীয় চরিতমালা, মনস্বী ও ভক্তগণের অমৃত উপদেশ বা কর্ম্মলিপ্সুগণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আমাদের নির্জ্জীব প্রাণকে একটু জাগ্রত করিতে পারি-তেছেনা। আমাদের স্বভাবে এখন আর একটু যৌবনের উদ্যম বা শক্তি সম্পন্নের দৃঢ়ভাব দেখিতে পাইনা। ইহাতে যেমন আমরা নিজের উন্নতি করিতে পারিতেছি না তেমনি সংসার আমাদের নিকট ভারবহ হইয়া পড়িতেছে।

শারীরিক ও মানসিক উন্নতি করিতে হইলে যেমন প্রবীণের জ্ঞান-গরিমা অত্যাবশ্যক, তেমনি যৌবনের উদ্যমও অপরিহার্য্য। আমরা অকালে যেরূপ পরিপক্কতা লাভ করিতেছি, তাহাতে অল্পদিন মধ্যেই আমাদের জীবন-লীলার অবসান হইবে—আশ্চর্য্য নহে। মানব-জীবন কার্য্যেরই দ্বারা পরিমাণ করিতে হয়, কর্ম্মহীন অবশ জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। এ ভাবে ধরিতে গেলে দেখিতে পাই—আমরা জীবনে জ্ঞান ও উদ্যমের প্রতিষ্ঠা করিতে,যশঃ ও গৌরবের আস্বাদন করিতে, অতি অল্পই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা বাক্যে যেমন

প্রভৃত কল্পনা-শক্তির অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিতে সদা সচেষ্ট থাকি, কর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্রে তেমনি অকর্ম্মণ্য ও অসিদ্ধহস্ত হইয়া পড়ি। মৌখিক বিদ্যায় আমরা প্রতিপক্ষ-বিজয়ী, কিন্তু সৎ সাহস ও কার্য্যপরতায় আমাদের প্রতিভা ও তেজ অতিশয় ক্ষীণপ্রভ। আমরা মুখে মুখে যে জ্ঞান শিক্ষা করিতেছি,—পণ্ডিতের সুললিত কথকতায়, বক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতায় এবং প্রবীণের জ্ঞান-গর্ভ উপদেশমালায় যে সকল মূল সত্য প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার যথোচিত চর্চ্চা ও সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা আমাদের সে শিক্ষাকে চরিত্রে পরিণত করিতে যত্নপর হইতেছি না। কণ্ঠস্থ বিদ্যা আমাদের জিহ্বাকে যতদূর বাক্‌পটু করিতেছে, কার্য্যের চর্চ্চা ও অনুশীলন আমাদের চরিত্রকে তেমন কার্য্যক্ষম এবং সংসারে সর্ব্ব প্রকার বিজয় লাভে সমর্থ করিতেছে না।

আমরা অনেক সময়েই আমাদের জীবনটা এমন সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কীর্ণ করিয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা বাস্তবিক দীর্ঘজীবী হইয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করিতেছেন তাঁহাদের জীবনেও বহু ঘটনার সমাবেশ বা কার্য্যবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। নিজের এবং পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আফিসের কার্য্য সমাধা করাই জীবনের কেবল মাত্র লক্ষ্য হইলে মানব-জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ ও সংকীর্ণ করা হয়—ইহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনে ভক্তি, প্রেম, পরোপকারিতা ও সারল্য, সৌজন্য এবং বিনয়-নম্রতা—এই সকলের বা এতন্মধ্যে একটীরও সুশৃঙ্খল অনুশীলন বা নিরন্তর উৎকর্ষসাধনে যত্নপর হইতেছি না। এইরূপ নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম জীবন যাপন করিতেছি বলিয়াই আজ এই মুহূর্ত্তে এই অনল্পকালব্যাপী জীবন-লীলার একটী যথাযথ তালিকা প্রস্তুত করিতে দিলে আমাদের বিষয় যুটিবে ত কথা যুটিবে না—কথা যুটিবে ত বিষয়ের অত্যন্তাভাব হইবে। আবার আমরা এই কর্ম্মহীন অবশ জীবন যাপন করিয়া সুখের কল্পনা করিতেছি। দুর্ভাগ্য এতদূর গড়াইয়াছে যে, এই আলস্যের ক্ষেত্র যাহার যত বিস্তীর্ণ তাহারই জীবনব্যাপী একটা কল্পিত সুখের প্রতি আমরা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি! কিন্তু আমরা এ কথা বুঝিতে পারিতেছি না যে কর্ম্মিষ্ঠ জীবনই জলসেকবর্দ্ধিত ফলবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও যশস্বী হয়। অথবা কর্ম্ম বা সাধনাই মানব-জীবনের নামান্তর মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা কোন্ অজ্ঞাত প্রেরণায় জীবনের এই কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছি তাহার একটী সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল ধারণা না থাকায়

উৎসাহের সহিত শক্তির প্রতিভার সম্যক্ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমাদের জীবন এই অসময়ে এরূপ ভারবহ ও কঠোর বোধ করিবার ইহাও অন্যতম কারণ। বাস্তবিক, অনুষ্ঠিত কার্য্যের পশ্চাতে প্রযুক্ত শক্তির একটী প্রস্ফুট ভাব দীপ্যমান না থাকিলে সে কার্য্য দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত বা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সূচিত হয় না। অভ্যাসের অনুরোধেও মানুষ অনেক কার্য্য সম্পাদন করে সত্য, কিন্তু তাহা কর্ম্মকর্ত্তার প্রাণকে জাগ্রত বা সমাজ-দেহকে জীবিত করিতে সমর্থ হয় না। আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেছি, অভ্যাসের গুণে আমরা যে কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির একটী প্রস্ফুট জ্ঞান বা কার্য্য সাধনের একটী স্থির লক্ষ্য অভাবে কেমন নির্জ্জীব ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। প্রাণহীন যন্ত্রের দ্বারাও অদ্ভুত কৌশলে সমাজের বিবিধ কল্যাণকর কার্য্য সুসম্পাদিত হইতেছে; কিন্তু তাহাতে যন্ত্রের উন্নতি হয় না এবং সমাজপ্রাণও তাহার কার্য্যকরী শক্তি বা দেশব্যাপী গৌরবে বিমুগ্ধ বা বিচলিত হয় না। অভ্যাস-প্রসূত কার্য্যকে আমরা সাধারণতঃ প্রাণের ক্রিয়া না বলিয়া শরীরের 'কশ্‌রৎ' বলিতে পারি। একই কার্য্যের পুনঃ পুনঃ সাধনে উহা জীবনে এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে ক্রমেই তাহা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যের গৌরব অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া যায়। নাম-জপ সাধন-সাপেক্ষ; অথবা কঠোর তপস্যা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লক্ষীভূত শক্তির নিরন্তর প্রয়োগ সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায়। কিন্তু অভ্যাস-দোষে শক্তির সতেজ প্রয়োগের অভাবে এবং প্রকৃত উৎসাহের বিলুপ্তিতে এই সাধন-প্রণালীর কিরূপ অপকর্ষ সম্পাদিত ও তদ্দ্বারা কেমন বিপরীত ফল প্রসূত হইয়াছে,তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদের কাজগুলিও অনেক সময়েই অভ্যাসের প্রবল শক্তিতে বর্ত্তমান নাম-জপের ন্যায় গৌরবহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক, ঐরূপ মৃতকাজ সম্পন্ন হইতে জ্ঞানের তেমন স্ফূর্ত্তি ও প্রাণের উৎসাহ, শক্তির সতেজ প্রয়োগ বা প্রতিভার জীবন্ত নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয় না এবং এইজন্যই আমরা সংসার-পরায়ণ হইয়া অচিরে হতোদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছি এবং যে সজীব ও জাগ্রৎ অবস্থা মানব-জীবনের প্রকৃত জ্ঞাপক তাহাই প্রভূত পরিমাণে খোয়াইয়া ফেলিতেছি!

এইরূপ চিরাভ্যস্ত কাজের প্রাণহীন বহুল আবৃত্তিতে যেমন একদিকে আমাদের কাজের প্রতি আস্থা ও প্রকৃত অনুরাগ অন্তর্হিত হইতেছে, তেমনি কাজ

হইতে যে ফল প্রসূত হইতেছে তৎপ্রতি আমরা সমুচিত সমাদর করিতে পারিতেছি না এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যে সিদ্ধকাম হইলে প্রাণে যে একটা বিমল সুখ, স্বর্গসম্পদ, আপনা হইতেই অনুভূত হয় তাহাও সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না। কাজেই কার্য্যসাধনে আমাদের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ ক্রমেই ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে।

আমরা অনেক সময় মনে করিয়া থাকি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার অভাব যেমন আমাদের, তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনের, সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু বোধ হয় আমাদের চেষ্টা ও উদ্যমশীলতার অভাবেই আমরা সর্ব্বকর্ম্মে হতোদ্যম ও নিষ্ফল হইতেছি। মানব-জীবন কার্য্যেরই সমষ্টি মাত্র। উদ্যমশীলতা ও কার্য্যকারী শক্তির সম্যক্ প্রয়োগই আবার কার্য্যের প্রাণ। এই উদ্যমশীলতা ও কার্য্যকারী শক্তির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনই মানব-চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদিগের বোধ হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বাস্তবিক গঠিত চরিত্রেরই আরাধ্য এবং অনুষ্ঠিত ভাব; কিন্তু আমাদের চরিত্রকে সুগঠিত ও সুশৃঙ্খলীকৃত করিতে হইলে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত ও প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠা ও জীবন্ত উদ্যমের সহিত ঈশ্বরপ্রদত্ত সমুদয় শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। এখানে একটি সামান্য কথার উল্লেখ করিতে চাই। আমাদিগের বোধ হয়, কথাটী যৎসামান্য হইলেও তাহার উদ্দিষ্ট ভাব অতীব উপাদেয় ও শিক্ষণীয়, এবং সামান্যতঃ আমাদের জীবন-প্রবাহের প্রতিকূল ভাবসম্ভূত। আমাদিগের দুইজন অভিভাবক আমাদিগকে দুইদিন দুইটী ইংরাজী কথার সাধারণ্যে প্রচলিত সংক্ষেপ বর্ণবিন্যাস করার অপরাধে বিশেষ তিরস্কার করেন। সেই দুইটী বিশেষ শব্দ ঐরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে লেখার জন্য তাঁহারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—"লিখার সময়ে বড় বড় কথাগুলির জন্য এইরূপ একটা সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত ব্যবহার করাতে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে চরিত্রের উপর আলস্য ও অবহেলার একটা ভাব ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। লেখা আরম্ভ করিবার সময়ে এইরূপ আলস্যে প্রশ্রয় দেওয়া এবং পারদর্শী ও ক্ষমবান লেখকদিগেরই প্রাপ্য যেটুকু অধিকার, তাহা পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ করিতে যাওয়া তোমাদের অন্যায় ও ধৃষ্টতা।" এ সকল কথায় আমাদের আর উত্তরের অন্য পন্থা বিদ্যমান ছিল না। এখন দেখিতেছি, আমরা জীবনের অনেক কাজই এইরূপ কোন একটা সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতে করিতে পারিলে আর তাহার প্রলোভন এড়াইতে পারি না। অন্যের উপর নির্ভর এবং

পরমুখাপেক্ষিতা, যাহা আমরা মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণনীয় রোগ বলিয়া মনে করি, তাহাও এই সামান্য শিথিলতা ও কার্য্য সম্পাদনের সম্যক্ নিষ্ঠার অভাব হইতেই সঞ্জাত হয় বলিয়া বোধ হয়। যখন দেখি একটী বালক তাহার সহাধ্যায়ীর শ্লেটখানার দিকে সতৃষ্ণনয়নে ও অলৌকিক কৌশলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া তাহার অঙ্কের সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই বুঝিতে পারি, আলস্য তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিতেছে। আমরা নিজের জীবনের অত্যাবশ্যক কাজগুলির বিশিষ্ট পরিচালন ও পূর্ণ সমাধানের জন্যও অনেক সময় আত্মীয় বন্ধুর শক্তি ও প্রতিভার উপরে, প্রতিবেশীমণ্ডলীর অনুগ্রহ ও স্নেহদৃষ্টির উপরে, ঐরূপ বালকের ন্যায় সতৃষ্ণ দৃষ্টি সম্পাত করিয়া থাকি।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা সম্পদের উদ্দেশে বা জীবনোপায় সঞ্চয়ের অভিলাষে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনযাপন করিতেছি। আমাদের ভাগ্যে গৃহের সে উন্মত্ত আনন্দ, সে নিরুদ্বেগ প্রশান্ত ভাব, প্রাণভরা সম্ভাষণ ও পবিত্র কোমল মধুর সম্ভোগ ঘটিবে বলিয়া আশা করাই একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিদেশের নিরবচ্ছিন্ন কঠোর আঘাতে আমাদের প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও একটু বিস্তীর্ণ ভাব ক্রমে নিরুদ্ধ ও সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। গৃহের পবিত্র ও মুক্ত বায়ুতে কালাতিপাত করিলে আমাদের যে সকল বৃত্তি স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পাইত, এ প্রতিকূল অবস্থায় আমাদিগকে পড়িতে হইতেছে বলিয়া সে সকল স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তিরও ক্ষণিক অনুশীলন করিতে হইতেছে। একে সময়ের অত্যান্তাভাব, তাহাতে আবার শক্তিপ্রয়োগের প্রবৃত্তি বা তৎপ্রণালী নির্দ্দেশ বিষয়ে নিরক্ষর মূর্খ; কাজে কাজেই দশচক্রে পড়িয়া আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইতেছি। যে ধৈর্য্য ও প্রীতি, ক্ষমা ও পবিত্রতা প্রস্ফুটিত হইলে নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় চরিত্রকে উজ্জ্বল ও পরম সুন্দর দেখায়, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অপরিচিতের সংঘর্ষে নির্ব্বিঘ্নে ফুটিতে পারে না। পক্ষান্তরে আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব এতদুর উন্নত হইতেছে না যে, আমরা আত্মীয় বন্ধুদিগকে, পাড়া প্রতিবেশীদিগকে, স্বীয় পরিবারের স্বজনগণের ন্যায় একই প্রীতির চক্ষে দেখিব। কাজেই এজন্যও আমরা, দৃশ্যতঃ না হউক, অন্ততঃ কতকটা সঙ্কীর্ণ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছি বলিয়া ভয় হয়।

আমরা এতক্ষণ যে অক্লান্ত উদ্যম ও জীবন্ত উৎসাহের কথা বলিয়াছি, সততাই তাহার প্রাণ। সততা পরিহার করিলে উদ্যম ও উৎসাহ প্রকৃত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্য্যবসিত হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন, আমাদের দৈনিক জীবনযাপন ও

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানগুলির সাধনার জন্য সততার তত অত্যাবশ্যক প্রয়োজন লক্ষিত হয় না। বাস্তবিক এরূপ মত ভ্রমসঙ্কুল ও বিপজ্জনক। আমরা অনেক সময় কার্য্যক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভের প্রলোভনে ও আলোচনা স্থলে বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই সত্যের মঙ্গল নির্দ্দেশ উপেক্ষায় অবহেলা করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের জীবনের মূল্য ও গৌরব প্রকারান্তরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে জীবনে সত্যের প্রতি আদর ও অনুরাগ যত অল্প, তাহার শক্তি ও প্রভাব ততই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। সত্যের প্রতি আমাদের সমুচিত আদর ও সম্মান নাই বলিয়াই আমাদের জীবন মৃত-প্রায় হইয়া রহিয়াছে। উদ্যমশালতা যখন প্রত্যক্ষভাবে সত্যানুমোদিত ও সত্যাশ্রিত হয়, তখনই তাহাকে প্রতিভা নামে অভিহিত করিতে পারি। এই প্রতিভা যেমন ব্যক্তিগত জীবনের স্পর্শমণি, তেমনি জাতীয় জীবনের প্রকৃত উন্নতি ও গৌরবের প্রকৃষ্ট উপাদান।

এই জীবন্ত উদ্যমশীলতায় মানুষ যখন দৃপ্ত হয় তখন তাঁহার স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরের ভাব জাগ্রত না হইয়া থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ অপরের নির্দ্দেশ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রণালীর উপরে নির্ব্বিচার নির্ভর করিতে চায় না। আমরা এইজন্য দেখিতে পাই—কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এইরূপ জীবন্ত ভাবসম্পন্ন হইলেই তাহাদের উন্নতি ও চরম লক্ষের একটী নিশ্চল, নিবদ্ধ ও সর্ব্ববাদীসম্মত আদর্শের গঠন করিতে ইচ্ছা করে না। মানবপ্রাণ যেমন সজীব ও ক্রমোন্নতিশীল, তাহার আদর্শ টীও তেমনি মুক্ত ও চিরবর্দ্ধিষ্ণু সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত করিতে চায়। বাস্তবিক এইরূপ সত্য আদর্শে যাহাদের জীবন সম্পৃক্ত রহিয়াছে, তাহাদের সকল দুঃখ শান্তির সুখ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে এবং পর্ব্বত-প্রমিত অবসাদ ও সত্যের অমিততেজে অচিরে প্রক্ষালিত হইয়া যাইতেছে।

আমাদের এই প্রাণহীন অবশ জীবনের প্রতি একটু দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, আমাদের জীবন এইরূপ একটী মুক্ত ও চির উন্নতিশীল আদর্শের সঙ্গে সম্বদ্ধ নহে। আমরা যে দেশের লোক, সে দেশটীই কোন একটী মৃত—নিশ্চল মৃত—আদর্শের উপর লক্ষ করিয়া রহিয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা যে প্রাণহীন ও অচেতন হইয়া পড়িতেছি, তাহার ইহাও একটী প্রধান কারণ। মৃত আদর্শে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করিলে সে জীবন মৃত্যুরই একটী বিভীষিকাময় প্রতিকৃতি হইবে, আশ্চর্য্য নহে। আমরা শৈশবে যে আদর্শে জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া থাকি, বার্দ্ধক্যে জীবনের উন্নতির চরম প্রান্তে উপনীত

হইয়াও সেই একই আদর্শে তাহার মূল্য ও গৌরবের গভীরতা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই। কেবল ধর্ম্ম লইয়া একথার বিচার বা আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে কথাটী সুস্পষ্ট হইবে—আমাদিগের এরূপ ধারণাও নাই। আমাদের জীবনের প্রতি ঘটনায় লৌকিক ব্যবহারে, দৈনিক জীবনোপায় সঞ্চয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য বা জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাচনে—সকল দিকেই আমাদের চিন্তা ও ভাব, প্রবীণের বা পুরাণের স্থত্র-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, নব্য যুবকের উদ্যমময়ী কল্পনা ও উচ্ছ্বসিত প্রতিভারাশি সে দুল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিতে না পারিয়া আপনাতে আপনি সঙ্কুচিত ও বিলীন হইয়া যাইতেছে। আমরা এই নিবদ্ধ ভাবের নিষ্পেষণে বিতাড়িত হইয়া এমন একটী "কোণ্-ঠেসা" ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি যে নিজেরাই তাহার লজ্জাজনক পরিণতির উপর লক্ষ্য করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া যাই। আমরা নির্ব্বীর্য্য ও ভীরু কাপুরুষ—এ কথা, শারীরিক উত্তেজনা ও শারীরবল প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রযুজ্য হউক বা না হউক, ইহা আমাদের সঙ্কুচিত প্রতিভা ও নিরুদ্যম প্রকৃতি চর্চ্চায় সম্পূর্ণ অর্থযুক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছি।

আমাদের প্রাণহীন প্রকৃতির চর্চ্চা করিয়া একটু লাভ আছে বলিয়া বোধ হয়। বন্ধু সমীপে দুঃখ-প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলে সে দুঃখের প্রাখর্য্য একটু প্রশমিত হয়। বিশেষ, কিরূপে আমরা এই নির্জীব ভাব ও জীবনের অবসন্নতা প্রক্ষালন করিয়া জীবন্ত ও কর্ম্মঠ জীবন ধারণ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারি, এ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে প্রভূত উপকার হইবারই সম্ভাবনা। ব্যথিত যেমন ব্যথিতের বেদনা অনুভব করিতে সমর্থ তেমন আর কেহই হইতে পারে না। আমরা এই ক্ষতময় জীবন লইয়া কিরূপ দুঃখ ও তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি বলিয়াই আশা হয়, বিশ্বাসও জন্মে, এ রোগ শান্তির ঔষধ আবিষ্কৃত হইবে। মানুষ যখন সমবেত ক্ষুদ্র শক্তিতে প্রাণহীন প্রকৃতির জীবন সঞ্চারের জন্য সরল প্রাণে ও সম্মিলিত হৃদয়ে একই স্বারস্বতীতৃষ্ণায় অনুকূল হইয়া অনুশীলন-যজ্ঞের পুণ্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখন প্রাণারাধ্য প্রিয়তম পরমেশ্বরের সিংহাসনও বিচলিত হইয়া থাকে। কারণ যজ্ঞের সুসমাপ্তি ও সাফল্য তাঁহারই হস্তপ্রসূত।

প্রকৃত ধার্ম্মিক কে?

---

(২)

ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের নিকট গমন করিবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইতে হইবে;—পবিত্র মনে তাঁহার কাছে যাওয়া চাই,—মনের ভাব প্রশান্ত হওয়া আবশ্যক,—যাহাতে সে বিষয়ঘটিত ব্যাপার দ্বারা বিচলিত না হয় এরূপ প্রয়াস পাওয়া উচিত,—এবং, সর্ব্বশেষে, যাহাতে ধর্ম্মাভিমান অন্তঃকরণে স্থান না পায় তৎপক্ষে সতর্ক থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। যেমন পবিত্র মন লইয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে, সেইরূপ নিষ্কামভাবে সর্ব্বজীবের সেবা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ এই—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ইহার তাৎপর্য্য এই—পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন না করিলে আমরা কি প্রকারে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি? ঈশ্বরের অপ্রিয় কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিস্থাপন করা কি সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখন দেখা যাউক, কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রিয়। যিনি জীবের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, এবং ইহাই তাঁহার প্রকৃত উপাসনা। আমাদের শাস্ত্রে পরহিত-সাধন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে। তন্মধ্য হইতে কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভাগবত পুরাণের অন্তর্গত, ভাগবত ধর্ম্ম প্রসঙ্গের মধ্যে বলা হইয়াছে,—"দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতং॥" অর্থাৎ, ভূতগণের প্রতি দয়া, মিত্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করা প্রকৃত ভাগবতের কর্ত্তব্য। এই পুরাণের আর এক স্থলে ঈশ্বরকে লাভ করিবার উপায় সকল এইরূপে বিবৃত করা হইয়াছে—

"মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥

অধ্যাত্মিকানুশ্রবণন্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহৎ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান, দীন ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা, তুল্য ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, যম ও নিয়মাদির দ্বারা দেহের শুদ্ধি বিধান, আত্মতত্ত্ব কথা শ্রবণ, আমার (ঈশ্বরের) নাম সংকীর্ত্তন, সরল ব্যবহার, সাধুসহবাস, এবং নিরহঙ্কার—এই সমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া যে ব্যক্তি ভগবদ্ধর্ম্ম আচরণ করে তাহার চিত্ত শীঘ্রই পরিশুদ্ধ হয় এবং সে আমার (ঈশ্বরের) গুণ শ্রবণ মাত্রেই ভক্তিযোগে আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়।

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে সকল উপায়ের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, দীন ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া সেই সমুদয়ের মধ্যে একটী।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥"

অর্থাৎ,—"হে দেবি, হে পরমেশ্বরি! বিশ্বের হিতসাধন করিলে বিশ্বের ঈশ্বর প্রীত হয়েন; যেহেতু তিনিই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।"

আমরা দেখিলাম যে, আমাদের শাস্ত্রের মতে পরোপকার-ব্রত সাধন ঈশ্বর-লাভের পক্ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যেহেতু, বিশ্বের হিতসাধন করিলে বিশ্বাধিপ প্রীত হয়েন। এখন দেখা যাউক, অন্যান্য জাতির শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি প্রকার উপদেশ আছে।—মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সেই ব্যক্তি যথার্থ ধার্ম্মিক যাহার ঈশ্বরে, পুনরুত্থান দিবসে, স্বর্গীয় দুতে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে তাহার আত্মীয় স্বজনকে, পিতৃ মাতৃহীন সন্তানকে, সহায়হীনকে এবং পথিককে ধন দান করে। কোরাণের আর এক স্থলে এই আদেশটী আছে।—"পিতা মাতার, আত্মীয় স্বজনের, পিতৃ মাতৃহীন সন্তানের, দীন ব্যক্তির, প্রতিবাসীর, সহযাত্রীর, পথিকের এবং ক্রীত-দাসের হিতসাধন করিবে।" খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলেও পরোপকার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি আদেশ আছে। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং মনুষ্যের প্রতি প্রীতি ইহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। খ্রীষ্ট যখন তাঁহার শিষ্যগণকে ধর্ম্ম প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রেরণ

করিতেন, তখন লোকসাধারণের উপকার করিবার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে আদেশ দিতেন। একদা কোন ব্যবহারজীব খ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"অক্ষয় জীবন ভোগ করিবার জন্য আমার কি করা উচিত?" ইহার প্রত্যুত্তরে খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে কি লেখা আছে?" উক্ত ব্যবহারজীব প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "তোমার সমুদায় অন্তঃকরণ, সমুদায় আত্মা, সমুদায় শক্তি এবং সমুদায় মনের সহিত ঈশ্বরকে ভালবাসিবে এবং তোমার প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিবে।" খ্রীষ্ট প্রত্যুত্তর করিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, এইরূপে কার্য্য কর, তুমি অমর হইবে।" উক্ত ব্যবহারজীব এ কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া খ্রীষ্টকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতিবাসী কাহাকে বলে?" খ্রীষ্ট একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি অপরের হিতসাধনে রত সেই ব্যক্তিই প্রতিবাসী। খ্রীষ্ট আর এক সময়ে তাঁহার শিষ্যগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, দীন ব্যক্তিকে সেবা করা আর তাঁহার (ঈশ্বরের) সেবা করা সমান। তদ্‌যথা "পরকালে, আমি তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিব—আমি তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে জল দাও নাই; আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে খাদ্য দ্রব্য দাও নাই; আমার বস্ত্র ছিল না, কিন্তু তোমরা আমাকে বস্ত্র দাও নাই। তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে—প্রভু! তুমি কখন্ তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলে—আমরা তোমাকে জল দিই নাই? তুমি কখন্ ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলে—আমরা তোমাকে খাদ্য দ্রব্য দিই নাই? তোমার কখন্ বস্ত্রের অভাব হইয়াছিল—আমরা তোমাকে বস্ত্র দিই নাই? তখন আমি এই উত্তর দিব—যখন তোমরা একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও ক্লেশ দূর কর নাই, তখন তাহা আমারই প্রতি করা হয় নাই।"

নানা স্থানের ধর্ম্মবীরগণও দীনসেবাকে ধর্ম্মের একটী উচ্চ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "নামে রুচি জীবে দয়া" চৈতন্যদেবের মূলমন্ত্র ছিল। রাজা রামমোহন রায় বলিতেন—মনুষ্যের হিতসাধন করাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা। একদা কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক দয়ালু হাউয়ার্ড (John Howard the Philanthropist) সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি এতকাল পরের জন্য জীবন অতিবাহিত করিলেন, এখন কি নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করিবার সময় হয় নাই?" ইহার উত্তরে হাউয়ার্ড মহোদয় বলিয়াছিলেন "আমি পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য এত দূর ব্যস্ত ছিলাম যে, আমার যে আত্মা আছে তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

প্রকৃত ধার্ম্মিক কে, তাহা আমরা যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অতি বিরল। অনেককে সন্ধ্যা ও পূজায় সময় অতিবাহিত করিতে দেখা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে কয়জন পবিত্র মন লইয়া ঈশ্বরের সমীপে গমন করিয়া থাকেন? অনেকে হরিনাম জপ করিতেছেন, হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে উন্মত্ত হইতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কয়জন দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ করিয়া আপামর সাধারণকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন? আর্ত্তগণের রোদনধ্বনিতে চারিদিক্ পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু কয়জন সে দিকে কর্ণপাত করিয়া থাকেন? ভদ্রলোকের গৃহে কত বিধবা অন্ন পাইতেছে না, কত অসহায় শিশুর ভরণপোষণ হইতেছে না, আবার কত অন্ধ, খঞ্জ ও আতুর ব্যক্তি আহারাভাবে হাহাকার করিতেছে, কয়জন তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্নবান হইতেছেন? এই যে নানা স্থানে লোকের জলকষ্ট হইয়াছে, ধনাধিপগণ তাহা নিবারণের জন্য কি করিতেছেন? বর্ত্তমান সময়ে রাজপুরুষদিগকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা সমুৎসুক;— তাঁহাদের বাটীতে কোন উৎসব হইল, সেই উপলক্ষে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ নিমন্ত্রিত হইলেন, তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য হোটেল হইতে উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করা হইল। যেমন সুখাদ্যের দ্বারা তাঁহাদের রসনা তৃপ্তিলাভ করিল, দিব্যাঙ্গনার নৃত্য তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিল এবং সুমধুর সংগীত তাঁহাদের শ্রবণ বিবরে সুধা বর্ষণ করিল, অমনি রাজপুরুষগণ সন্তুষ্ট হইয়া ধন্যবাদ দিলেন, ধনাধিপের মনে আর আনন্দ ধরিল না। বিবাহাদি আমোদজনক উৎসবে এপ্রকার ইংরাজ-অভ্যর্থনা বিশেষ আপত্তিজনক না হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের কথা কি কহিব, দুর্গোৎসবেও এবম্প্রকার দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে। পুরোহিত মহাশয় দালানে দশভূজার পূজা করিতে লাগিলেন, গৃহস্বামীর যেন তৎসঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই, মহামায়ার রীতিমত পূজা হউক বা না হউক, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই—তিনি দেশী এবং বিলাতি বন্ধুগণকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন। দশভূজার হয়ত এক উপচারে পূজা হইতেছে না, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা বন্ধুগণকে অবৈধ পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা ষোড়শ উপচারে পূজা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আর আমাদের অধিক অধোগতি কি হইতে পারে? এই সকল বড় লোক সাহেবদের প্রীত্যর্থে অর্থ ব্যয় করিবেন, না দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? এই দুর্দ্দিনে একটু আনন্দের বিষয় এই যে, রাজপুরুষদের অনুরোধে, আমাদের ধনী ব্যক্তি-

গণ কোন কোন সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে দেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে যে পত্র জমিদারদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সুফল উৎপাদন করিয়াছে। কোন কোন জমিদার স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও কূপখনন এবং পুরাতন তড়াগের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন। এখন তাঁহারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই সকল কার্য্য করিতেছেন,—ভরসা করি, ভবিষ্যতে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এবম্প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

আমাদের মধ্যবিধ ভ্রাতাদের সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। তাঁহাদের মধ্যেও পর-হিত-সাধন বিষয়ে বিশেষ ত্রুটী দেখা যায়। যাহা উপার্জ্জন করেন তাহার দ্বারা তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন, এ অবস্থায় তাঁহারা কি প্রকারে অপরের জন্য অর্থব্যয় করিতে পারেন ?—ইত্যাকার কথা তাঁহাদের নিকট হইতে শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থই কি পরিজনগণের প্রতিপালন তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ? যদ্যপি হইয়া থাকে, তাহা তাঁহাদেরই দোষে। নানা প্রকার সৌখীন দ্রব্য ব্যবহার করাতে তাঁহারা আপনাদের অনিষ্ট আপনারাই করিতেছেন। অনেক অনাবশ্যক দ্রব্যকে তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এই নিমিত্তই ত তাঁহাদের এত ক্লেশ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু তদ্দ্বারাই তাঁহারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পূজা ও দীনসেবা পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতেন। বিলাসিতাই যত অনিষ্টের মূল। ইহাই ধর্ম্মপথের কণ্টক স্বরূপ। নিজের সাজ-সজ্জায় যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহাদের মন কি ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হইতে পারে ? নিজের সুখ-সাধন জন্য যাঁহারা অর্থব্যয় করেন, তাঁহারা কি পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন ? যত দিন না তাঁহারা "ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"—এই সুধাময় হিতোপদেশটী অনুসারে পরের জন্য ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহারা ধার্ম্মিক রূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন না।

দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

ষষ্ঠীপালা।

পূজা-বিধি ও আয়োজন।

কপি কয় মহাশয় এ বড় আনন্দ। পূজা করি হরগৌরী চল রামচন্দ্র॥
পূজা-আয়োজন-দ্রব্য করিবারে চাই। এ আশ্বিনে পূজা হ'বে ব্যাজে কার্য্য নাই॥
কি বিধানে কত দিনে কি মতে পূজিবে। পূজা-বিধি কৃপানিধি আজি বলি দিবে॥
প্রভু কন শুন মৈত্র বিবরণ যত। সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক তিন মত॥
বলিদানহীন হ'বে সাত্ত্বিক উত্তম। রাজসিক ছাগাদি-বলিদান মধ্যম॥
মদিরাদি মহামাংস তামসী অধমে। তিন মত পূজা তার ফল জান ক্রমে॥
অতেব সাত্ত্বিক পূজা করিব পর্ব্বতে। এক পক্ষ হবে পূজা বিধি-বিধানেতে॥
আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ নবমী হইতে। শুক্লপক্ষে দশমী বিজয়া হ'বে তাথে॥
আদ্রাযুক্ত নবমী সুপ্রভাতে বোধন। বিশ্বকর্ম্মায় এই ক্ষণ আনহ রাজন॥
মৃণ্ময়ী গঠন করিবেন শীঘ্র তিনি। সিংহ পৃষ্ঠে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী॥
বৃহস্পতি পুরোহিতে কর নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রিয়া আন বনবাসী ঋষিগণ॥
বাদ্যভাণ্ড তূরী ভেরী দুন্দুভি বাজন। বাজুক বাজন—বনমালা স্থান-স্থান॥
দেবীর মণ্ডপ নির্ম্মাইবে ফটিকেতে। ছাদন করিবে ঘর ময়ুর-পুচ্ছেতে॥
পরিসর অঙ্গনে বেষ্টিবে রম্ভাতরু। লক্ষ লক্ষ দীপ দিবে—দীপ্তি হ'বে চারু॥
কুশ কোষা তিল জল আনহ তুলসী। গন্ধের সামগ্রী যত আন রাশি রাশি॥
গঙ্গামৃদা (১) গন্ধশিলা ধান্য দূর্ব্বা ফুল। ফল দধি ঘৃত আর আতপ তণ্ডুল॥
সিন্দুর সুশঙ্খ দিব্য হরিদ্রা কজ্জল। সিদ্ধান্ন কনক রৌপ্য তাম্র পরিমল॥
শ্বেত শর্ষা ঘৃত দীপ দর্পণ বিশেষে। প্রশস্ত শোভন পাত্র লাগে অধিবাসে॥
পরিপূর্ণ ঘট ধূপ নৈবেদ্য উত্তম। এ সকল বস্তু চাই বোধনের ক্রম॥
বিপ্রগণে বৃরণে বরণ নানামত। রাশি রাশি আন তাম্রপাত্র পরিমিত॥
বসন চন্দন মাল্য করিয়া বরণ। নিযুক্ত করহ চণ্ডীপাঠে দ্বিজগণ॥

---

(১) মৃদা—মৃত্তিকা।

আজি হৈতে আয়োজন কর কপিরাজ। পূজা ত করিব কালি আর নাহি ব্যাজ ॥
ক্ষুদ্র দোষে ছিদ্র হ'লে ভদ্র নাহি তাথে। অতি সাবধান হ'বে—বিঘ্ন নহে যাথে ॥
এই আজ্ঞা করি' হরি হইলা সুস্থির। আয়োজন করেন সুগ্রীব মহাবীর ॥
একে সে প্রভুর আজ্ঞা তাহে কপিরাজ। ক্ষণমাত্রে কৈল সব নাহি হৈল ব্যাজ ॥
স্মরণ করিতে বিশ্বকর্ম্মার গমনে। (২) প্রমোদে প্রণাম কৈলা প্রভুর চরণে ॥
মৃণ্ময়ী গঠনেতে বলিলা ভগবান। আজি রাত্রে হয় যেন প্রতিমা নির্ম্মাণ ॥
আজ্ঞা পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা চলিলা সত্বর। গঙ্গাসাগরের মৃদা আনিলা তৎপর ॥
চণ্ডীর মণ্ডপ চারু রচনা করিয়া। প্রতিমা পত্তন করে গণেশ ভাবিয়া ॥
দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করয়ে রচনা। দেবী দয়া কৈলে রাম করিবে করুণা ॥

প্রতিমা-গঠন।—(১) গণেশ।

করি' অতি পরিপাটী, বিশ্বকর্ম্মা ধরে মাটি, আগে করে গণেশ নির্ম্মাণ।
গজমুখ লম্বোদর, চতুর্ভুজ মনোহর, মূষিকেতে কৈলা অধিষ্ঠান ॥
বাল-ইন্দু ভাল মাঝে, মস্তকে মুকুট সাজে, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম কটিতটে শোভা।
কিবা দিব্য সূর্পকর্ণ, সিন্দুরে মণ্ডিত বর্ণ, এক দন্ত শান্ত অতি প্রভা ॥
দক্ষিণের উর্দ্ধ করে, নিজ দন্তভগ্ন ধরে, অধঃ করে ল'ন হরিনাম।
বাম-উর্দ্ধ-অধঃ হাতে, পাশাঙ্কুশ সাজে তাথে, হৃদে হরিধ্বনি অবিশ্রাম ॥
রাতুল চরণতলে, তাথে নখচন্দ্র ভালে, পদে সাজে কনক নূপুর।
করেতে বলয় দিব্য, কর্ণেতে কুণ্ডল ভব্য, কিরণে তিমির করে দূর ॥
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, গণ্ডেতে সিন্দুর সাজে, মণি-মাণিক্যের মাল্য গলে।
অম্বিকার প্রিয় সুত, যাঁ'র কর্ম্ম অদভুত, তাঁহারে নির্ম্মা'লা কুতূহলে ॥
এ ভবে পড়িয়ে দায়, দুর্গাপঞ্চরাত্রি গায়, উমাপদ করিয়া ভাবনা।
শ্রীরামপ্রসাদ পুত্রে, চাও মা করুণা-নেত্রে, জগতের এই সে কামনা ॥

প্রতিমা-গঠন।—(২) ভগবতী।

গণেশ নির্ম্মাণ করি' মনে ভাবে অতি। কি সাধ্য আমার যে গঠিব ভগবতী ॥
যোগীগণ যাঁ'র পদ ধ্যানে নাহি চিনে। কিমাকার কি বলিব বেদে নাহি চিনে ॥

---

(২) স্মরণ করিতে বিশ্বকর্ম্মার গমনে—বিশ্বকর্ম্মার আগমনের জন্য স্মরণ করিবামাত্র।

যা' হ'তে জন্মিল এই জগত-সংসার। সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম স্থূলে বিরাট আকার॥
সে জনে নির্ম্মাণ আমি কৈনু যুক্তিসারে। আপনি অম্বিকা মা বসা'বে আপনারে॥
মনে মনে প্রণমিয়া গণেশ-জননী। জটাজূট-যুত গড়ে মুখচন্দ্র খানি॥
মস্তকে মুকুট দিল তাহে অতি প্রভা। ত্রিলোচনী খগেন্দ্র-নিন্দিত নাসা কিবা॥
নাসাপুটে মণিমুক্তাযুক্ত কি বেশর। স্বর্গের তাড়ঙ্ক কর্ণে জ্যোতিঃ মনোহর॥
অলকাবলীতে সে কপোল সাজাইল। ভালে ভাল সুলাল সিন্দূর-বিন্দু দিল॥
তাথে শুভ্র বিন্দু-বেড়া ইন্দু-পংক্তি সম। অধর সুন্দরে করে বিম্বের বিভ্রম॥
মুক্তারে মলিন করে দন্তের দীধিতি। চিবুকে চুয়া'য়ে সুধা পড়ে যেন নিতি॥
কম্বু তুল্য কণ্ঠ তাহে শোভে মণিহার। কমল-কলিকা কুচ হৃদয়-উপর॥
দিব্য দশভুজ যেন কমল-মৃণাল। বাহুতে কনক তাড় জ্যোতি অতি ভাল॥
করে শঙ্খ কি মৃগাঙ্ক-মণির কঙ্কন। অঙ্গুলিতে মাণিক্য-অঙ্গুরী সুশোভন॥
শূল, খড়্গ, চক্র, বাণ, শক্তি—দক্ষ (৩) ভুজে। চাপ, চর্ম্ম, পাশাঙ্কুশ, ঘণ্টা—বামে সাজে॥
কৃশোদরী তাহে সারি সারি রোমাবলী। নাভি সুগভীর চিত্র করে ধরি' তুলি॥
মৃগেন্দ্রের মধ্যদেশ নিন্দি' কটিতটে। নিতম্ব-সংবৃত কিন্তু চারু চিত্র পটে (৪)॥
কনক-কিঙ্কিনী কিবা তাহার সুষমা। উলট কদলী তুল জঙ্ঘা অনুপমা॥
কোকনদ-জিত পদ অলক্তে রঞ্জিল। পদে দশ নখ-চন্দ্র তিমির ভঞ্জিল (৫)॥
চরণ-উপরি মণি-মঞ্জীরের শোভা। তাথে স্থানে স্থানে স্বর্ণ-ঘুংঘুরের আভা॥
পদাঙ্গুলি পাশুলিতে পরম শোভিত। আট বাঁকি (৬) গ্রন্থির উপরেতে বেষ্টিত॥
পারিজাত-মাল্যদাম অনুপম উরে। ঝলমলাকার অঙ্গ কিরণেতে করে॥
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে কত ভ্রমর ভ্রমরী। সৌরভেতে আমোদ করিল সর্ব্বপুরী॥
নবীন যৌবন কিবা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা। সেরূপে কিরূপে কাহে করিব উপমা॥
জগত-জননীরে নির্ম্মা'ল এই মতে। সিংহ বনাইল তাঁর চরণ অধঃতে॥
সিংহ-পৃষ্ঠে সমভাগে দক্ষিণ চরণ। বামপদ কিঞ্চিদূর্দ্ধে করিল গঠন॥
তার অধঃস্থলেতে মহিষ বনাইল। বাম পদাঙ্গুষ্ঠ গিয়া পৃষ্ঠেতে লাগিল॥
স্কন্ধ হ'তে কাটা মুণ্ড পৃথকে নির্ম্মাণ। সেই স্কন্ধ হৈতে মহাসুর-উপাদান (৭)॥

(৩) দক্ষ—দক্ষিণ।
(৪) পটে—বস্ত্রে।
(৫) ভঞ্জিল—দূর করিল।
(৬) আটবাঁকি—বাঁকুড়াঞ্চল-প্রচলিত পদাভরণ বিশেষ।
(৭) উপাদান—উৎপত্তি।

অর্দ্ধেক নিক্রম হৈল মহিষ হইতে। মহা ভয়ানক কায়া অসি-চর্ম্ম হাতে॥
অসুরের দক্ষ ভুজ সিংহে করে গ্রাসে (৮)। দুই ভুজে পৃষ্ঠ দিয়া বন্দী নাগপাশে॥
দেবীর দক্ষিণ হস্তে শূলে বিদ্ধ হৃদি। বাম করে কেশ ধৈলা (৯) গড়ে হেন বিধি॥
ভ্রূকুটী কুটিল দৃষ্টি অসুরের প্রতি। অপরে দেখয়ে মুখ মন্দ হাস্য ভাতি॥
রুধির নির্গত অসুরের নেত্র-মুখে। শূলে বিদ্ধ শোণিতের ধারা বহে বুকে॥
এই মত সর্ব্ব অবয়ব নির্ম্মাইল। কঞ্চুলী লিখিতে বিশ্বকর্ম্মা মন দিল॥
দুর্গাপঞ্চরাত্রি-গান জগদ্রাম কয়। হীন দেখি' হৈমবতী হইবে সদয়॥

কঞ্চুলী-চিত্রন।

বিশ্বকর্ম্মা সুধী, রচে নানাবিধি, কঞ্চুলী (১০) বেষ্টিত হার।
হীরা-মুক্তা-মণি, চৌদিকে গাঁথুনী, গগনে যেমত তার (১১)॥
উচ্চ কুচ মাঝে, পদক কি সাজে, যেমত উদিত ভানু।
রতনে জড়িত, মাল্যজাল কত, তাহে উজ্জ্বলিত তনু॥
দশ অবতার, লেখয়ে তা'পর, মৎস্য কচ্ছপ বরাহ।
নৃসিংহ বামন, রাম তিন জন (১২), বৌদ্ধ কল্কী—দশ সেহ॥
দশ দিক্‌পাল, ভাবি' লেখে ভাল, ইন্দ্র অনল শমনে।
নৈর্ঋত বরুণ, তা'পর শ্বসন, কুবের রুদ্র ঈশানে॥
অধোতে অনন্ত, ঊর্দ্ধে অজ (১৩) শান্ত, দশ দিকে ক্রমে লেখে।
তা'পর দিগ্‌গজ, অতি মহা তেজ, কুলাচল লেখে সুখে॥
সপ্ত পাতালাদি, লেখে যথাবিধি, ঊর্দ্ধেতে সপ্তম স্বর্গ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, অপর অমর, অসংখ্য তারকাবর্গ॥
রবি শশি কুজ, বুধ মহাতেজ, গুরু শুক্র শনিশ্চরে।
কেতু রাহু গ্রহ, ক্রমে লেখে সেহ, হাহা-হুহু বিদ্যাধরে॥

---

(৮) গ্রাসে—গ্রাস।
(৯) ধৈলা—ধরিলা।
(১০) কঞ্চুলী—কাঁচুলী। বক্ষ্যমান বিধান মত কাঁচুলী-চিত্রন-প্রথা অস্মদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।
(১১) তার—তারা, নক্ষত্র।
(১২) রাম তিন জন—শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম এবং পরশুরাম।
(১৩) অজ—ব্রহ্মা।

স্বর্গ বিদ্যাধরী,　অপ্সরা কিন্নরী,　বেণু-বীণা-যন্ত্র হাতে।
দেবের প্রকৃতি,　যা'র যে আকৃতি,　যত্নে লেখে কঞ্চুলীতে ॥
লেখে কল্পতরু,　পারিজাত চারু,　নন্দনাদি উপবন।
লেখে মন্দাকিনী,　ক্ষীর সম পাণি (১৪)　স্বর্গনিবাসী যে জন ॥
করি' অতি ত্বরা,　লেখে সপ্তধরা,　সপ্ত সিন্ধুতে বেষ্টিত।
মধ্যে জম্বুদ্বীপ,　সহিত অধিপ,　নব খণ্ড বিভাবিত ॥
এ ভারতবর্ষ,　সকলে উৎকর্ষ,　কর্ম্মভূমি পুণ্য ধামে।
কাশী কুরুক্ষেত্র,　কাঞ্চী সুপবিত্র,　কেদার কামাখ্যা নামে ॥
গয়া গণ্ডকিরী,　গঙ্গা গোদাবরী,　গোবর্দ্ধন গিরিবর।
মান সরোবর,　মন্দর ভূধর,　মায়া মথুরা নগর ॥
লেখে বৃন্দাবন,　গোপিকা রমণ,　প্রাণ প্রিয়তমা রাধা।
শ্রীরাসমণ্ডলী,　লেখে ধরি' তুলী,　স্মরণে নাশয়ে বাধা ॥
অযোধ্যা নগর,　মধ্যে লেখে তা'র,　জানকী রাঘব সনে।
যাঁ'র নাম নিলে,　জগত মণ্ডলে,　অনায়াসে যমে জিনে ॥
শ্রীপুরুষোত্তম,　লেখে করি' শ্রম,　দক্ষিণ সিন্ধুর তটে।
দেব জগন্নাথে,　বলরাম সাথে,　সুভদ্রা অক্ষয় বটে ॥
অন্য পুণ্যধাম,　যার যেবা নাম,　নদ-নদী অগণন।
যোগী মুনি ঋষি,　গৃহস্থ সন্ন্যাসী,　জীব-জন্তু অগণন ॥
স্থাবর জঙ্গম,　যত বিহঙ্গম,　ত্রিভুবন স্থিত যেবা।
লেখে এক দৃষ্টে,　অহি মহীপৃষ্ঠে,　কূর্ম্মরূপ জলে কিবা ॥
ব্যাজ এক দণ্ড,　নিখিল ব্রহ্মাণ্ড,　যতনে ব্রহ্ম তনয়।
অল্প স্থান বলি',　মায়ের কঞ্চুলী—　এ সন্দেহ বৃথা হয় ॥
ব্রহ্মাণ্ড কোটিক,　লোমে বন্ধে এক,　সদা করে গতাগতি।
কঞ্চুলীতে তা'র,　না হ'বে সুসার,　হেন ভ্রম র'বে কতি (১৫) ॥
নিজে দ্বিজাধম,　রচে জগদ্রাম,　রাম-পদ-মধু-আশে।
আর কত দিনে,　দেবী দীন-হীনে,　তারা তারিবে' কলুষে ॥

---

(১৪) পাণি=জল (যাবনিক প্রয়োগ)।
(১৫) কতি=কোথা?

আলোক-চিত্রের সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি-বিবরণ।

অতি পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল কি না, বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারা যায় নাই। অধিক কি,—যে সময় ইয়ুরোপখণ্ড সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিয়া বিজ্ঞানবলে অত্যদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার দ্বারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় নর নারীকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল, সে সময় পর্য্যন্তও এই অভূতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সাধারণের অগোচর ছিল; কিন্তু গত ২৫ বৎসরের মধ্যে এই বিদ্যা উন্নতির শীর্ষ স্থানে আরোহণ করিয়াছে।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌স্ দেশীয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত একদা অরুণোদয়ের প্রাক্কালে তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে সম্পূর্ণ অন্ধকার গৃহের বাতায়ন-ছিদ্র দিয়া অরুণালোক দ্বারা প্রতিবিম্বিত বৃক্ষচ্ছায়া তাঁহার গৃহপ্রাচীরের উপর প্রতিফলিত হইতেছে। তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া এই দৃশ্য দর্শন করিয়া, ধীরে ধীরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গবাক্ষদ্বার উন্মোচন করিলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে আলোক প্রবেশ করা মাত্রই ঐ দৃশ্য আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি পুনরায় দ্বার বন্ধ করিলেন, আবার পূর্ব্বরূপ দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি ভাবিলেন যে, সম্পূর্ণ অন্ধকার গৃহে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিলে বহিঃস্থ আলোকদ্বারা বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব অবশ্যই সেই ছিদ্র দ্বারা অন্ধকার গৃহমধ্যে পতিত হইবে। এই চিন্তা করিয়া তিনি তদ্রূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব তাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইতেছে না। তখন তিনি যন্ত্রের ছিদ্রস্থানে একখানি দ্বিদল কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি কাচ (Double convex lens) বসাইয়া যন্ত্রের যে স্থানে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইত, সেই স্থানে একখানি অস্বচ্ছ আয়না (Opaque Glass) বসাইয়া দিলেন; তাহাতে দেখিতে পাইলেন যে, যন্ত্রস্থিত প্রতিবিম্ব অতিশয় সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এই যন্ত্রই অধুনা "কেমেরা অব্‌স্‌কিওরা" (Camera obscura) নামে প্রসিদ্ধ।

তৎপরে তিনি এই যন্ত্রস্থিত প্রতিবিম্ব কি উপায়ে চিরস্থায়ীরূপে অন্য দ্রব্যে রক্ষিত হইতে পারে, সেই চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ,

অচিরেই এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্বর্গারোহণ করায় বহুকাল যাবৎ তৎকল্পিত মহা সত্য আবিষ্কৃত হইল না ; তবে, তিনি যে সত্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ফলফুল-পরিশোভিত প্রকাণ্ড কাণ্ডময় মহাতরু যে তাহারই পরিণতি— তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। তদবধি পরম্পরাক্রমে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিদিত থাকিলেন যে, উল্লিখিত উপায় দ্বারা বহিঃস্থ প্রতিবিম্ব যথারূপে যন্ত্রাভ্যন্তরে প্রতিফলিত হইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসীদেশীয় ডিউগ্রো (Daguerre) নামক একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, কেমেরার (Camera) ভিতরে যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা অবশ্যই অন্যদ্রব্যে স্থায়ী করা যাইতে পারে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি গভীর গবেষণাদ্বারা তাঁহার চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইলেন না, বরং সাধারণের বিদ্রূপের পাত্র হইলেন ; এমন কি,—একদা তাঁহার পত্নী ফরাসী বিজ্ঞানসভার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট যাইয়া স্বামীর কার্য্য ও চিন্তা সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করায় সেই পণ্ডিত অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, প্রতিবিম্ব কিছুতেই অন্য বস্তুর উপর চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে না ;—এরূপ কার্য্য কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত করেন নাই ; এবং তাঁহার জ্ঞান ও শিক্ষা মতে ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাতেও ঐ দিগ্‌গজ পণ্ডিতের ধৃষ্টতা নিবৃত্ত হইল না,—তিনি আরও বলিলেন যে, যদি তাঁহার স্বামীর (Daguerreর) মস্তিষ্কে ঐরূপ চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বাতুলাশ্রমে (Lunatic Asylum) পাঠাইতে হইবে।

পত্নী-মুখে উল্লিখিত পণ্ডিতোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ডিউগ্রো ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই;— তাঁহার যেন বোধ হইতেছে যে, অবশ্যই তাঁহার দ্বারা এই চিন্তা কালে কার্য্যে পরিণত হইবে। পরন্তু তিনি ইহাও বলিলেন, যখন সম্পূর্ণ অন্ধকার যন্ত্রের অভ্যন্তরে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা বহিঃস্থ দ্রব্যের সুন্দর প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন যে সমস্ত দ্রব্যের উপর আলোকের ক্রিয়া স্থায়ীরূপে পরিণত হইতে পারে, সেই সমস্ত দ্রব্য কোন স্বচ্ছ কাচখণ্ডে মাখাইয়া তাহার উপর অবশ্যই ঐ প্রতিবিম্ব স্থায়ী করা যাইতে পারিবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কাহারও নিন্দা ও বিদ্রূপে কর্ণপাত করিলেন না,—বরং অদম্য উৎসাহ ও অক্ষুণ্ণ অনুরাগ

সহকারে সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। এইরূপে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রমপূর্ব্বক নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পরীক্ষা করার পর তাঁহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল ;—তিনি স্বচ্ছ কাচবিশেষের উপর আলোক-ক্রিয়া-ধারণক্ষম রাসায়ণিক দ্রব্যাদি (Chemicals sensitive to light) দ্বারা প্রতিবিম্ব স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন।

যে বৎসর ফরাসী পণ্ডিত ডিউগ্রো (Daguerre) উক্তরূপ আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমগ্র ফরাসীদেশকে আনন্দে মাতাইয়া তুলেন, সেই বৎসরেই ইংলণ্ডদেশীয় ফক্স্ টেল্‌বট্ (Fox Talbot) নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ঐ প্রকার উপায় আবিষ্কার করেন। তবে, ডিউগ্রো (Daguerre) কেবল স্বচ্ছ আয়নায় ছবি তুলিতে পারিতেন, আর টেলবট (Talbot) কাগজে তদ্রূপ ছবি প্রতিস্থাপন করিতে পারিতেন—উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য। ওদিকে নিপ্‌স্ নামক তৃতীয় একজন পণ্ডিতও ডিউগ্রোর ন্যায় ঐ প্রকার আবিষ্কার করিয়া এবং উভয়ে উভয়ের গুণগ্রাম অবগত হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎপূর্ব্বক এই আবিষ্কৃত বিদ্যার ক্রমোন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, নিপ্‌স্ সাহেব এই ঘটনার অত্যল্প কাল পরেই পরলোক যাত্রা করেন ; সুতরাং ডিউগ্রো নিপ্‌স্ সাহেবের শিশু সন্তান এবং বিধবা পত্নীর নিকট হইতে নগদ মূল্যে তাঁহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া স্বনামে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। তদবধি ডিউগ্রো সাহেবের নিয়ম (Daguerreotype) জগদ্বিখ্যাত। ইহাই আলোক-চিত্র-বিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার পর হইতে এই বিদ্যার দিন দিন উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় নাই, বরং গত কয়েক বৎসর মধ্যে ইহার উন্নতি ও প্রচলন অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ; এস্থলে সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অভিলাষ।

জগতে যত কিছু পবিত্র ধন পা'ব
অনাথ পাপী জনে অমনি আনি' দিব।
ছেড়েছি আশা-বাসা,—যশের তৃষা নাই,—
জগতে ঢালি' প্রেম ফিরিব গান গাই'।

আপন প্রাণ দিয়ে অপর প্রাণ গুলি
বিপদ- পথ হ'তে সরা'য়ে ল'ব তুলি'।
ছোঁবেনা পাপ মোর হৃদয়- মাঝ- খান,
র'বেনা সুখ- দুঃখ র'বেনা অভি মান।
গিরির মত আমি অচল হ'য়ে র'ব,
ধরার মত আমি যতেক জ্বালা স'ব।
অসার মহী মাঝে পাপের স্মৃতি গুলি
জ্ঞানের স্নিগ্ধ জলে সকলি দিব ফেলি'।
চরিত্র- গত যত ঘৃণিত দোষ আছে,
দেখিব শীঘ্র তাহা অতীতে মিশে গেছে।
অজানা দেশ হ'তে প্রেমের উৎস আসি'
ভাসা'বে মন মম,— হাসিবে দশ দিশি।
আমিও প্রাণ ভরি' প্রাণের প্রেম- সুধা
জগতে দিব দান,— মিটিবে ক্ষোভ- ক্ষুধা।
আমার বাস- গৃহ অনাথ- বাস- শালা,—
পরের উপ কার করিব জপ- মালা।
র'বনা গৃহে আর ক'রেছি দৃঢ় পণ;
ফিরিব দেশে দেশে, করিব অন্বে ষণ—
কোথা বা দুঃখী নর করি'ছে হাহা কার,
কোথা বা জ্যোতি হীন অযুত অন্ধ কার।
কেই বা অন্ন হীন ক্ষুধাতে দুর বল,
কেই বা শোকে রোগে ফেলি'ছে আঁখি- জল।
গিরির মত মম শরীরে হ'বে জোর।
ফুলের সম এই হৃদয় হ'বে মোর।
বাসনা তৃপ্ত করি' ফুলের মধু দিয়া,
পরাণ- হীন জনে বাঁচা'ব আশ্বা সিয়া।
পাপীর কাণে কাণে হরির মধু নাম,
হৃদয় খুলে দিয়ে বলিব অবি রাম।
আঁধার মুছে ফেলি' আলোক রাশি আনি,'
গভীর বল খানি করিব রাজ ধানী।

বুকের রক্ত বিন্দু অপরে করি' দান,
পরের দুঃখ রাশি করিব অব সান।
বিভুর নামে নামে মাতা'ব মহী তল,
পাখীরা গা'বে তাই করিয়া কল- কল।
ভ্রমর ফুলে ফুলে গাইয়া যা'বে কত,
সাগর কল- নাদে গাইবে মনো মত।
পবন শাখে শাখে গাইবে এই নাম,
নিঝর প্রেম ভরে ঝরিবে অবি রাম।
কাননে চুপি চুপি কুসুম- বধূ গণ,
নাচিবে হরি- নামে করিয়া প্রাণ পণ।
কাঙ্গাল বেশে বেশে ঘুরিব দ্বার দ্বার,—
ইহার সম সুখ কোথায় আছে আর?
তোরা কি যা'বি কেহ আমার সাথে সাথে,
ছাড়িয়া গৃহ- ধাম কানন- পথে পথে?
পাতকী দুঃখী দের করিতে দুঃখ নাশ,
যা'বি কি 'তোরা কেহ ছাড়িয়া গৃহ- বাস?
যেখানে যা'ব আমি সেখানে সুখ যত,—
পাপিয়া গান গায়, পবন বয় কত!—
কাননে কুঞ্জ বনে ভ্রমর গান করে!—
অমার কণ্ঠে শশী আঁধারে আলো করে!—
কানন বায়ু কোলে এলা'য়ে কেশ- দাম,
শিশির- স্নিগ্ধ জলে ভাসি'ছে অবি রাম!—
চাঁদিনী নদী তটে ঢালিয়ে রূপ রাশ,
মধুর মুখে তার হাসি'ছে সুধা- হাস!—
দিবসে হাসে ভাসে নক্ষত্র নীলি মায়!—
প্রাবৃট মাঝে আসি' কোকিল মধু গায়!—
লহর ভেসে যায় জলের গায় গায়,
চাঁদিমা চুমি' চুমি' সুবর্ণ ঢালে তায়!—
তপন নীল জলে আলোক ঢালে যত,
সাগর কুলে কুলে হরষে ভাসে তত!

যেখানে যা'ব আমি সেখানে কত সুখ,—
আঁধারে ভয় নাই, দুঃখীর নাই দুঃখ।
এমন সুখ ময় জনম নাই আর,
করিব প্রাণ ভরি' পরের উপ কার।
ভ্রমিয়া ক্লান্ত যদি ক্ষণেক হ'বে প্রাণ,
কুসুম- আস্তা রণে রেণুর উপা ধান
দেখিব আছে প'ড়ে কতই আসে পাশে,—
ঘুমা'ব তথ নই অধীর হ'য়ে এসে।
আমার মধু মাখা কপোল ধরি' ধরি',
স্বরগ- বালা গণ চুমিবে ধীরি ধীরি!
ফুলের মালা গাঁথি' প্রবাল তায় দিবে,
আমার গলে দিয়ে বিরলে ব'লে যা'বে—
"চ'লেছ বেশ দেশে ফির'না কভু আর,
পরাণ ভরি' কর পরের উপ কার।
ভবের ধন- জন সকলি দুঃখ ময়,
জীবন পথে আসি' সাথী কি কেহ হয়?
প্রাণের প্রিয় জন যখন চলি' যায়,
তোমার মুখ পানে কেহ কি ফিরে চায়!
সংসারে যত দেখ সকলি মায়া পাশ
মায়াতে বন্দী হ'তে ক'র'না কভু আশ!"
আমিও সেই স্বরে আধেক আঁখি মেলি'
বলিব তা'র কাছে সোহাগে গলি' গলি'—
"প্রার্থনা এই মম তোমার পাদ- মূলে,
করুণা- কণা দানে আমারে লহ কোলে।
সবার অভি লাষ পূরণ কর তুমি,
তোমার পদ- তল চুমিয়া র'ব আমি।"
করিতে চির কাল পরের উপ কার,
স্বপনে ঘুম ঘোরে শুনিব বার বার,—
"চলেছ বেশ দেশে ফির না কভু আর,
পরাণ ভরি' কর পরের উপ কার।"

হরি বল মন।

"হরি বল মন" কি মধুর, কি আনন্দপ্রদ, কি ধর্ম্মভাবময় জ্বলন্ত উপদেশ! ইহাতে পাপীর হৃদয় ভীত হয়—ভক্তের প্রাণ বিগলিত হয়—সংসারী মুহূর্ত্তের জন্য সংসার-মায়া বিস্মৃত হয়—প্রেমিকের প্রাণে এক স্বর্গীয় প্রেমস্রোত প্রবাহিত হয়। ইহা একবার মাত্র কর্ণপথের পথিক হইলে মন আত্মহারা দিশাহারা হয়।

এমন পবিত্র উপদেশবাণী কি আর আছে? হও তুমি বিশ্ববিজয়ী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী অদ্বিতীয় অধীশ্বর—ইহার নিকট তোমার গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত হইবে; হও তুমি বজ্রকঠিন নির্ম্মম নির্দ্দয়—ইহার কোমলতা গুণে তুমি ক্ষণেকের জন্যও বিনয়নম্র হইতে বাধ্য হইবে; হও তুমি ঈশ্বরজ্ঞানবিরহিত ঘোর অবিশ্বাসী পাষণ্ড নাস্তিক—এই অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিলে অন্ততঃ একবারের জন্যও তোমার পাষাণহৃদয় এক অভিনব বাত্যায় আন্দোলিত হইবে। ইহা আনন্দের নিকেতন—শান্তির প্রস্রবণ—উপদেশের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি—বিষয়োন্মত্তের অমোঘ ঔষধ—ভক্তের অমৃতধারা—মায়াপাশবদ্ধ মানবের ব্রহ্ম-অস্ত্র। ইহাতে অতুল আনন্দ—অপার সুখ—অসীম শান্তি—অনন্ত উপদেশ নিহিত আছে, সুতরাং ইহা রত্নাকর!

রত্নাকরের অতল তলে কত অমূল্য ও অতুল্য রত্ন সঞ্চিত আছে, কে বলিতে পারে? কয় জন তাহার সংবাদ লয়? যে রত্নের আদর জানে—যে রত্নের মর্ম্ম অবগত আছে—যে রত্নের মূল্য বুঝিতে পারে, সে-ই রত্নের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, সে-ই রত্নের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেও প্রস্তুত হয়। আমরা মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন, বিষয়মদে উন্মত্ত, স্বার্থপরতার নীচতায় বিমুগ্ধ, দুর্জ্জয় সংসারাহবের বিভীষিকাময় প্রাঙ্গণে শুষ্কমুখে ক্ষুণ্ণমনে অবস্থিত, আমরা রত্নের কি বুঝিব ভাই? রত্নের আদর করিতে শিক্ষা করি নাই—রত্নের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা করি নাই—রত্নকে চিনিবার ক্ষমতারও সম্পূর্ণ অভাব, সুতরাং সুধাভ্রমে হলাহল পান করিতেছি,—সুখের বিনিময়ে দুঃখের কণ্টকময় পুষ্পদাম বক্ষে ধারণ করিতেছি,—রত্ন বলিয়া অসার অপদার্থে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কত খেলাই খেলিতেছি! সেই জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কত খেলাই খেলিলাম,—

কত খেলাই দেখিলাম,—খেলিতে আরম্ভ করিয়া কত বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দ্দশা, মনস্তাপ-মর্ম্মবেদনা, লাঞ্ছনা-অবমাননা অম্লানবদনে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে সহ্য করিলাম, তবুও কিন্তু খেলার মায়া বুঝিতে বা খেলার নেশা কাটাইতে পারিলাম না।

যখন আমরা বিপজ্জাল-পরিবেষ্টিত ও দুর্দ্দশার চরমে উপনীত হইয়া চিন্তানলের ভীষণ দহনে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে অমূল্য মানবজীবনে শত শত ধিক্কার প্রদান করি ও অক্ষুব্ধ হৃদয়ে অপার করুণানিধান ভগবানের পবিত্র নামে দোষারোপ করিতে যত্নপর হই,—অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ভগ্নমনোরথ হইয়া যখন আমরা জগৎপিতার মহিমামণ্ডিত মহান্ নামে কলঙ্ক-কালিমা আরোপিত করি,তখন যদি কেহ একবার এই সুধার আধার "হরি বল মন" শব্দ কর্ণকুহরে প্রদান করে, তাহা হইলে তখন মুহূর্ত্তের জন্যও মন প্রকৃতিস্থ হয়—মুহূর্ত্তের জন্যও মন ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবিতে উদ্যোগী হয়। যখন শোকে তাপে প্রাণ জর্জ্জরিত—মায়ামোহে প্রাণ বিড়ম্বিত—অহঙ্কার-অত্যাচারে প্রাণ উৎপীড়িত হয়, তখন যদি এই উপদেশ-তরুর সুশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে ইহা কি মাহাত্ম্যব্যঞ্জক—কেমন পবিত্র—কিরূপ পরিণামপথপ্রদর্শক!

কোটীপতির বৃথা ধনগরিমা, বিষয়োন্মত্তের ভীষণ ধনাগমতৃষ্ণা, অহঙ্কারীর দুর্জ্জয় অহঙ্কার, দুষ্টের বিষময় দুষ্টবুদ্ধি, ইহার প্রবল প্রভায় দগ্ধীভূত হয়। আবার ভক্তের ভক্তিভাব, বিরাগীর বিরাগভাব, তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর তত্ত্বজ্ঞান, ইহার প্রবল প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া জগৎকে বিমোহিত করে।

দুঃখের দারুণ দাবদাহে যখন প্রাণ-মন বিদগ্ধ হয়, ঘোর নৈরাশ্য-অমানিশায় যখন হৃদয় অধিকৃত হয়,পাপভারনিপীড়িত দেহভার বহনে একান্ত অক্ষমতা নিবন্ধন যখন আমরা মৃত্যু কামনা করি, তখন যদি কেহ আমাদের পাপ কর্ণে এই শান্তিসলিলসিক্ত সুস্নিগ্ধ উপদেশবাণী প্রদান করে, তাহা হইলে তখন কি মনে হয়? মনে হয়—আমরা এতদিন কি বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত প্রতারিত হইয়াছি! সুখ-সাগরের সন্নিকটে থাকিয়াও এতদিন সুখের জন্য কত অসুখ—কত অশুভের পথ প্রস্তুত করিয়াছি। হায়! এতদিন বুঝি নাই সুখ কোথা।

"হরি বল মন"এর মর্ম্ম যে বুঝিতে পারে সে আর ধন-জন চাহে না, সহায়-সম্পত্তি চাহে না, আশার উত্তেজনায় উত্তেজিত হয় না, নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে না, সুখের মুখ দেখিবার জন্য নিশাদিন হাহাকার রবে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায়

না। অপূর্ণ হৃদয় ইহার মাহাত্ম্যে পূর্ণ হয়—অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়—পথভ্রষ্ট পথিক পথ দেখিয়া গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারে। আবার ইহার সঞ্জীবনী শক্তি-বলে মৃত পুনর্জীবন লাভ করে, বিষয়বিদগ্ধ সুস্থ সবল দেহ ও শোভা-সৌন্দর্য্য প্রাপ্তির অধিকারী হয়। ভাবনা-সাগরে যাহার মন-তরি অবিরত ভাসিয়া কূল-কিনারার অভাবে ডুবু-ডুবু প্রায়, পবিত্র প্রণয়ের বিনিময়ে জ্বালাময়ী বিরহবহ্নিতে যাহার মন অনুদিন দগ্ধ, তাহার মনে কি ভাবের উদয় হয়? সে মনে করে—মঙ্গলময়ের মঙ্গল-নিকেতনে এত অমঙ্গল-অশান্তি-হাহাকার কেন? আবার যখন সে শত শত বাধা-বিপত্তি দুঃখ-কষ্ট শোক-তাপের অতল তলে নিমগ্ন হইয়াও"হরি বল মন" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে—সঞ্জীবনীশক্তিসম্পন্ন "হরি বল মন" এর গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে,তখন মনে করে—শান্তিময়ের শান্তিপূর্ণ সংসারে শান্তির অভাব নাই, সর্ব্বত্রই শান্তি; রোগে, শোকে, দুঃখে, দুর্দ্দশায়, মানে, অপমানে—সকলেই শান্তি, সকলেই সুখ!

ঐ যে আশ্রয়স্থানহীন ভিক্ষুক আজ মুষ্টিভিক্ষার জন্য "হরি বল মন" বলিয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহাকে দেখিয়া তুমি মুখ বাঁকাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছ কেন? ঐ যে দীন হীন ভিক্ষুক "হরি বল মন" বলিয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ দ্বারবানের দ্বারা অপমানিত হইতেছে, উহাকে দেখিয়া তুমি ঘৃণার হাসি হাসিতেছ কেন? সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ঐ ভিক্ষুক তোমাকে কি অমূল্য রত্ন প্রদান করিতেছে তাহা কি বুঝিতে পার নাই ভাই! সামান্য একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য ভিক্ষুক তোমার কর্ণ-কুহরে কি প্রাণমনস্নিগ্ধকর স্বর্গীয় পীযূষ প্রদান করিল তাহা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই ভাই! সংসারে কয়জন তোমাকে এমন অপার্থিব পদার্থ প্রদান করে? কয়জন অযাচিত ভাবে একমুষ্টি চাউলের বিনিময়ে এমন অমূল্য রত্ন প্রদান করে? তুমি ত,ভাই,সভ্য শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী—একবার বুকে হাত দিয়া শপথ করিয়া বল ত ভাই—যাহার সহিত তোমার প্রগাঢ় প্রণয়, যাহার সহিত তোমার প্রাণের বিনিময়, যে তোমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, যাহার সুখে দুঃখে রোগে শোকে তুমি সমভাগী, যে অবিরত যশোগানে তোমার মনস্তুষ্টি সাধন করে, যাহার জন্য তুমি নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নও, যাহার জন্য তুমি কত অর্থব্যয় কত শরীরপাত করিতেছ, তাহার নিকট কি কখনও এমন অমূল্য ধন "হরি বল মন" পাইয়াছ? তাহার "হরি বল মন" শব্দে কখনও কি তোমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়াছে? মূর্খ তুমি—তাই আজ পরমোপকারীর

উপকার বুঝিলে না, মূর্খ তুমি—তাই আজ অমৃতের আদর করিলে না, মূর্খ তুমি —তাই আজ স্বর্গীয় সুধার বিনিময়ে একমুষ্টি ভিক্ষা দিতে কাতর!

তাই আজ বলিতেছি ভাই রে! তুচ্ছ তোষামোদে মজিও না, কপট প্রেমে প্রাণ সমর্পণ করিও না, দুই চারিটা মিষ্ট কথায় বিগলিত হইও না, আপাতমধুর পরিণামবিরস পদার্থে আস্থাবান হইয়া পরকালের পথ রুদ্ধ করিও না, ক্ষণিক সুখের জন্য অনন্ত সুখসামগ্রীতে উপেক্ষা করিও না। যে তোমাকে কুপথ হইতে সুপথে লইয়া যাইতে চায়, যে তোমার ভ্রম সংশোধন করাইতে সর্ব্বথা যত্নবান, যাহার পবিত্র ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তুমি তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পার, তাহারই শরণাপন্ন হও। তিনিই বন্ধু যিনি পথভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই উপকারী যিনি পরিণাম ভাবিতে উপদেশ দেন, তিনিই মিত্র যিনি নশ্বরে অনাস্থাবান হইতে পরামর্শ দেন এবং তিনিই প্রকৃত ভালবাসেন যিনি শোক-তাপ-জরা-মৃত্যু-আধি-ব্যাধি-সঙ্কুল সংসারে মানুষকে পরকাল ভাবিতে—ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে শিক্ষা দেন। অতএব এস ভাই! যিনি "হরি বোল" "হরি বোল" বলিয়া ভক্তিভাবে ক্রন্দন করিতেছেন—যাঁহার "হরি বল মন" শব্দে জড়ভাবাপন্ন মনের চেতনা সম্পাদিত হইতেছে—একবার দ্বেষ-হিংসা অহঙ্কার-অভিমান ভুলিয়া তাঁহার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া,ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া "হরি বোল" "হরি বোল" বলিয়া জীবন মন সার্থক করি,—মানব জন্ম সফল হউক।

সুখ।

মনুষ্যজীবন সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু জগতে সুখ অতীব বিরল। আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছি, তাহারও অভ্যন্তরে দুঃখ বিরাজ করিতেছে। ধন, যশঃ, মান, সম্ভ্রম—ইন্দ্রিয়লব্ধ কাম্যবস্তুর দ্বারা সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অস্থায়ী। এ সকলে প্রথমে যেরূপ সুখ লাভ হয়,তৎপরে আর সেরূপ থাকে না। ক্রমশঃ আরও অল্প হইয়া যায়,পরে অভ্যাসবশতঃ তাহাতে আর কিছুমাত্র সুখ থাকে না ;—সুখত থাকেই না, অধিকন্তু মহৎ অসুখের কারণ হইয়া উঠে। কাম্যবস্তুর ভাবে অভ্যাসবশতঃ সুখ হয় না, কিন্তু অভাবে গুরুতর অসুখ হইয়া থাকে ; এবং অদম্য আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে

যন্ত্রণারই বৃদ্ধি হয়। অতএব বলিতেছি, জগতের কাম্যবস্তুতে সুখ কৈ? এ সকলই অতৃপ্তিকর ও সম্পূর্ণ দুঃখদায়ক। সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়—যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতি ও মনস্তাপ জন্মিয়া থাকে; কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট দেহও জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; মান ও সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় দেখিতে দেখিতে দুর্ঘটনা বাতাসে উড়িয়া গিয়া স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যাকেও বিমল তৃপ্তিদায়িনী বলিতে পারা যায় না,—উহা অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকারে লইয়া যায়; যিনি যতই বিদ্বান হউন না কেন, তাঁহার তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখনই নিবৃত্ত হয় না। তবে এ সকলে সুখ কোথা? কেহ কি কখনও বলিয়াছে—"আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি, বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি, কিম্বা সংসারী হইয়া সুখী হইয়াছি?" সংসারের বাহ্য সৌন্দর্য্য আছে বটে, আপাততঃ সংসারের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বোধ হয় বটে যেন মানব-জীবন জুড়াইবার জন্য জগদীশ্বর একটী সুন্দর সুখময় স্থান সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু সংসারে প্রকৃত সুখ কৈ? মরুপ্রান্তরে মরীচিকা যেমন পথিকগণকে প্রলোভিত করে, সংসারও তেমনই বাহ্যাড়ম্বরে সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকাশ করিয়া মানবগণকে বিমোহিত করিতে থাকে। সংসার-প্রবিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই যেন ভীষণ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া যান, তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া যায়। সংসার প্রবেশের পূর্ব্বে যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, সরল স্বভাব ও সচ্চরিত্র ছিলেন, আপনার ন্যায় সকলপ্রাণীকেই অবলোকন করিতেন, এই সার্ণবা পৃথিবী (কাহারও একার নয়)—হস্তী হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সকল জীবেরই সমভাবে বাস-স্থান বিবেচনা করিয়া পরমানন্দিত হইতেন, সংসারে প্রবেশ করিয়াই তিনি আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার বিত্ত, আমার বিভব, আমার ভূমি, এইরূপ 'আমার, আমার' করিয়া ক্ষেপিয়া উঠেন।

সাংসারিক মায়া এইরূপ অহংবুদ্ধি প্রদান করিয়া আপনি স্থিরভাবে মনুষ্যগণকে পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু যখন মনুষ্য সংসারের অলীক সুখ নামক দুঃখে প্রতারিত হইয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিতে থাকেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই জ্বালাময় সংসার অতীব যন্ত্রণাকর স্থান; তখন তাঁহার সংসারে আর প্রবৃত্তি থাকে না, তখন তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, যে, জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্য কেবল সংসারে কষ্ট ও যন্ত্রণার ক্রোড়ে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ও পাপ-তাপের অগ্নিময় ঝটিকা মনুষ্যসমাজকে সর্ব্বদা কাতর করিয়া রাখিয়াছে।

তবে কি জগতে সুখ নাই ?—সুখ আছে। সুখ স্বর্গীয় বস্তু, সকলের ভাগ্যে ঘটে না ;—আত্মাদরই সুখের মূলোচ্ছেদক, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনই স্থায়ী সুখের মূল। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্ম-প্রিয়, তাহারাও সংসারী হইয়া স্ত্রী-পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী হইয়া থাকে। স্ত্রী-পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে বলিয়াই সুখী হইয়া থাকে। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইতে পারিত না। অনেকেই সুখের জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন কেহ কখনই সুখী হইতে পারেন নাই। আত্মপ্রিয়তা পরিত্যাগ ও পরের জন্য আত্মবিস-র্জ্জনই জগতে নির্ম্মল সুখ। যখন সংসারী ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র মাত্রকেই ভাল বাসিয়া অর্থাৎ তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী হইয়া থাকেন, তখন সংসারের যাবতীয় মনুষ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে ভাল বাসিলে না জানি কত সুখের উদয় হইতে পারে ? এই নির্ম্মল নিত্য সুখের দিন কি একদিন হইবে না ? একদিন অবশ্যই হইবে ! কত দিনে হইবে—কে বলিতে পারে ?

গিরিজায়ার গীত।

গিরিজায়ার চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে তাহার মনোমুগ্ধকর মধুর সঙ্গীতের আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমরা পাঠকবর্গের নিকট প্রতিশ্রুত আছি।* তদনুসারে আজি তাহার শেষ গীতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।—মাধবাচার্য্য প্রমুখাৎ হৃষীকেশ কর্ত্তৃক কুলটা অভিযোগে মৃণালিনীর গৃহবহিষ্কৃতা হওয়ার সংবাদ শ্রবণে হেমচন্দ্র যখন ক্ষোভে, দুঃখে, মর্ম্মপীড়ায় ম্রিয়মাণ, গিরিজায়া তখন মৃণালিনীর পত্র লইয়া তৎসমক্ষে সমুপস্থিত। হেমচন্দ্র কুলটার পত্র ভ্রমে তাহা, পাঠ করা দূরে থাকুক, খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন,—অধিকন্তু, গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। গিরিজায়া অগত্যা প্রত্যা-গমন পূর্ব্বক মৃণালিনী সন্নিধানে সমস্ত জ্ঞাপন করিল। মৃণালিনীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ;—তিনি তৎশ্রবণে কোন উত্তর করিলেন না, কাঁদিতেও পারিলেন না। তাঁহার আকার দেখিয়া গিরিজায়া ভাবিল, মৃণালিনীর সুখের তারা ডুবিয়াছে ; সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সে পুষ্করিণী-সোপানে গিয়া উপবেশন করিল এবং তাহার স্বভাবসুলভ দিগন্তস্পর্শী মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

* সাহিত্য-সেবক। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ৯৮ পৃষ্ঠা।

"পরাণ না গেল।
যো দিন দেখনু, সই, যমুনা কি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর, পিয় সই, কাহে কালো নীরে
জীবন না গেল?
ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই, পিয় সই, কাহে লো পরাণী
তখনই না গেল?
শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে,
যব্ শুনন্ লাগি, সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেল?
ধায়নু, পিয় সই, সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি, সই, শ্যাম-পদ-মূলে,
সোহি পদমূলে রই কাহে, লো, হামারি
মরণ না ভেল?"

আর বাঁচিয়া সুখ কি? জীবনে আর প্রয়োজনই বা কি? যাহার জন্য জীবন, সে যদি ত্যাগ করিল তবে আর জীবনে কাজ কি? হেমচন্দ্র যদি ত্যাগ করিলেন, তবে আর মৃণালিনী কাহার মুখ চাহিয়া প্রাণ ধারণ করিবে? জীবনের যে ধ্রুব নক্ষত্র, সে যদি ডুবে তাহা হইলেই জীবন অন্ধকার—অন্ধকারময় জীবন রাখিয়া কোন ফল নাই; উহা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। জীবনের সমস্ত সুখ, আশা, ভরসা যে একমাত্র প্রণয়-কেন্দ্রীভূত, সেই প্রণয়ের মূলেই যদি কুঠারাঘাত হইল তবে আর তদাশ্রিত জীবন-লতা কি অবলম্বনে তিষ্ঠিবে? কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে,

"পরাণ না গেল।"

প্রণয় গেল—প্রাণ গেল না। শ্যাম সরিল, কিন্তু রাধিকা মরিল না। জীবনের যেটুকু জীবনী সেটুকু গেল, কিন্তু জীবন গেল না। হায়! কেন গেল না!

"যো দিন দেখনু, সই, যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহিপর, পিয় সই, কাহে কালো নীরে
জীবন না গেল।"

যখন অতি দুঃখের সময়, জীবন যখন দুর্ব্বিবহ ভার বলিয়া মনে হয়, তখন সুখের দিন স্মৃতিপথে উদিত হইয়া কষ্টের উপর যন্ত্রণা যোজনা করে; একে ত বিষের জ্বালায় প্রাণ জর-জর, তাহার উপর অতীত সুখস্মৃতির বৃশ্চিক দংশন—

মর্ম্মান্তিক যাতনা, অসহ্য বেদনা। উপস্থিত দুঃখের ভার কোন প্রকারে বহন করিতে পারা যায়, কিন্তু গত সুখের স্মৃতির কষাঘাত সহ্য হয় না—তাহারই তাড়নায় আরও মরিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষের এমনই স্বভাব, সুখের দিকে মানুষের এতই আকর্ষণ যে, দুঃখের সময়ে না মরিয়া সুখের সময়ে মৃত্যু হইল না কেন বলিয়া অনুতাপ করে। সেই জন্য শ্যাম-বিরহে শ্রীমতী রাধিকা এই আক্ষেপ করিলেন যে, যমুনার তীরে যখন ব্রজবল্লভকে ধীরে ধীরে নাচিতে গাইতে দেখিলেন তখন কেন তাঁহার মৃত্যু হইল না,—সেই কাল জলে কেন তাঁহার জীবন-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল না! মৃত্যুর ইহা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্ট সময় কখন? সম্মুখে সৃষ্টির মায়া-রূপিনী অতলস্পর্শ কৃষ্ণসলিলা যমুনা, মাথার উপর মনুষ্যজীবনের সঙ্কীর্ণতা পরিজ্ঞাপক অনন্ত নীলাকাশ, আর সম্মুখে অনন্ত প্রেমাধার স্বয়ং প্রেমময় শ্রীহরি—এমন সুসংযোগে যে মরিল না তাহার আবার মরিয়া সুখ কি? যখন ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তত্ব অনুভূত হয়, যখন অনন্ত প্রেমের ছায়া বিশ্বসংসারের উপর ছড়াইয়া পড়িতে দেখি, তখন ইচ্ছা করে যে, ধীরে ধীরে আপনার অস্তিত্ব সেই অনন্তে মিশাইয়া দিই। অনন্তের দিকে মনুষ্যের আকর্ষণ স্বাভাবিক বলিয়া যাহা মহান্, যাহা অনন্ত, তাহা দেখিলে স্বতঃই মনে কেমন এক অব্যক্ত আনন্দোদয় হয়। সে আনন্দের সময়ে মরণে ভয় হয় না, সে সময়ে আপন ক্ষুদ্রত্ব অনুভূত হয়, আর ইচ্ছা করে যে এই ক্ষুদ্র জলবিম্ব অনন্ত সাগরে মিশাইয়া দিয়া অনন্ত আনন্দ উপভোগ করি। কিন্তু হায়! শ্রীরাধিকার ভাগ্যে সে আনন্দ ঘটিলনা—মৃণালিনীর ভাগ্যেও নহে! সেই যমুনার তীর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইল!

"ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই, পিয় সই, কাহে লো পরাণী
তখনই না গেল?"

ভাল, শ্যাম সাক্ষাতে যমুনার অগাধ সলিলে মরণ হইল না,—শ্যাম-প্রেমে আত্মহারা হইয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, উচ্ছ্বসিত হৃদয় বেগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নেত্রাসারে অঞ্চল ভিজাইলাম, তখনই না হয় মৃত্যু হউক; কিন্তু এমনই পোড়া অদৃষ্ট যে তাহাও হইল না! যমুনা-পুলিনে শ্যামের চরণে বিক্রীতা হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আন্তরিক না হউক, বাহ্য সংসার বন্ধন রহিয়াছে; সুতরাং ঘরে না আসিয়া যাই কোথা? যাইতে পারিতাম—যদি শ্যামসুন্দর চরণে স্থান দিতেন, শ্যামের সঙ্গে যাইতাম—যদি তিনি লইয়া যাইতেন।

কিন্তু মন লইয়াই তাঁহার কাজ, আত্মারই সহিত তাঁহার সংযোগ; সুতরাং এ দেহ লইয়া আবার গৃহে আসিতে হইল। গৃহে আসিয়া কাহারও সহিত কোন কথা কহিলাম না।—দুঃখে, নৈরাশ্যে, কাতরতায় কথা কি বাহির হয়, না কহিতে ইচ্ছা করে? কথা কহিতে পারিলে আপনার সুখ বা দুঃখের ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায় না। শ্যাম-সোহাগিনী শ্রীরাধিকার শ্যাম-বিরহ-কাতরতার তীব্রতা কতক মন্দীভূত হইলে তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। যতক্ষণ আকাশে ঘোর কাল মেঘ ততক্ষণ প্রকৃতি স্তম্ভিত থাকে, একটুও বায়ু বহে না, গ্রীষ্মাতিশয্যে লোকে ত্রাহি ত্রাহি করে; কিন্তু বর্ষণ আরম্ভ হইলে আর সে ভাব থাকে না,—কাঁদিতে পারিলে আর দুঃখের ভরা বিশেষ ভারি বোধ হয় না। যে কাঁদিতে জানে সে আপনার দুঃখ বুঝে, সংসারের দুঃখও বুঝিতে পারে; আর যে কখন কাঁদে না, সে চিত্তবিজয়ী বীরপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার চরণে আমাদিগের দূর হইতে নমস্কার! চিত্ত সংযম করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাধিকার বস্ত্রাঞ্চল ভিজিয়া গেল, কৃষ্ণপ্রেমে যে কি সুখ, কি আনন্দ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন—এই সময়ে যেমন বুঝিলেন তেমন আর কখন বুঝিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। প্রিয়জন-বিরহে লোক যখন কাঁদে তখনই তাহার প্রিয়ত্বের পরিমাণ বুঝা যায়, এবং সেই শোকের ভিতর হইতেও কি এক অব্যক্ত আনন্দ নিঃসৃত হইয়া প্রশান্ত মূর্ত্তিতে তাহার হৃদয়কে সান্ত্বনা প্রদান করে। রাধিকার যখন এই অবস্থা তখন অন্তরে বাহিরে শ্যামরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিবিল না কেন? তদপেক্ষা মৃত্যুর আর উপযুক্ত সময় কখন? সে সময়ে মৃত্যু হইল না। আবার একটা উপযুক্ত সময় বৃথা বহিয়া গেল—

"শুনয়ু শ্রবণ পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে,
যব্ শুনন্ লাগি, সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেল?"

রাধিকা যখন জানিলেন যে, তিনি যেমন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, কৃষ্ণও তেমনই তাঁহাতে অনুরক্ত, তিনি যেমন কৃষ্ণহারা হইয়া পাগলিনী, কৃষ্ণও তেমনই তাঁহার অনুসন্ধানে দিশেহারা, তখন কি সুখের সময়! গিরিজায়ার মুখে হেমচন্দ্র যখন গাইয়াছিলেন—

"মথুরাবাসিনী মধুর হাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে।"

সেদিন মৃণালিনীর কি সুখের দিন! কিন্তু সে দিন মৃত্যু হইল না। সুখের সময়ে কি মানুষ মরিতে পারে? যে সুখের মুখ দেখিয়াছে সে আরও সুখের

আশা করে; সুতরাং তখন মরিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখে যে সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত না হইয়া দুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার যখন গত সুখের স্মৃতি সেই দুঃখের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, তখন তাহার পরিতাপ হয় যে, সেই গত সুখের সময়ে মরিলাম না কেন, এ দারুণ দুঃখের মুখ দেখিতে বাঁচিয়া রহিলাম কেন? আর সেই গত সুখ কি সামান্য সুখ? প্রণয়ের প্রথম পাঠ পড়িবার সময়ে প্রণয়িণীর মুখে প্রণয়ীর নাম বা তাহার সম্বন্ধে আলোচনার তুল্য সুমধুর, চিত্তোন্মাদকারী, কি-জানি-কেমন ভাবের উত্তেজক সংসারে, বুঝি, আর কিছু নাই। প্রণয়ীর পক্ষে যে নিয়ম, প্রণয়িণীর পক্ষেও সে নিয়ম সত্য, কিন্তু রাধিকার পক্ষে তাহারও অধিক; কেন না, শ্রীকৃষ্ণের অনেক রাধিকা আছে এবং থাকাও সম্ভব, কিন্তু রাধিকার এক শ্যাম ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই শ্যাম যখন প্রকৃতি রাজ্যের পরম রমণীয় বিপিনের মধ্যে "রাধে, রাধে, রাধে, রাধে" বলিয়া বংশীধ্বনি করিলেন, তখন রাধিকার অন্তরে যে আনন্দলহরী খেলিতে লাগিল তাহা কেবল অনুভূতির সামগ্রী, বর্ণনার নহে। যাঁহাকে জীব জন্ম জন্ম ডাকিয়া পায় না, আবার ভক্তিভাবে একবার ডাকিলে মহাপাপী পবিত্র হয়, সেই প্রেমময় স্বয়ং হরি বংশীরূপী গোলোকধামের সপ্ত ছিদ্ররূপী সপ্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া 'রাধে' স্বরে চারিবার ডাকিয়া—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ দিতে চাহিতেছেন। ইহা কি সামান্য সৌভাগ্য? ইহা কি সামান্য সুখ? কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, কি পরিতাপ, যে এই সৌভাগ্যের সময়ে, এমন সুখ-সম্ভোগ করিতে করিতে, শ্যামের বাঁশীতে 'রাধা' নাম শুনিতে শুনিতে, মরিলাম না! সুখের মৃত্যু সকলের ভাগ্যে ঘটে না—বহু পুণ্য সঞ্চয় ব্যতিরেকে ঘটে না। শ্যাম-সোহাগিনী থাকিতে থাকিতে, শ্যামের বাঁশীতে রাধা নাম শুনিতে শুনিতে, রাধিকার মৃত্যু হইল না। কেবল তাহাই নহে—

"ধায়নু, পিয় সই, সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি, সই, শ্যাম পদমূলে,
সোহি পদ-মূলে রই কাহে, লো, হামারি
মরণ না ভেল?"

যমুনার কূলে যেখানে সংসার স্থলের শেষ সীমা তথায় বসিয়া শ্যাম-সুন্দর বাঁশী বাজাইলে আর কি কৃষ্ণপ্রণয়িনী সংসারগৃহে থাকিতে পারে? অগ্নি সংযোগে কামানের মুখ হইতে যেমন গোলা ছুটে তিনিও তেমনই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়েন। কিসের ছাই মায়া বন্ধন, কিসের ছাই সংসারধর্ম্ম,—শ্যামের বাঁশী শুনিলে আর গৃহে থাকা যায় না। সংসারে, যাহা কিছু প্রিয়, শ্যাম-

প্রেমের জন্য সমস্ত ত্যাগ করা যায়, এমন কি স্বামী পুত্র পর্য্যন্ত ত্যাজ্য। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাধিকা গৃহাভ্যন্তরে রুদ্ধ থাকিতে পারিলেন না, যমুনা-কূলে ছুটিয়া গেলেন এবং প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্যামের চরণে লুণ্ঠিতা হইলেন। কি সুখের সমবায়! কি সৌভাগ্যের সম্মিলন! যিনি অনন্ত প্রেমের উৎস, যিনি স্বয়ং প্রেমময়, যাঁহার প্রেমে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা, তাঁহার চরণপ্রান্তে প্রেমময়ী রাধা! এই খানে সাধ্য ও সাধকের, প্রেম ও প্রেমিকের পূর্ণ সংযোগ! কিন্তু ইহাতেও একটু দূরত্ব আছে। এ সংযোগে এখনও পূর্ণরূপে আত্মায় আত্মায় সংযোগ হয় নাই, এখনও কতকটা অস্থি-মজ্জা-শোণিতের সংস্পর্শ রহিয়াছে। যাহাতে সেইটুকু গিয়া কেবল আত্মায় আত্মায় সংযোগ হয়, সেই জন্য সেই চরণস্পর্শ করিয়া, সেই চরণপ্রান্তে অবস্থিত থাকিতে থাকিতে অস্থি-মজ্জা-শোণিতের বিনাশ আবশ্যক, অর্থাৎ মৃত্যুর প্রয়োজন। যখন শ্যাম সাক্ষাৎ পাইয়াছি, শ্যামের চরণতলে স্থান লাভ করিয়াছি, চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতে পারিয়াছি 'আমাকে চরণে স্থান দাও', তখন ভক্তির ভগবান তাহাতে আর কি বঞ্চিত করিতে পারেন? সে সাধ্য তাঁহার নাই; তবে আমার পক্ষে একটু কর্ত্তব্য— এই জড়দেহ ত্যাগ করা। এ সময়ে নহিলে আর কখন্ তাহা ত্যাগ করিব? ইহা অপেক্ষা সুসময় আর কবে হইবে? কিন্তু 'ত্যাগ করিব' বলিলেই কি দেহ ত্যাগ করা যায়? কর্ম্ম-বন্ধন যত দিন প্রবল থাকে, তত দিন কাহার সাধ্য সে কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ ত্যাগ করে? কালবশে তাহার মৃত্যু হইবে সত্য, কিন্তু যে বীজ সে রোপণ করিয়া যাইবে, তাহার ফলে আবার পুনঃ পুনঃ তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হইবে। রাধিকার এখনও সংসারে কার্য্য রহিয়াছে; সুতরাং মৃত্যু হইবে কেন? অদৃষ্টের এখনও ভোগ রহিয়াছে, তাই মৃত্যু হইল না। যখন আক্ষেপ করিতেছেন, যখন কাঁদিয়া বলিতেছেন 'সেই সময়ে মৃত্যু হইল না কেন', তখন সেই কর্ম্মভোগের সময়। হেমচন্দ্র আজ মৃণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন,—যে হেমচন্দ্রের জন্য তাঁহার জীবন ধারণ করা, তিনিই যদি ত্যাগ করিলেন তবে আর কাহার জন্য জীবন? এখন তাঁহার জীবন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু জীবন যদি ত্যাগ করিতেই হইল তবে আজ এই দুর্দ্দিনে ত্যাগ করা অপেক্ষা যখন হেমচন্দ্রের আদরের আদরিণী ছিলেন তখন ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল হইত। তাই আক্ষেপ—,

"সোহি পদমূলে রই কাহে, লো, হামারি
মরণ না ভেল?"

আমরা আবার বলি, ধন্য পর-চিত্ত-পরিজ্ঞাতা ভিখারিণী বালিকা গিরিজায়া! ধন্য কবির সংযোগ! আর ধন্য সেই সাহিত্য, যাহাতে এই স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়াছে!

ধর্ম্ম-সমন্বয়।

(২)

ধর্ম্ম ও সমাজ।

"ত্রয়ীঃ সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীণাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজু-কুটিল-নানা-পথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

প্রকৃত ধর্ম্ম কি?—এ সম্বন্ধে অসংখ্য বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্ট-জগতের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টের শরণাপন্ন না হইলে পারলৌকিক পাপপুণ্য বিচারের দিনে অব্যাহতি লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবার কোরাণ অবজ্ঞাপূর্ব্বক অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা করিয়া কাফেরগণ স্বর্গলাভ করিবে, মুসলমানগণের নিকট এ কথা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। ফলতঃ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-মুসলমান—প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং তদ্ভিন্ন অপর সমুদয় ধর্ম্মকে অপধর্ম্ম সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কোন্‌টী প্রকৃত ধর্ম্মপদবাচ্য এবং কোন্‌টী ধর্ম্মের ব্যভিচার, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

স্বধর্ম্ম বিস্তারার্থ মানুষ মানুষের উপর যে রূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও অবিচার করিয়া আসিতেছে, তাহা দেখিলে আপাততঃ বোধ হয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বুঝি পরস্পর বিপরীত পথে বিচরণ করিতেছে,—তাহাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধ্যান, ধারণা—সমস্তই বুঝি পরস্পর বিরোধী,—এক ধর্ম্মাবলম্বী যাহা সত্য বলিয়া মস্তকে ধারণ করিতেছেন, অন্যধর্ম্মাবলম্বী বুঝি তাহাই অসত্য বলিয়া পদদলিত করিতেছেন! কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে ধর্ম্মপ্রণালী বা ধর্ম্মের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকিলেও, বিভিন্ন নামধেয় সকল ধর্ম্মেরই মূল তথ্য এক, সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণই একই উদ্দেশ্যে একই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য একই প্রকারের ধ্যান বা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন। সকল ধার্ম্মিকেরই মত এই যে, একমাত্র অনাদি অনন্ত

সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতা, তিনিই মানবের এক মাত্র উপাস্য। সেই ন্যায়বান মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাতেই সংসারের সমস্ত ঘটনারাজি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তিনি পাপের দণ্ডদাতা ও পুণ্যের পুরস্কারকর্ত্তা, পবিত্রপথে থাকিয়া যিনি তাঁহাকে সরলপ্রাণে একাগ্রমনে ডাকেন তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। হিন্দুর ঈশ্বর ও মুসলমানের ঈশ্বর ভিন্ন নহেন, এবং যিনি শ্বেতাঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তা, কৃষ্ণাঙ্গেরা তাঁহারই সন্তান। হিদেনগণ (Heathens) যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য নানাপ্রকার উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই ন্যায়বান দয়াময়ের বিচারে মুক্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্টানমণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুতরাং, ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধের নাম যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, মানবমাত্রেরই একধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

কিন্তু মানবমাত্রের এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম হইলেও তাহাদের ধর্ম্মপ্রণালী পরস্পর স্বতন্ত্র। যেমন বিভিন্ন দিগ্‌প্রবাহিণী স্রোতস্বিনী সমূহ এক মহাসমুদ্রে পতিত হইবার জন্য উৎপত্তিস্থান অনুসারে সরল বক্র ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন করে, মনুষ্যগণও তদ্রূপ এক ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপায় বা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে, এবং সেই সকল প্রণালীই হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই কথাটী একটু পরিষ্কাররূপে বুঝা আবশ্যক।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এমনি সুকৌশলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন যে, জগতের অসংখ্য পদার্থের মধ্যে কুত্রাপি ঠিক একাকৃতি দুইটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থূলদৃষ্টিতে দুইটী পদার্থে কোন পার্থক্য উপলব্ধ না হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। সুদূর গগনস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের চক্ষে একরূপ প্রতিভাত হইলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পার্থক্যই জ্ঞানের উপাদান। প্রত্যেক পদার্থেরই একটী বিশেষত্ব আছে, যাহার অস্তিত্ব তদিতর অন্য পদার্থে অসম্ভব, এবং এই বিশেষত্বই তাহাকে অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। বস্তুতঃ ইহার অভাবে দুইটী বস্তু 'দুইটী' বস্তু হইতে পারে না, 'এক' হইয়া যায়। দুইটী পদার্থের কল্পনা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য রাখিতেই হইবে। এই জন্যই জগৎ এত বিচিত্র, অথবা এই বৈচিত্র্যের অপর নামই সৃষ্টি।

শারীরিক আকৃতি সম্বন্ধে যাহা সত্য, মানসিক ভাব সম্বন্ধে তাহা আরও অধিক পরিমাণে সত্য। দুইটী মানুষ যেমন একাকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারে না, তাহাদের চিন্তাশক্তিও তদ্রূপ সমান হইতে পারে না। কোন দুইজন ব্যক্তির কোন বিষয়ের ধারণা যে ঠিক এক হইতে পারে না, মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমাত্রই ইহা স্বীকার করিবেন। এমন কি, তুমি যে সূর্য্য দেখিতেছ আমি সেই সূর্য্য দেখিতেছি না, সূর্য্যদর্শন ক্রিয়া তোমার মনে যে ভাব উৎপাদন করিতেছে, আমার মনে ঠিক সেই ভাব জন্মাইতে পারিতেছে না, অর্থাৎ তোমার সূর্য্য-দর্শন ও আমার সূর্য্য-দর্শন ঠিক এক নহে, তবে উভয়ের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে এবং উভয়কেই এক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তদ্রূপ তোমার আকৃতি ও আমার আকৃতি বিভিন্ন হওয়া সত্বেও উভয়েই মানব।

বহিরিন্দ্রিয়গোচর জড় পদার্থের ধারণা সম্বন্ধে যদি বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তবে বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর চিন্ময় পদার্থের ধারণা সম্বন্ধে আরও অধিকতর পার্থক্য হইবার কথা। জগদীশ্বর সম্বন্ধে ধারণাও তাহা হইলে আমাদের দুই জনের ঠিক এক হইতে পারে না। অনন্তশক্তিশালী ভগবান অনন্তরূপে অনন্তপ্রাণীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেছেন। তুমি তাঁহাকে যে রূপে দেখিতেছ—আমি তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে দেখিতে পারি না এবং আমি তাঁহাকে যে ভাবে ভাবিতেছি—তোমার পক্ষে তাঁহাকে ঠিক সেই ভাবে ভাবা অসম্ভব. সুতরাং তোমার উপাসনা ও আমার উপাসনা এক হইতে পারেনা। তোমার ধৰ্ম্ম ও আমার ধৰ্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন। এই রূপ সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে জগতে যত মানুষ তত ধৰ্ম্ম।

এখন কোন্‌টী সত্য?—তোমার ধৰ্ম্ম সত্য, আর ত্বদিতর ব্যক্তি মাত্রেরই ধৰ্ম্ম মিথ্যা? পরমেশ্বর কেবল তোমাকেই মুক্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন এবং অপর সমুদয় মানবকে ভ্রান্ত পথ দেখাইয়া প্রতারিত করিতেছেন? তুমিই ভগবানের প্রিয়তম পুত্র—অথবা একমাত্র পুত্র?—এবং অন্য সব ক্রীড়নক? তাহা হইলে তুমি মানবমাত্রকে সংগ্রামে নিহত করিয়া জোয়ান ফণ্ডাজিদের সেল্‌কার্কের মত এ সংসারে একাধিপত্য করিতে পার! কিন্তু মনে রাখিও, সকলেই এরূপ মনে করিতে পারে এবং প্রত্যেকেই অন্য লোকদিগকে বিনষ্ট করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার চেষ্টা করিতে পারে। অবশ্য যাহার শক্তি অধিক সে-ই এ সংগ্রামে জয় লাভ করিবে এবং অসি-শক্তিতে তাহার ধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিবে। ঐশীশক্তি অসংখ্য ভ্রান্ত মানব সৃষ্টি করিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে একটী অভ্রান্ত মানবের অসিশক্তি

মানবমণ্ডলীকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সেই ভ্রম সংশোধন করিল!—ভ্রান্ত সৃষ্টি লয় করিয়া তবে প্রকৃত সৃষ্টি হইল!—সৃষ্টি-সংহারে এইরূপ অভিনব যুক্তিপ্রণালীর অবশ্যম্ভাবী উপসংহার হইল!

এইরূপ যুক্তি সত্য হইলে, যে ধর্ম্ম কর্ত্তৃক জগৎ সুরক্ষিত হয় বলিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী ধার্ম্মিকগণ বলিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের জন্যই সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়—মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। বলিতে পার, সংসার বিনষ্ট হয় হউক ক্ষতি নাই, সত্যের জয় হউক, পৃথিবীতে যেন অপধর্ম্ম রাজত্ব না করে। সত্য কথা। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, তুমি কি আজীবন ঠিক একটী মত পোষণ করিয়া আসি-তেছ? তোমার মতের কি কখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে তোমার কোন্ মতটী সত্য এবং কোন্গুলি অসত্য? —কোন্টীর জন্য তুমি দেবপদবাচ্য এবং কোন্ গুলির জন্য, তোমার যুক্তিপ্রণালী অনুসারে, অধার্ম্মিক বলিয়া বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত? তুমি যখন পরিবর্ত্তনশীল মানব, তখন জীবন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার মতের ও ভাবের পরি-বর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বলিয়া গিয়াছেন;—"এক ঈশ্বরেতে অসংখ্য ভাব। এক নিরাকার ঈশ্বর, কিন্তু তাঁহার কার্য্যরীতি ও ভাবের প্রকাশ অসংখ্য। হরি এক, হরিলীলা বিচিত্র।" "তুমি যদি তেত্রিশ কোটী দিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে পার তাহা হইলে তোমার প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের এক এক নূতন রূপ দেখিতে পাইবে।" কোন দিন জ্ঞান রূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, কোন দিন তাঁহাকে শক্তিরূপে পূজা করিবে, কোন দিন বা তাঁহার জগদ্ধাত্রী জননীরূপ নিরীক্ষণ করিয়া 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবে এবং তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। এইরূপে কখন বা তাঁহাকে দয়াময় রূপে, কখন বা প্রেমময় রূপে, কখন বা আনন্দময়রূপে দেখিয়া জীবন সার্থক করিবে। "ধন্য তাঁহারা যাঁহারা একেতে তেত্রিশ কোটী এবং তেত্রিশ কোটিতে এক অনুভব করেন।" "যদি এক ব্রহ্মেতে তোমরা অসংখ্য মূর্ত্তি না দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পাও নাই।" "ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি বিচিত্র লীলারসময় ও অসংখ্য রূপধারী, সুতরাং তোমর ভাবও এক প্রকার হইতে পারে না।" আজ তুমি যে ধর্ম্মমত অসত্য বলিয়া উপহাস করিতেছ, এবং অধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে উৎকট যন্ত্রণা দিয়া প্রাণ বিনষ্ট করিতেছ, কে জানে, কাল সেই তুমিই সেই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে পার।

ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। সেণ্টপলের জীবনচরিত পাঠ করিয়া দেখ। তিনি প্রথমে সল নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম ভ্রান্ত, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অপধর্ম্ম প্রচার করিয়া সরলপ্রাণ লোকদিগের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছে—তাহাদের নরকের পথ উন্মুক্ত করিতেছে। এই বিশ্বাসবশে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠেন এবং নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য প্রকারে তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রাণ বিনাশ করিতে থাকেন। কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র লীলা!—একদা ডামস্কাসে যাইতে যাইতে সলের মনে নূতন ভাবের উদয় হইল, তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং তদ্দণ্ডেই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার প্রধান প্রচারক হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন— "I was before a blasphemer, and a persecutor and injurious. "I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Which things I also did in Jerusalem." কিন্তু পরিশেষে ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনে তিনি রোমসম্রাট নিরোর আদেশক্রমে হস্তপদবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং অল্পদিন পরেই তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়। সলরূপে তিনি যে ধর্ম্মপ্রচার নিবারণার্থ কত নিরপরাধ নর-নারীর জীবনান্ত করিয়াছিলেন, পলরূপে সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিদ্বেষ্টাদের অমানুষিক অত্যাচারে অত্যাচরিত হইয়া প্রাণদানে পূর্ব্বকৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সেণ্ট পল ব্যতীত আরও অনেকের এই দশা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিস্তৃতি এখানে অনাবশ্যক। জীবনে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের প্রমাণ প্রদর্শনই এ স্থলে আমাদের উদ্দেশ্য।

এখন দেখা গেল, তোমার জীবনে মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে এবং তোমার একটী মত সত্য হইলে অপরগুলিকে মিথ্যা বলিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তোমার সকল মতই সত্য—তোমার নিকট সত্য। যে সময়ে যাহা তোমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই সেই সময়ের জন্য তোমার নিকট সত্য—অন্য সময়ে নহে বা অন্যের নিকটে নহে। সেইরূপ আমার বিশ্বাস—আমার ধর্ম্ম আমার নিকট সত্য। যে পর্য্যন্ত আমার ধর্ম্ম তুমি তোমার নিজের করিয়া লইতে না পারিবে, সেই পর্য্যন্ত তাহা তোমার নিকট সত্য হইতে পারে না—তোমার ধর্ম্ম হইতে পারে না। এইরূপে জগতে যত মানুষ তত ধর্ম্ম বিদ্যমান। মানুষ অপূর্ণ জীব,—সুতরাং পূর্ণ সত্য, পূর্ণ ধর্ম্ম, মানব-

জীবনে সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রকৃতিভেদে অবস্থানুসারে বিভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টি। সকল ধর্ম্মই সত্য, আংশিক পরিমাণে সত্য। তবে, কোনটী সরল, কোনটী বা বক্র—এই মাত্র। তাহাও আবার অধিকারীভেদে।

মানবের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, ভারতবাসীর সহিত ভারতবাসীর যত সাদৃশ্য, একজন ইংরেজের সহিত তাহার তত নহে, একজন আইস্‌লণ্ডবাসীর সহিত তাহার সাদৃশ্য আরও অল্প। দৈনিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এই-রূপ সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যই সমাজ বা ধর্ম্ম-সমাজ সংস্থাপনের মূল মন্ত্র। তোমার ও আমার মতের যেমন সাদৃশ্য আছে—অন্যের মতের সহিত তেমন নহে, সুতরাং তুমি ও আমি এক সমাজভুক্ত। কিন্তু তজ্জন্য তোমার মত ও আমার মত যে ঠিক এক তাহা নহে। তুমি ও আমি দুইজনে একত্র কাজ করিলে উভ-য়েরই উপকার হইবে, এই উদ্দেশ্যেই আমরা এক সমাজবন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং সমাজ ও ধর্ম্ম এক নহে, ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তার জন্যই সমাজের সৃষ্টি। ধর্ম্মভাব ঈশ্বরপ্রদত্ত, সমাজবন্ধন মনুষ্যকৃত। ধর্ম্ম সমাজকে শাসনে রাখিবে, সমাজ ধর্ম্মকে নহে।

ক্রোধ।

"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।"

--গীতা।

(ক্রোধের নিত্য লক্ষণ।)

রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেমন অন্ধ ছিলেন, ক্রোধও সেইরূপ অন্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ইহারও শত পুত্র আছে। হঠকারিতা, খলতা, প্রতিশোধেচ্ছা, কটুভাষা-প্রয়োগ, কলহ, মারামারি, যুদ্ধ প্রভৃতি ক্রোধের এক শত পুত্র। যাহার সহিত অতি কষ্টে যুদ্ধ করিতে পারা যায় তাহাকে 'দুর্য্যোধন' বলে এবং যাহাকে অতি কষ্টে শাসন করা যায় সে 'দুঃশাসন'। এই কারণে ক্রোধের পুত্রগণকে দুর্য্যো-ধন, দুঃশাসন প্রভৃতি নাম দেওয়াও অসঙ্গত নহে, কেন না অনেক ক্লেশ স্বীকার না করিলে তাহাদিগকে দমন করা যায় না।

ক্রোধের পুত্রগুলি বিকলাঙ্গ ও বিকলেন্দ্রিয়। খলতা প্রভৃতি যে সকল পুত্র সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করে, সাধুকে ধূর্ত্ত ও সতীকে কলঙ্কিনী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা ভগ্নপাদ; কেননা ন্যায় ও যুক্তিরূপ দুই পদের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে গেলেই তাহারা পড়িয়া যায়। যুদ্ধ, কলহ, বৈরনির্য্যাতন প্রভৃতি যাহারা হিতকথা শুনে না, তর্কযুক্তি মানে না, তাহারা বধির; কালার কর্ণে যেমন ঢাকের শব্দ প্রতিঘাত হয় বটে, কিন্তু সে শুনিতে পায় না, ইহারাও তদ্রূপ। আর হঠকারিতা প্রভৃতি যাহারা ভাল-মন্দ দেখে না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না, কেবল নিজের লক্ষ্য পথে দৌড়ায়, তাহারা অন্ধ—একটু অপেক্ষা করিয়া দেখ, অচিরাৎ গর্ত্তে পড়িয়া হস্ত-পদ ভাঙ্গিবে।

ক্রোধ অন্ধ বলিয়া কিছু দেখিতে পায় না—কেবল শুনে; বিচার করিতে জানে না—কেবল শাস্তি দিতে জানে, গুণগুলি ভুলিয়া গিয়া কেবল দোষই প্রকাশ করে, এবং তিলের মত দোষগুলিকে তাল করিয়া বর্ণনা করে। মনোযোগ করিয়া ক্রোধের ভাষা শুনিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অপরের নিন্দা করিবার সময় প্রায়ই সেই সঙ্গে নিজের প্রশংসা করিতে থাকে। কিন্তু বড় শব্দের সঙ্গে ছোট শব্দ হইলে যেমন লোকে ছোটটা ভাল শুনিতে পায় না, তেমনি ক্রোধের ভাষায় পরনিন্দার আধিক্যবশতঃ আত্মপ্রশংসাও সকলে লক্ষ্য করে না।

ক্রোধের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, যাহা ইচ্ছা করা হইয়াছিল, তাহা হয় নাই বলিয়াই ক্রোধ জন্মিয়াছে। এই কারণে ক্রোধকে লোভের পুত্র বলা যায়।

(ক্রোধ ব্যাধিবিশেষ।)

উৎকট রোগের মধ্যে ক্রোধকে গণনা করা অসঙ্গত নহে। উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি বায়ু রোগের ন্যায় ইহা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয় এবং সেই সময়ে রোগীকে জ্ঞানহীন করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় বাক্য কার্য্য ও হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ বিস্তর কুভাব ও কুচিন্তা নিঃসৃত হইয়া যায়। ক্ষয়কাশ রোগ যেমন বুকের অভ্যন্তরাংশ খাইয়া ফেলে ও সেই স্থান শূন্য করিয়া দেয়, ক্রোধও সেইরূপ মনের বিস্তর সুমতি নষ্ট করিয়া অন্তঃসারহীন করিয়া তুলে এবং বসন্ত রোগের বীজ যেমন রোগীর শরীর হইতে বাহির হইয়া সুস্থ দেহ আক্রমণ করে, ক্রুদ্ধের ক্রোধও তদ্রূপ কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ক্রোধের পাত্রকে ক্রোধান্বিত করিয়া তুলে।

আহারের পর এবং প্রত্যুষ কালে ক্রোধ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক নহে। কিন্তু ক্লান্ত উত্তপ্ত বা পীড়িত শরীর হইলে, অথবা বিরক্ত লজ্জিত বা লাঞ্ছিত মন হইলে, অল্প কারণেই ক্রোধ হয়।

ঊর্দ্ধদিকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে উহা যেমন নিজেরই উপর আসিয়া পড়ে, অপরের উপর ক্রোধ দ্বারাও তদ্রূপ নিজের ক্ষতি ও শত্রুবৃদ্ধি হয়। ধনীগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্রোধবশতঃ এক টাকা মূল্যের দ্রব্যের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করে; মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এমন দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি বিনীত হইয়া কার্য্য করিলে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিত, সে ক্রোধবশতঃ নিজের প্রভুকে "দশ কথা শুনাইয়া দিয়া" অথবা পরম আত্মীয়কে বিরক্ত করিয়া যাবজ্জীবন দুঃখ পাইতে থাকে। এক গ্রামে বা এক পল্লীর ভিতর বাস করিয়াও অনেকে পরস্পরের এমন শত্রু হয় যে, বিপদ-আপদে তাহারা একে অপরের কিছুই সাহায্য পায় না। এমন কি ক্রোধবশতঃ স্বগৃহেও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে কেহ কেহ শত্রু করিয়া তুলে, ইহাদেরই "যথারণ্যং তথাগৃহং।" কোন কোন ভাগ্যহীন ব্যক্তি ক্রোধের এত অধীন যে, ক্রুদ্ধ অবস্থায় নিজের গৃহস্থিত দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত নষ্ট করে।

(ক্রোধ রোগের চিকিৎসা প্রকরণ।)

রোগ প্রশমনার্থ রোগীর মনে ইচ্ছা সঞ্জাত হওয়া আবশ্যক। ক্রোধের সময় যে পশুবৎ অবস্থা হয় এবং তাহাতে নিজের ও অন্যের যে ক্ষতি হয় তাহা স্মরণ করিয়া যদি নিজের প্রতি ঘৃণা হয় তবেই চিকিৎসা হইতে পারে, নতুবা রোগ বিনাশের চেষ্টা করা বৃথা। দেশের রাজা ইহার 'হাতুড়ে' চিকিৎসক, কেননা কারাবাস প্রভৃতি যে সকল ঔষধ তিনি প্রয়োগ করেন, তাহাতে রোগের কিছু উপশম হয় বটে কিন্তু আমূল শান্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

উল্লিখিতরূপে আত্মগ্লানি জন্মিলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, "অদ্য সমস্ত দিবস কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিব না"। প্রতিজ্ঞা স্বত্বেও কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্ততঃ তাহাকে মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করা, নিতান্ত আবশ্যক। রাত্রিতে শয়ন কালে সমস্ত দিনের অনুষ্ঠিত কার্য্যের হিসাব করিয়া কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিলে তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হইবে।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করাই ক্রোধ দমনের উৎকৃষ্ট উপায় বা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কিন্তু ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা কি? উত্তপ্ত দুগ্ধ উথলিয়া উঠিলে তাহাতে

জোরে জল গণ্ডূষ নিক্ষেপ করিলে যেমন সেই দুগ্ধ নামিয়া যায়, তদ্রূপ ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলে মানসিক তেজ ও প্রতিজ্ঞার বলে তাহাকে সজোরে নামাইয়া দেওয়াকেই সহিষ্ণুতা বলে। ক্ষমা দয়ার নামান্তর মাত্র। ভৃগু-পদ-চিহ্ন ধারণের যে উপাখ্যান শুনাযায়,তাহার অর্থ এই যে, সহিষ্ণুতা স্বয়ং ঈশ্বরের উপযুক্ত গুণ।

মনুষ্য মধ্যে সক্রেটীস্ ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তাঁহার স্ত্রী বড় ব্যাপিকা ছিলেন; তিনি একদিন স্বামীকে কোন রূপে রাগাইতে না পারিয়া অবশেষে এক কলস ময়লা জল তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দেন। সক্রেটীস তাহাতে হাস্যমুখে বলিলেন "এত গর্জ্জনের পর যে বর্ষণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?" নিরন্তর চেষ্টা দ্বারা অনেক মহাত্মা এইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ক্রোধের জন্য আপনাকে আপনি শাস্তি দেওয়া একটী সুন্দর উপায়। একটী লোককে জানি, তিনি স্বীয় ক্রোধের দণ্ড দিবার জন্য ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনার গালে আপনি চপেটাঘাত করিতেন এবং নিজের কর্ণ নিজে মলিয়া দিতেন। ইহা বড় বীর হৃদয়ের কার্য্য। ক্রোধাসুর যখন অন্যের প্রতি আমাদের কোপ জন্মাইয়া দেয় ও মন্দ প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে, সেই সময় যদি তিতিক্ষা দেবীকে ডাকিয়া আনা যায় তবে উভয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধে। তিতিক্ষা দেবী বলিয়া তাঁহার দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রথম প্রথম ঐ অসুরের নিকট পরাজিতা হয়েন কিন্তু তাঁহার সহিত যখন অক্রোধ দেব আসিয়া যোগ দেন তখন তাঁহাদেরই জয় হয়।

ক্রোধের জন্য আপনাকে আপনি অর্থদণ্ড করাও মন্দ উপায় নহে। যে দিন কাহারও উপর ক্রোধ প্রকাশ করা হইল, সেই দিন আপনাকে যথাসাধ্য অর্থদণ্ড করিয়া ঐ অর্থ কাগজে মুড়িয়া, কাপড়ে বাঁধিয়া, বা অন্য কোন উপায়ে স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে হইবে। উহার সঙ্গে শাস্তির কারণ ও তারিখ লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়। এইরূপ দণ্ডদ্বারা যে অর্থ সঞ্চিত হইবে তাহা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। অর্থদণ্ডে দরিদ্রের যত উপকার হয়, ধনীর তদপেক্ষা বিস্তর কম উপকার হয়।

জিহ্বাই কটুভাষা উচ্চারণ করিয়া ক্রোধের সময় আমাদের প্রধান শত্রুতা সাধন করে, সুতরাং যদি ইহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। এইজন্য ক্রোধের সময় নীচের ওষ্ঠকে উপরের দন্তপাটী দ্বারা চাপিয়া ধরা উচিত। এইরূপ করিলে ক্রোধ বাহির হইতে না পাইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে সুবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আর

জিহ্বা কোন ক্ষতি করিতে পারে না। প্লেতো নামক যুনানী পণ্ডিত ইহা করিতেন। তিনি ক্রোধের সময় চুপ করিয়া থাকিতেন। একদিন এইরূপ অবস্থায় আছেন, এমন সময় একজন আত্মীয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্লেতো কি করিতেছ ?" তিনি বলিলেন "একটী লোক বড় রাগিয়াছে তাহাকে শাসন করিতেছি।"

ক্রোধের পাত্র যখন সম্মুখে উপস্থিত নাই তখন ক্রোধ দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ না করিলেই অনেক উপকার হয়। যদি কাহারও পত্র পাঠ করিয়া বা 'অমুক এই নিন্দা করিয়াছে' শুনিয়া ক্রোধ হয় তাহা হইলে পত্রের উত্তর দান প্রভৃতি সহসা না করিয়া উহা স্থগিত রাখিলেই ভদ্রলোকের রাগ অনেক সময়েই পড়িয়া যায়। 'অশুভস্য কাল হরণং' কথার সার্থকতা এত আর অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না।

পরস্পরের মনের কথা স্পষ্টরূপ বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। অনেক সময়ে ক্রোধ এইরূপে উৎপন্ন হয়। রাম একটা কথা সরল ভাবে বলিল, শ্যাম কিন্তু ঠিক তাহা বুঝিল না, সে ভাবিল রামের কোন কু-উদ্দেশ্য আছে। শ্যাম সে কথা স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল। রাম যদি তখন বুঝাইয়া দেয়, যে তাহার কোন মন্দ উদ্দেশ্য নাই, তাহা হইলে হয়ত আপদ শেষ হয়, কিন্তু রাম নিজের উপর সন্দেহ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। তখন শ্যাম ভাবিল 'আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছি তাহাই ঠিক, নতুবা এ বিরক্ত হইল কেন ?" এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যেই কলহ আরম্ভ হয়।

আবার পিতা,মাতা,স্বামী,স্ত্রী, ভাই, ভগিনী প্রভৃতির মধ্যে একজনের কোন ত্রুটী দেখিয়া অপরে দুঃখিত হয়েন বা অভিমান করেন। শিক্ষার অভাববশতঃ তাঁহারা হয়ত দুঃখ বা অভিমান উপযুক্তভাবে প্রকাশ করিতে না পারিয়া ক্রোধচিহ্ন প্রদর্শন করেন। এইরূপ স্থলে যাঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করা হইয়াছে তিনি বুদ্ধিমান হইলে স্বয়ং ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং যিনি ক্রোধ করিয়াছেন তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইবার সময় যদি মনে মনে একবার তাহার পক্ষ অবলম্বন করা যায়, যদি একবার ভাবিতে পারা যায় "ভাল, উহার পক্ষ হইয়া কিছু বলিবার আছে কি ?" তাহা হইলেই ক্রোধ কমিতে আরম্ভ হয় ; কেননা তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, উহার পক্ষেও অনেক বলিবার কথা আছে ; আমার ক্রোধ করিবার কারণ কিছুমাত্র নাই। এইরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক,"

কারণ আপনা অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকের উপরেই অনেক সময় ক্রোধ হয়,—উচ্চ শ্রেণীর লোকের উপর ক্রোধ হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে সাহস হয় না। যে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তির উপর ক্রোধ করিলাম তাহার পক্ষে কি বলিবার আছে তাহা না বিবেচনা করিয়া ক্রোধ করিলে যেন অবিচারে দণ্ড দেওয়া হয়। বিনীত ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি এরূপ স্থলে বিনয় ও কৌশলে সকল কার্য্য উদ্ধার করেন।

ক্রোধের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহাতে হৃদয়ে বল জন্মিবে ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বাড়িবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এই-রূপ করিতে হইবে। শীঘ্র কৃতকার্য্য না হইলে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিলে মাস কয়েক বা বৎসর কয়েক পরেই ক্রোধ অনেক কমিয়া যায়।

(ক্রোধের অনুকম্প।)

"যে আমার গুপ্ত দোষের কথা হাটের মধ্যস্থলে বলিয়া দেয়, বা ন্যায্য প্রাপ্য কাড়িয়া লয়, তাহাকে কিরূপে ক্ষমা করি? যখন দুর্ব্বল বা নিরীহের উপর প্রবল ও দুর্দ্দান্ত অত্যাচার করে, যখন প্রকাশ্যভাবে দুষ্কর্ম্ম করিয়া কেহ স্পর্দ্ধা করে, যখন কেহ ভদ্রস্বভাব ব্যক্তিকে কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে বা সাধারণের ক্ষতি করে, তখন তাহা দেখিয়া কিরূপে শান্তভাব অবলম্বন করি?" —এইরূপ প্রশ্ন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। ইহার উত্তর এই যে, বিচারপতি যেমন ক্রোধের চিহ্ন না দেখাইয়া শান্তভাবে বিচার করেন এবং শাস্তি দিবার প্রয়োজন হইলে আহ্লাদিত না হইয়া বরং দুঃখিত মনেই দিয়া থাকেন, তদ্রূপ প্রত্যেক ভদ্রলোকই ক্রোধোদ্দীপক কারণে রোষপরবশ না হইয়া শান্ত ভাবে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত উপায়ে দুষ্টকে শাস্তি দিবেন। মধ্যস্থ দ্বারা বিবাদ-নিষ্পত্তি, রাজদ্বারে অভিযোগ, সামাজিক শাসন প্রভৃতি উপায়গুলির যদি অপব্যবহার না হয় তাহা হইলে উহাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক উপায় অবলম্বন কালে জিঘাংসাকে ত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে হইবে।

নির্ব্বোধ লোক যে সকল বিষয়ে ক্রোধান্ধ হয় জ্ঞানীগণ তত্তৎস্থলে বহুপ্রকার উপায় অবলম্বন করেন। যথা তর্ক বা বিবাদের সময় কটু কথার উত্তরে কটু না বলিয়া হাস্যবদনে কটুভাষীকে উদ্দেশ করিয়া ব্যঙ্গ করিতে পারিলে শ্রোতৃগণ সকলেই ব্যঙ্গকারীর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং কটুভাষীও পরাস্ত হয়। পুনশ্চ,

ক্রোধের চিহ্ন দেখাইয়া অথচ যথার্থ ক্রোধ না করিয়া অশিক্ষিত লোককে অনেক স্থলে বশীভূত করা যায়। আবার ক্রোধের চিহ্ন না দেখাইয়া অথচ যথার্থ ক্রোধ করিয়া ভদ্রভাবে বিস্তর কার্য্যোদ্ধার করা যায়। মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল যে গবর্ণমেণ্টের এত শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, তিনি রাজকর্ম্মচারিদের অন্যায় দেখিলে ক্রোধ না করিয়া কেবল প্রবল যুক্তি দ্বারা তাহার অবৈধতা বুঝাইয়া দিতেন। বিবাদস্থলে বিরোধিদ্বয়ের মধ্যে যিনি কটুভাষা শুনিয়া মৌনী থাকিতে পারেন তিনিই জয়ী হয়েন, আর যে ক্রোধকে ব্যক্ত করে সেই পরাজিত হয়।

(ক্রোধজেতা নর-দেবতা)

মানুষের যত রিপু আছে তন্মধ্যে ক্রোধকে দমন করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রিপু। যে দিন মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে সেই দিনই ক্রন্দনাদি ক্রোধ-চিহ্ন দেখায় আর নবতি বৎসর বয়সে অন্তর্জলীর একটু পূর্ব্বেও অনেকে ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার পায় না। বড় বড় যোগীগণ কাম, লোভ, মোহ প্রভৃতি জয় করিয়াও সহসা ক্রোধের বশীভূত হইয়াছেন। দুর্বাসার ঐ বিষয়ে বড়ই দুর্নাম। দেবগণ ক্রোধান্বিত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়াছেন। ভীরুতা বশতঃ বা কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অক্রোধ অবলম্বন করা কঠিন নহে। কিন্তু কখনও কাহারও উপর ক্রোধ করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যিনি ইহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিবেন তিনিই দেখিবেন যে এই দুর্দ্দান্ত অসুরকে জয় করিতে বহু সময় ও বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে এবং এক সময় বোধ হইবে "হায়! আমার দ্বারা এই কার্য্য বুঝি হইল না।" কিন্তু ক্রোধ অজেয় নহে, সুতরাং এই পরিশ্রমের পুরস্কার যে দিন তিনি পাইবেন সেদিন তাঁহাকে নরদেবতা বলিয়া বোধ হইবে, তখন মনের এমন ক্ষমতা জন্মিবে যে "ভ্যাকুয়ম ব্রেক" নামক উপায় বিশিষ্ট রেলগাড়ি যেমন দ্রুত গতিতে চলিতে থাকিলেও চালক তাহা সহসা বন্ধ করিতে পারে,তদ্রূপ অতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হইলেও তাহাকে শীঘ্র রোধ করা যাইবে। জ্ঞান ও ধর্ম্মে যাঁহারা মনুষ্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন এই ভয়ঙ্কর রিপুকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়া সকলেই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। চৈতন্যদেব কত মহাকষ্ট সহ্য করিয়াও অক্রোধী থাকিতেন, তাহা এ দেশের অনেকেই জানেন। আনাস্ নামক মহম্মদের ভৃত্য বলিয়াছেন "আমি দশ বৎসর কাল তাঁহার নিকট ছিলাম, তিনি এই সময়ের মধ্যে একবার "আঃ" বলিয়াও

বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।" আর ঊনবিংশ শত বৎসর পূর্ব্বে পালেস্‌টাইন্ দেশে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় ক্ষমার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না। যখন তাঁহার মত-বিদ্বেষীগণ তাঁহাকে নিরপরাধে হত্যা করিতে লইয়া গেল তখন তাঁহাকে কেহ গালি দিল, কেহ বস্ত্র ছিঁড়িয়া দিল, কেহ চপেটাঘাত করিল, কেহ গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, কেহ পত্র ও কণ্টকের মুকুট পরাইয়া উপহাস করিল, কেহ বেত্রাঘাত করিল ও অবশেষে তাঁহাকে ক্রুশ নামক যন্ত্রে লৌহ বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। এই ঘোর যন্ত্রণার সময়েও তিনি, ক্ষণমাত্র বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন "হে পিতঃ! ইহাদের অপরাধ গ্রহণ করিও না; ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" এই অলোকসামান্য ক্ষমাগুণের পুরস্কার তিনি কি পাইয়াছেন?—আজি জগতের সভ্যতম জাতি সকল জানু পাতিয়া করজোড়ে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতেছে।

কবিতা-কুঞ্জ।

(১)

মানিনী।

কপটি! আবার তুমি এসেছ হেথায়?
চিনেছি তোমারে কালা,
স'য়েছি, অনেক জ্বালা,—
কত যে কেঁদেছি, সখা, মর্ম্ম-বেদনায়!
দিনান্তে একটী বার
সাধ শুধু দেখিবার—
অভাগিনী রাধা আর কিছু নাহি চায়;
তাও এত ভার যদি,
করি শ্যাম, এ মিনতি—
রাধিকার কুঞ্জে তুমি এস না-ক আর,—
এস না-ক মজাইতে মন অবলার!

কি লাগি' তোমারে, কালা, প্রেমময় কয়?
ক্ষীর ছাড়ি' নীরে আশা—
অদভূত এ পিপাসা!
মূরখ তোমার মত কেহ না-কি হয়?
আফুটো কমল ফেলি'
কেবল কিংশুক-কলি
আদরে হৃদয়'পরে তুলিয়া যে লয়,
তুমি সে অনধ অলি;
তাই ত তোমারে বলি—
নলিনীর বুক-পোরা মধু তব নয়,—
কেতকীর রূপে মুগ্ধ তোমার হৃদয়!

যাও তবে যাও, কালা,
আর বাড়া'য়োনা জ্বালা,
যাও যথা বাঁধা আছে হৃদয় তোমার;—
মধু বৃন্দাবন মাঝে
কত শত রাধা আছে,
(কিন্তু) রাধিকার তুমি বিনা কেহ নাহি আর।

যেথা যাবে যাও বঁধু,
এই আকিঞ্চন শুধু—
দিয়ে যেও দয়া করি' স্মৃতি টুকু তব;
আদর করিয়ে আমি
দিয়ে সেই স্মৃতি খানি
তোমারি মোহন মূর্ত্তি যতনে গড়িব,—
হৃদয়-আগারে তা'রে
বসাইয়ে উপচারে
নয়ন-আসারে নিত্য অর্চ্চনা করিব।

---

(২)

রমণী।

(কোন আত্মীয়ের অনুরোধে লিখিত।)

নিঝুম যামিনী মত প্রাণস্রোত অবিরত,
প্রবাহিত হ'তেছিল মলিন শোভায়।
ছিলনা উচ্ছ্বাসরাশ, বিমল জ্যোছনা-বাস,—
সৌন্দর্য্যের ছায়া কিছু ছিল না তাহায়॥
আকাঙ্ক্ষার উপবনে ফুটিত না ফুল্ল মনে
উৎসাহ, আশার কলি মলয় পরশে!
হৃদয়ের সরোবরে, সৌন্দর্য্য-মহিমা-ভরে,
হাসিত না কমলিনী অনন্ত হরষে॥
কোকিলের মধু তান মোহিত করিয়া প্রাণ
উঠিত না জীবনের ভবিষ্য আকাশে।
বসন্তের রাগচয়,— নিতি নব সুধাময়,—
ছিলনা ব্যাপিয়া তাহা স্বরগের হাসে॥
নীরস পলাশ সম হিয়া এই অনুক্ষণ
রসহীন ছিল সতী প্রকৃতি বিহনে।
প্রদোষের ম্লান ছায়া, আলোকের ভগ্ন কায়া,
উভয়ে মিশ্রিত ছিল জীবনের সনে॥
সহসা উঠিল ঊষা,— নব রাগ-বেশ-ভূষা,—
আলোকিত হ'ল হৃদি নব মহিমায়।
প্রকৃতি আসিল ধীরে, সৌন্দর্য্য লইয়া শিরে,—
হাসিল জগৎ তাহে পূর্ণ মদিরায়॥
সাধিয়া আপন স্বর শাখে বসি' পিকবর
আনন্দ-বিভোল মনে করিল ঝঙ্কার।
ফুটিল কুসুম-দল, জলরাশি টল-মল,—
বাড়িয়া উঠিল পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের ভার॥
রমণী পরশমণি, সংসারের রত্নখনি,
ত্রিদিবের দেবী তা'রা,—জগতে নিবাস।

প্রকৃতি তা'রাই হেথা, মানবের শক্তিরূপা,
দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, শান্তির আবাস॥
শক্তিরূপা সেই নারী নিজ ধর্ম্ম গলে পরি'
আসিল আনন্দে হ'তে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী।
জীবনের কর্ম্মপথ, সংসারের মহারথ,
হাসিল অরুণরাগে দিবস যামিনী॥

---

(৩)

অপরাজিতা।

উজ্জল চাঁদিনী রাতে ফুটিল অপরাজিতা,—
নাহিক রূপের গর্ব্ব, নাহি হাসি নাহি কথা।
আঁধারের আস্তরণে বসি বালা নিরিবিলি,
গাঁথিছে নয়ন-লোর—সখারে সঁপিবে ডালি।
কবরী খসিয়া গেছে, আঁচলে লেগেছে কাদা,
উন্মুক্ত চিকুরগুচ্ছ,—আধ-ফোটা আধ-মোদা!
আশে পাশে প্রেমাবেশে ভ্রমর ঘুমা'য়ে আছে,
ভুলেও একটি বার আসে না তাহার কাছে।
মধু মধু ক'রে ফেরে তাহার পরাণ-বঁধু,
তবুও ত বিষাদিনী তা'রে চায় শুধু শুধু!
নৈরাশ্যের তীব্র জ্বালা লুকা'য়ে মরম-তলে,
এখনো সখায় পেলে সুখে কত কথা বলে।
অতি ধীরে অতি ধীরে খুলিয়া আঁখির পাতা
হেরি'ছে অপরাজিতা প্রকৃতির নীরবতা।

আমি কে ?

একদিবস প্রাতঃকালে একটি পান্থনিবাসে বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতে-ছিলাম। সহসা প্রকৃতির নগ্ন চিত্রের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইল। চক্ষু ফিরাইয়া দেখি—সম্মুখে দুইটী নদীর সংযোগস্থল, তন্মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, অপরটী পর্ব্বত হইতে আসিয়া উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র খরস্রোতা বায়ুপ্রবাহে তরঙ্গ-রঙ্গে তরতর বেগে চলিতেছে। বড় বড় মহাজনী নৌকা সকল উত্তর দিকে জলদরাশির ঘনঘটা আড়ম্বর দেখিয়া বড় গাঙ্ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে উজান বাহিয়া আসিতেছে। সম্মুখে সুদূরব্যাপী প্রান্তর, নীলাকাশ পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে; ইহার ভিতর, গ্রাম দূরে থাকুক, একটি বৃক্ষ বা গুল্মও দৃষ্টিগোচর হয় না; কেবল কোথাও শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কোথাবা তপন-তাপদগ্ধ, অধুনা নববর্ষাস্নাত, তৃণদল বহুদুর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল স্বভাবের বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। উত্তর হইতে নীরদমালা ক্রমে ক্রমে অংশুমালীর অংশু রোধ করিল—দলে দলে বলাকা শ্রেণী মেঘের কোলে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল!

একদিকে স্বভাবের এই মহান্ গম্ভীর দৃশ্য,অপর দিকে দেখি—ক্ষুদ্র মানবের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিচয়—এক ব্যক্তি অপরকে তদপেক্ষা দুরবস্থ বলিয়া অকথ্য কটু ভাষা প্রয়োগ পূর্ব্বক আপন প্রভুত্বের পরিচয় দিতেছে। এ অদ্ভুত রহস্য কে বুঝিবে? অথবা এই প্রকার বিপরীত ভাবের সমাবেশ করিয়াই বুঝি বিধাতা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। প্রকৃতির বিচিত্রতা কে নির্দ্দেশ করিবে—সামান্য আমাদিগের মধ্যেই যে কত প্রকার মনুষ্য আছে তাহা কে বলিবে? কোথাও মানব পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নরাকার পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা দেবভাব অবলম্বন করিয়া দেবতারূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মানবে প্রভেদ অনেক,—সামঞ্জস্য কেবল হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহে। এক মানব জাতির ভিতর এ প্রভেদের—এ বিচিত্রতার—কারণ কি? ঐ যে লোকটা আস্ফালন পূর্ব্বক 'আমি'ত্বের গৌরব করিতেছে ও অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে, ও যদি আমিত্বের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করিতে

পারিত, তাহা হইলে ঐ ঘৃণা-আস্ফালন উহার নিকটেও আসিতে পারিত না। "আমি" ও আমার লোকলোচনপ্রত্যক্ষ বাহ্য দেহ কি এক?—দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত,—জড়ই ইহার উপাদান,—জড়ই ইহার বর্দ্ধন-কারক,—জড়ই ইহার বিনাশক। দেহ ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা, কিন্তু জীবদেহের অভ্যন্তরে এক নিত্য পদার্থ বিরাজিত আছে—যাহা ঈশ্বরের অংশ, দেহের পতনে যাহার বিনাশ হয় না, যাহা আত্মা বলিয়া অভিহিত—সেই অপ্রত্যক্ষ আত্মাই প্রকৃত "আমি"পদবাচ্য। সকল মানবেরই সেই আত্মা আছে—তবে কাহারও পূর্ণ, কাহারও কর্ম্মদোষে অসম্পূর্ণ। যাঁহার সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে সেই দেবরূপী মানবকে এই জড়জগতে কোন বস্তুই আবদ্ধ করিতে পারে না। সে আত্মা সদাই বিভুগুণগানে বিভোর এবং সকল পদার্থেই স্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের প্রভা দেখিয়া মোহিত হয়েন। এবম্প্রকার আত্মা ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া সেই পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞানী আমরা এসংসারে অনিত্য বিষয়কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া এই স্থূল দেহকে "আমি" জ্ঞানে তাহারই সুখানুসন্ধানে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া সূক্ষ্ম "আমি" আত্মাকে ভুলিয়া যাই। যখনই স্থূলদেহের সুখচিন্তা উদয় হইয়া আত্মার আশ্রয়স্থল পরমাত্মাকে ভুলিতে আরম্ভ করে, তখনই আমাদের পতনের সূত্রপাত হয়। ক্রমে সেই চিন্তা হইতে বাসনার উদয় হয় এবং তাহা হইতে কাম লোভ প্রভৃতি সঞ্জাত হইয়া সংহার সাধন করে। দেহ জড়পদার্থে নির্ম্মিত, ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ইহা জানিয়াও দৈহিক সুখে রত মানব ক্ষণকালের নিমিত্তও ভাবে না যে, যতই দিন যাইতেছে ততই তাহার পতন নিকটবর্ত্তী হইতেছে; ক্রমে যখন শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হয় তখন নিত্য আত্মার সকল কার্য্যই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। জীবদ্দশায় যিনি আত্মসংযম করিয়া মনকে ঈশ্বরাভিমুখে চালিত করিয়াছেন, তিনিই সুখী—দেহ ও মন তাঁহার পরম বন্ধুর কার্য্য করে। কিন্তু যিনি মনকে নিত্য চৈতন্যময় হরি হইতে দূরে রাখিয়া সংসার-মরুতে যদৃচ্ছা চলিতে দিয়াছেন, দেহ ও মন সেই স্থলেই তাঁহার পরম শত্রুর কার্য্য করিয়াছে। সুখ ও দুঃখ সংযতাত্মার নিকট কিছুই নহে। যিনি পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনি সুখ ও দুঃখের অতীত হইয়াছেন; তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও অনাসক্ত, পুত্র-মিত্র-কলত্রাদির মধ্যে থাকিয়াও মমতাশূন্য এবং ভোগ্য বস্তুর ভিতর থাকিয়াও ভোগাতীত। যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং উপাসনাদির চরম ফল মনঃসংযম এবং তাহা হইলেই সদা ভগবানকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া মুক্তাত্মা তাঁহার সহিত

সদা বিচরণ করেন,—পার্থিব কোন বস্তুতেই তিনি আকৃষ্ট হয়েন না। ভক্ত প্রহ্লাদ এইরূপ মুক্তাত্মাদিগের অন্যতম; যখন পিতৃনিয়োজিত অসুরবর্গের দ্বারা তাঁহার দেহের নির্যাতন করা হয় তখন তাঁহার ঘুণমাত্রও কষ্ট বোধ হয় নাই, তিনি বরং অবিচলিত ভাবে তাঁহার হরির নিকট তাঁহার দেহের শত্রু-দিগের শুভ কামনা করিয়াছিলেন। তদ্রূপ মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, তিনিও তখন তাঁহার মঙ্গলময় পিতার নিকট তাঁহার দৈহিক শত্রুদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রকার ঈশ্বরভক্ত মহাত্মাদিগের পবিত্র জীবনী পাঠ করিলে এবং তাঁহাদিগের অনাবিল চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহাদের মন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে তাঁহারা ক্রমে তাঁহার ভাবেই মত্ত হইয়াছেন। পার্থিব "তুমি"-"আমি"র প্রভেদ তাঁহাদিগের অন্তরে স্থান পায় না। পরম ব্রহ্মের মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা জগৎসংসারে, মানবেতর প্রাণিজগতে, তরু-গুল্ম-উদ্ভিদাদিতে, ও যাবতীয় জড় পদার্থে তাঁহার সত্তা অনুভব করিয়া আরও বিনয়াবনত হয়েন। প্রত্যেক মানবাত্মায় সেই পরমাত্মার অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা কোন মানবকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন না, বরং একান্ত মনে সকলের মঙ্গল চিন্তাই করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সেবা দ্বারা জগৎপিতার সেবা করেন। এই সমস্ত মহাত্মা-গণের স্থূল 'আমিত্ব' লোপ পাইয়াছে, অহঙ্কার আর তাঁহাদের মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।

এই যে আমি বসিয়া রহিয়াছি, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, চারিদিকে মহাশূন্য, মহাসমুদ্রে শফরীর ন্যায় আমি এই আকাশ-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি, ইহার অন্ত কোথায়? এই গৃহাভ্যন্তরে আমি হয়ত মনে করিতে পারি আমি বড়; কিসের বড়?—জ্ঞানে, ধনে না বলে? মূর্খ তুমি, এই যে পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠে আর একজন রহিয়াছেন, কেমন করিয়া জানিলে তিনি তোমা অপেক্ষা বড় নহেন? বাহ্য দৃষ্টিতে তুমি তাঁহাকে হীন ভাবিতেছ, কিন্তু তিনি কুলে, শীলে, গুণগ্রামে,তোমা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ,—বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমে বিভোর থাকায় তাঁহার অন্তরে তোমার অপেক্ষা কত উচ্চতর পবিত্র ভাব বিরাজ করিতেছে। এইরূপে গৃহ হইতে পল্লীতে, পল্লী হইতে নগরে, নগর হইতে দেশে, দেশ হইতে মহাদেশ মধ্যে একবার মানস-নয়নে দৃষ্টিপাত কর—কত উচ্চ হইতে উচ্চতর মানব তোমার নয়ন পথে আবির্ভূত হইবে এবং আপনাকে তখন অতি নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে। তাহার পর;

পৃথিবী হইতে অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলে মনকে লইয়া যাও, ক্রমে অনন্তে ডুবিয়া তুমি আত্মহারা হইয়া যাইবে। ভ্রান্ত মানব ক্ষণভঙ্গুর দেহের অহঙ্কার করে, কিন্তু মোহ-মদিরায় আত্মহারা হইয়া তাহার পরিণাম চিন্তা করে না; আজ তুমি পার্থিব মহাবলে বলীয়ান, কিন্তু তুমি কি জান না মহাবীর নেপোলিয়ান শেষবয়সে কতই কষ্টে না নিপতিত হইয়াছিলেন,—এলবা দ্বীপে তাঁহাকে দেখিয়া কে বলিতে পারিত যে তিনিই সে বীরাগ্রগণ্য পুরুষ যাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ইয়ুরোপীয় মহাবল সঙ্কুচিত হইয়াছিল? পার্থিব বলে বলীয়ান মনে করিয়া তুমি দুদিনের জন্য আপনার প্রতাপ দেখাইতে পার, কিন্তু জাননা কি যে এমন একদিন আসিবে যখন এ সকল পশ্চাতে রাখিয়া তোমায় এ লীলাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তখন কোথায় তোমার ধনবল, কোথায় তোমার বুদ্ধিবল থাকিবে? রাজা ও প্রজা, ধনী ও নির্ধনী, পণ্ডিত ও মূর্খ—যখন সকলকেই একপথ দিয়া যাইতে হইবে,তখন"তুমি"ও"আমি"র প্রভেদ দেখিতেছি না। যদি এই পৃথিবীতে অবস্থানকালে সেই সর্ব্বভূতেশ্বরকে ভুলিয়া নশ্বর জড় লইয়া ব্যাপৃত থাক, জড়ের জন্য অহঙ্কার করিয়া থাক, তবে যখন এই সকল জড়বস্তু ছাড়িবে তখন তোমার কত কষ্ট হইবে—মনে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আজ শরীরে একটু ময়লা লাগাতে সাবান লাগাইতেছ, কাল তোমার সেই চাকচিক্যশালী দেহ ভস্ম হইবে, তাহা কি ভাবিতে পার? আজ যে হস্ত দ্বারা আস্ফালন করিয়া অপরকে নীচ জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছ, কাল তোমার সেই হস্ত তোমার মতানুযায়ী কার্য্য করিবে না, তাহা কি ভাবিতে পার? আজ যে মুখে অপরকে গালি দিতেছ কাল সে মুখ দ্বারা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না,তাহা কি ভাবিতে পার? একবার ক্ষণকালের নিমিত্তও যদি ঐ সকল ভাবিতে পার তাহা হইলে আর "তুমি"-"আমি"র প্রভেদভাব মনে থাকিবে না,—সকল মানবে সেই পরমাত্মার অংশ দেখিয়া সেই এক মাতার সন্তান বলিয়া এক হইবে। মানব! বৃথা অহঙ্কার করিও না;—স্থূল "আমি" ভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম "আমি" কে চিন্তা কর, তাহা হইলে পরমাত্মার পুণ্য জ্যোতিঃ তোমাতে প্রতিভাত হইবে, এই মরজগৎ তোমাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না, ক্রমে তুমি সেই চিরশান্তিময়ের ক্রোড়ে গিয়া অনন্ত শান্তি লাভ করিবে।

কালিদাসের কাহিনী।

(৩)

প্রাচীন ইতিহাসে যেমন ভূপতিবৃন্দের দিগ্বিজয়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ পণ্ডিতবর্গেরও নানা দিগ্দেশীয় রাজসভা-বিজয়ের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্রের দিগ্বিজয় বহু দিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রের দিগ্বিজয় অদ্যাপি কচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে খ্যাতনামা নরপতিগণ অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের সভায় নানাশাস্ত্রবিশারদ বহু মহামহোপাধ্যায় সমাগত হইয়া অশেষবিধ শাস্ত্রালাপ দ্বারা রাজগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেন। বিশেষতঃ, তখন ভূপতিগণ মন্বাদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে রাজ্যের যাবদীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করায় সন্দিগ্ধস্থলে মীমাংসার নিমিত্ত নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত। পরন্তু, এতাবৎ পণ্ডিতসভা পরিপোষণের প্রধান-তম উদ্দেশ্য হইলেও, প্রত্যুৎপন্নমতি কবি এবং কাব্যালঙ্কারনিপুণ পণ্ডিতগণ-দ্বারাই রাজসভার প্রকৃত শোভা সম্পাদিত হইত এবং তাঁহাদিগের রসময়ী ভারতী রাজগণের কঠোর রাজকার্য্যের মধ্যে সাতিশয় চিত্তবিনোদ সাধন করিত। এতদ্ভিন্ন আপন সভাসদ কবি বা পণ্ডিত অপর রাজার আশ্রিত সভাসদগণকে স্ব-প্রতিভায় পরাজয় করেন, ও তদ্দ্বারা তদীয় পণ্ডিতবর্গ অপর বিদ্বন্মণ্ডলী অপেক্ষা সমধিক যশস্বী হয়েন,—সহজ-বিজিগীষু তাৎকালিক নৃপতিবর্গের ইহাও এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং এতদর্থে তাঁহারা স্বীয় সভাস্থ বিদ্বজ্জনমাত্রকেই সাতিশয় প্রোৎসাহিত করিতেন। ফলতঃ, তখন প্রতিভাশালী পণ্ডিতমাত্রই কোন না কোন নৃপতির সভায় বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত অবস্থান করিতেন এবং স্বীয় প্রতিভাদ্বারা অপর রাজার পণ্ডিতসভাকে পরাস্ত করিয়া নিজের ও আশ্রয়দাতা নৃপতির যশোবর্দ্ধনে সতত যত্নশীল থাকিতেন।

এইরূপে কবি কালিদাসও রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় আশ্রয়লাভ করেন। এই ভূপতির সভায় আরও আট জন পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন, সম্প্রতি কালি-

দাসকে লইয়া নয়জনে "নব-রত্ন" * হইলেন। বলা বাহুল্য, ভারতীর বরপুত্র অচিরেই শ্রেষ্ঠতম "রত্ন" হইয়া উঠিলেন এবং দিগ্বিজয়ার্থ নানাস্থলে প্রেরিত হইতে লাগিলেন।

তৎকালে কর্ণাট-রাজের সভাও অশেষ বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা পরিশোভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছিল। বিজিগীষু কালিদাস, একদা, বর-রুচি নামক অন্যতম"রত্ন"কে ভৃত্য সাজাইয়া,কর্ণাট-রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণে বহির্বাটিকায় আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া রজনীযোগে এক বিদুষী রমণীকে কবির পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। গভীর নিশীথে একাকিনী রমণীকে অন্তঃপুর হইতে নির্ভয়ে আসিতে দেখিয়া কালিদাস চমৎকৃত হইলেন এবং রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"উন্নাদাম্বুদ-বর্দ্ধিতান্ধতমসা প্রভ্রষ্ট দিঙ্মণ্ডলে
কালে জাগ্রদুদগ্র-যামিক-ভট-প্রারব্ধ কোলাহলে।
কর্ণস্থা সুহৃদম্বুরাশি-বড়বা-বহ্নের্যদন্তঃপুরা-
দায়াতাসি তদম্বুজাক্ষি কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং॥"

[গুরুনিনাদকারী মেঘসমূহ দ্বারা রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হওয়াতে দিঙ্ নির্ণয় হওয়া দুরূহ; সময় বুঝিয়া নিশা-প্রহরীরা জাগিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; ঈদৃশাবস্থায় শত্রুনিসূদন কর্ণাটরাজের অন্তঃপুর হইতে, হে সুলোচনে, তুমি আসিতে পারিয়াছ, ইহাতে অনুমান হয়, স্ত্রীজাতি ভীরু—এরূপ অমূলক।]

কবিতাটি বিদুষীর বড় মনঃপূত হইল না। ‡ তিনি বলিলেন, "আমি কর্ণাট-রাজের প্রেয়সী,—একজন প্রসিদ্ধ কবি আসিয়াছেন শুনিয়া,তিনি কীদৃশ—জানিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এখানে কবির অসদ্ভাব দেখিতেছি—

---

* ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

‡ কর্ণাট-রাজেরও এইটি ভাল লাগে নাই। সে কথার আলোচনা পরে করা যাইবে।

"একোঽভূন্নলিনাদেকশ্চপুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরঃ
সর্ব্বে তে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যোনমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যলিখনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি বামচরণং কর্ণাট-রাজ-প্রিয়া॥"

[একজন বিষ্ণুর নাভিকমল, একজন নদীসৈকত, অপর বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; অর্থাৎ, ব্রহ্মা, ব্যাস এবং বাল্মীকি—তাঁহারাই সকলে কবি, তাঁহাদিগকে বন্দনা করি। আধুনিক অপর কেহ যদি গদ্যপদ্য রচনা দ্বারা চমৎকৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি, কর্ণাট-রাজপ্রেয়সী, তাঁহাদের বামচরণ মস্তকে ধারণ করি।"] * কবি রমণীর এবম্প্রকার উক্তি শুনিয়া নীরব রহিলেন। ইহাতে কর্ণাট-রাজ-রঙ্গিনী কালিদাসকে নির্ব্বোধ স্থির করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা কবিকে তৎপরে তদীয় সভাসদ কবি বব্বনের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে, বোধ হয়, নিয়ম ছিল যে কোন নূতন কবি রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা অগ্রে তাঁহাকে গোপনে পরীক্ষা করিতেন এবং যদি তদ্দ্বারা আগন্তুকের গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে আপন সভাস্থ পণ্ডিত দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া পরে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন। এই জন্যই বোধ হয় কালিদাসকে বব্বন-ধামে পাঠান হইল।

বব্বন লোকটি সরল প্রকৃতির ছিলেন না। এইজন্য, পরীক্ষার্থ যখন বব্বন কালিদাসকে প্রভাতবর্ণন সূচক কবিতা রচনা করিতে বলিলেন, তখন কালিদাস মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "যদি কবিতা উত্তম হয়, তবে রাজসাক্ষাৎকার দুর্লভ হইয়া উঠিতে পারে, অতএব ইহার সমক্ষে মূর্খত্বের ভান করাই শ্রেয়ঃ।" এই বিবেচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কালিদাস উত্তর করিলেন :—

"প্রাতরুত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয় স্ম টঃ।
নগরে ভাষতে কুক্কুশ্চবৈতুহিচবৈতুহি॥" †

---

* এখানে একটু শ্লিষ্টাৰ্থ আছে; শেষ পদের অর্থ "তাহাদের মস্তকে আমি রামপদ দিই" এরূপ অর্থও ঘটিতে পারে।

† পূর্ব্বার্দ্ধে 'ট' এবং পরার্দ্ধে 'কুক্কু' মিলিয়া "কুক্কুট"! একটি অনুষ্টুপে স্ম, চ, বৈ, তু, হি এই পাঁচটি নিরর্থক পাদপূরক অব্যয়, তাহার মধ্যেও চারিটির দ্বিরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

['হে রাজন্! নগরে কুক্কুট-ধ্বনি হইতেছে,—প্রভাত হইয়াছে,—উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন কর।']

এই অদ্ভুত কবিতা শুনিয়া বব্বনকবি ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "বাঃ, দিব্য কবিতা! অনুগ্রহ করিয়া যদি লিখিয়া দেন, আমার বালকদিগকে শিখাইতে পারি।"

কালিদাস বব্বনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার আদেশমত ঐ কবিতাই লিখিয়া দিলেন। ইহাতে বব্বনের মনে বড় হর্ষোদয় হইল। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, একটা দিগ্‌গজ কবি আসিয়াছে, রাজা, হয় ত, তাঁহার কবিতা-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বব্বনকে স্থানচ্যুত করিবেন; অধুনা কালিদাসোক্ত শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা দূরীভূত হইল।

যথা সময়ে তিনি কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় চলিলেন,—হস্তে কালিদাসের রচিত "প্রভাত-বর্ণনা!" পথে একটা বৃষ দেখিয়া তিনি পুনশ্চ কালিদাসকে একটী কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস কহিলেন—

"গোরপত্যং বলীবর্দ্ধো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে তস্য শৃঙ্গঞ্চাপিতু বর্ত্ততে॥

[গরুর বেটা বলদ, সে মুখে ঘাস খায়, তার লেজ আছে, শিংও আছে!]

এবার কালিদাসের মূর্খত্ব বিষয়ে বব্বন নিঃসন্দেহ হইলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে কালিদাসকে লইয়া রাজসভায় আগমন করিলেন। সভাসদ বব্বনকবিকে সমাগত দেখিয়া রাজা প্রণাম করিলেন। বব্বন আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু—[হে রাজন্! জয় হউক]

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বব্বনকবে হস্তে কিমাস্তে তব।

[বব্বনকবে! আপনার হস্তে কি?]

বব্বন। শ্লোকঃ [একটি কবিতা]

রাজা। কস্য [কাহার রচিত?]

বব্বন। কবেরমুষ্য কৃতিনঃ

[এই আগন্তুক নিপুণ কবির রচিত।]

রাজা। তৎপঠ্যতাং

[উহা পাঠ করুন]

এই সময়ে কালিদাস আর নিশ্চিন্ত রহিলেন না ; বখন তাঁহার "প্রভাত-বর্ণন" পাঠ করিতে উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া তিনি তাহাতে বাধা দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রাজার নিদেশের উত্তরে বলিলেন—

কিন্ত্বাসামরবিন্দ সুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনৈ "পঠ্যতে।*
রুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লী-কঙ্কণ-ঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাং ॥"

["পড়া যাইবে। কিন্তু এই সকল কুবলয়নেত্রা সুন্দরীগণ ঘন ঘন চামরান্দোলন করাতে, তাহাদের হস্ত-সঞ্চালন-জনিত কঙ্কণ-ঝনৎকারে কিছুই শুনা যাইবে না—ক্ষণকাল উহা বারণ করুন।"]

অদ্য আমাদিগের লেখনীও এই স্থানেই বিশ্রাম করুন।

প্রাচীনের পূর্ব্বকথা।

প্রথম পটল।

বয়স কামরূপ পার হইয়া গোয়াল পাড়ার দিকে ছুটিয়াছে ; মা-বাপের ষেটের বাছা হইয়া থাকিলে এতদিন কোন্ কালে সংসার খেলার বাজি উঠিয়া যাইত। জননী বড়ই আদর করিয়া বাল্যকালে "ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস" বলিয়া আমার দীর্ঘায়ু কামনা করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গত ১২৭১ সালের বড় ঝড়ের পর আমাকে ষষ্ঠীর দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ ভাবে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইয়াছে ; সুতরাং বিশেষ করিয়া বয়সের পরিচয় আর কি দিব, এখন পরলোক প্রস্থানের পথ দেখিতে হইতেছে,—সম্বল হইয়াছে বংশের যষ্টি আর যপের মালা। চক্ষু দূরের দৃশ্য গ্রহণ করে না, কর্ণ ছোট কথা বড় একটা শুনিতে সম্মত নহেন, নাসিকা নিকটে পাইলে যেন নিতান্ত নারাজির সহিত ভাল মন্দ গন্ধটা ঘ্রাণ করা এখনও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ; ত্বকের ত কথাই নাই, ইনি বেলা থাকিতেই

---

* সমগ্র শ্লোকার্দ্ধ এই—"রাজন্নভ্যুদয়োহস্তু বন্ধনকবে হস্তে কিমাস্তে তব
শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্যাকৃতিনস্তৎ পঠ্যতাং পঠ্যতে।"

আপনি ঘরটী বন্ধ করিয়া প্রায় নিশ্চিন্ততা অবলম্বন করিয়াছেন, কবাট ঠেলিয়া সাড়া পঁহুছিবার সম্ভাবনা কম,—তবে অর্গলচ্যুত করিবার বলে ধাক্কা দিলে কোন কোন সময় উত্তর পাওয়া যায়, এ কথাটা বড়ই দুঃখে বলিতে হইতেছে। ফলে প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে, মেদুর মারুত স্পর্শ অনুভব করা ভাগ্যে বড় ঘটিয়া উঠে না ;—ত্বগিন্দ্রিয় মহাশয়ের উপর জাতক্রোধ হইবার প্রধান কারণটা এখনও বলা হয় নাই। ইনিই মানবের সোণার অঙ্গ অগ্রে বিকৃত করিয়া বার্দ্ধক্যের কলঙ্ক রটাইবার প্রধান উদ্যোগী—ইনি স্পর্শ জ্ঞানের প্রধান সহায় হইয়া সর্ব্ব শরীরটা ব্যাপিয়া আছেন, দেহের যে কিছু লাবণ্য সমস্তই ইঁহাকে লইয়া ; ইনিই অগ্রে শত্রুতা সাধনের চূড়ান্ত করিয়া দেহটাকে যেন ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তবে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যিনি জীবন ধারণের প্রধান সহায়, যাঁহার কল্যাণে অমৃতের আস্বাদ পাইয়া দেবকুল অমর, তাঁহারই কেবল অনুগ্রহের অনুমাত্র অপচয় দেখিতেছি না। পরলোকের প্রধান ভোজটা এখনও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে ; বাহ্যেন্দ্রিয়গণ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কেবল ইঁহারই বলে এখনও নাচিয়া কুঁদিয়া দুনিয়াদারী বজায় রাখিয়াছি,—কিছু না দেখি, না শুনি, স্পর্শ, আঘ্রাণ কিছুই না করি, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এক আস্বাদের সুখে সকল দুঃখ দূরে আছে। সকল ইন্দ্রিয়ের কাজ যেমন কমিয়াছে, রসনেন্দ্রিয়ের কাজটা তেমনি বাড়িয়া মাত্রা সমান করিয়া রাখিয়াছে ; ইহাতেই আমার ন্যায় উদরপরায়ণ মহাপুরুষের অনুমান করিবার অধিকার আছে যে এই পাঞ্চভৌতিক মায়াময় সংসারে আসিয়া অপর কোন কাজ কর আর নাই কর, ষোড়শোপচারে উদর-নারায়ণের সেবায় তৎপর হও,—তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ, মনুষ্য জন্মগ্রহণে তাঁহার সেবাপরাধ করিলে সর্ব্বনাশ,—উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, উদরাময়, বিসূচিকাদির ভয়ানক পরিণামের কথা বুদ্ধিমান হইয়া বুঝিয়া দেখ ; তাঁহার পূজাভাবে আত্মাপুরুষ তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিবেন না, তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইবেন, কিছুতেই ফিরাইতে পারিবে না, তোমাকে তখন হা হতোঽস্মি করিয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে! কেহ কেহ বলেন এই জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই নয়,—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়,দর্শন,শ্রবণ,আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন প্রভৃতি সকলই মিথ্যা। ইঁহারাই ঋষি তপস্বী এবং মহাজন বলিয়া বিখ্যাত ; ইঁহাদের বিশ্বাস—নিত্য চৈতন্য সচ্চিদানন্দ পুরুষ এই ভ্রান্তিময় অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর,—জ্ঞানময় হইয়া অজ্ঞানকে লইয়া লীলা করিতেছেন, সংসার অজ্ঞানের অবতার,—ইত্যাদি। বাগবাজারের রসগোল্লা, জনাইয়ের মনো-

হরা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, বর্দ্ধমানের লালমোহনাদির উপাদেয় আস্বাদ যদি অজ্ঞানের অধর্ম্মভোগ মাত্রই হয়, তবে যিনি অক্ষয় অজর অমর, যিনি সক্ল সকল ঘটেই অবস্থিতি করেন, যিনি ত্রিভুবনে সুখাসুখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য সকলেরই জ্ঞান-কর্ত্তা, কিন্তু ভোগ-কর্ত্তা নহেন, সেই অবাঙ্‌মনসগোচর আত্মা পুরুষ ত্রিতাপভয়কে ভ্রূক্ষেপ করিয়া কেবল জঠরসুখভোগের লোভে পড়িয়া কেন ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-ফাঁস গলায় ধারণ করেন ?

এক জঠর-সুখভোগের মহিমা বর্ণনে যে এতগুলি কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এহেন দুর্ল্লভ সুখ ফুরাইয়া আসিতেছে, তদবস্থায় দণ্ড বা মুহূর্ত্ত কাল আহার ব্যতীত অতিবাহিত হইলেই উহার সমূহ অপব্যয় মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় আজি কয়েক দিন ধরিয়া আমার বড় নাতিটী কাগজ কলম হাতে লইয়া আমাকে অতি মধুর ভাষায় অনুরোধ করিতেছেন, "দাদামহাশয়, আপনি অতি প্রাচীন হইয়াছেন, ইহ সংসারের অনেক দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন,—আপনার মনোভাণ্ডারে যে সকল মহামূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে উত্তর পুরুষদিগের অনেক উপকারে আসিতে পারে। সভ্যজাতি মাত্রই নানা উপায়ে আপনাদের জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আপনি যদি দয়া করিয়া একটু কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রাচীন সামাজিক ও নৈতিক জ্ঞানের সংস্থানাধিক্য সম্ভবিতে পারে।"

ভায়ার কথাটা প্রথমতঃ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম—তিনি কালেজে শিক্ষা পাইয়াছেন, আজ কালিকার কালে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয়টাও লাভ করিয়াছেন, অবশ্য কথাগুলা অকাট্য গোছের বটে; অতএব একটু নীরবে থাকিয়া বলিলাম,—"ভাই হে, তোমার কথাগুলি সমস্তই বুঝিলাম। উত্তর পুরুষদিগের উপকারের জন্য তুমি বেদব্যাসের তাইদনবিশী করিতে বসিয়াছ সত্য, কিন্তু পশ্চিম পুরুষদিগের মনের ভাবটা কি ভাবিয়া দেখ নাই? পরাধীন আর পরপ্রত্যাশী জাতির আবার জাতীয় ইতিহাস কি ভাই?"

কথাগুলি ভায়াকে সর্ব্বতোভাবে মিষ্ট লাগিল না, তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কাটিবার কথা নহে। তবে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে দেশের প্রকৃত অবস্থা অনেকটা বুঝিয়া লইবার উপায় থাকিবে মনে করেন না কি?"

ভায়া আমার সকল কথার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া আমার একটু কষ্ট হইল; আমি বলিলাম,—"ভাই, যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আপন আপন ঘরে রাখিবার কোন বাধা নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা উত্তর পুরুষগণের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যে চেষ্টা তাহা ত সফল হইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে ও আজিকালি যাহা ঘটিতেছে, তুমি তাহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে যাহা ইচ্ছা বলিলে বা লিখিলে তোমার কোন প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না, কেন না আজি কালি তোমার সমাজের শরীর নাই; কিন্তু অন্য সমাজের সহিত তোমার যে ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমাজের কোন কথা নিরপেক্ষ ভাবে লিখিবার বা বলিবার পক্ষে তোমার কতটা অধিকার আছে?"

ভায়া পুনরপি কথার উত্তর করিতে প্রস্তুত দেখিয়া মনে ভাবিলাম—আপত্তি করা বিফল, অথচ অতীতের সকল কথা সুন্দর রূপে আলোচনা হইবার উপযুক্ত সময় এখনও আইসে নাই। অসময়ে কোন কাজই সার্থক হয় না। সুতরাং সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। যাহা হউক, ভায়ার উদ্দেশ্য সৎ কিন্তু তাহা সিদ্ধ করা সহজ নহে, যাহাতে দুই দিক্ রক্ষা পায় এরূপ ভাবে ভায়ার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। এই সকল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন তুমি আমার কাছে কি শুনিতে চাও?" ভায়া উত্তর করিলেন,—"আপনার জন্মাবধি বঙ্গদেশে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, আপনি যাহা কিছু আপন চক্ষে দেখিয়াছেন, বা পরের মুখে বিশ্বস্ত ভাবে শুনিয়াছেন।"

আমি। তবে কি তুমি আমাকে দিয়া আমার জীবনী বলাইতে চাও?

নাতি। তাহা হইলে ত এক লোষ্ট্রে দুইটী পক্ষী শিকার করা হয়।

আমি। আমার জীবনে আহার-নিদ্রাদি সাধারণ জীবধর্ম্ম ব্যতীত আর কি আছে যে তাহা পড়িয়া অন্যের উপকার হইবে?

নাতি। আপনি প্রবীণ হইয়া এমন কথা বলিবেন এরূপ আশা কখন করি নাই,—Man is perenially interesting to man; nay, if we strictly look into it, there is nothing else interesting.

ভায়ার কথা শুনিয়া আর কিছু বলিতে পারিলাম না, অগত্যা কথা আরম্ভ করিতে হইল।

১২০৮ সাল আমার জন্ম বৎসর, ফাল্গুন মাস, যখন গাছে গাছে নূতন পাতা,

আমের গাছে সোণার মুকুল, লেবুর গাছে রূপার ফুল মৌমাছির ঝাঁককে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া অন্যত্র যাইতে দেয় না, বাতাস যখন সৌরভ ভিন্ন আর কোন গন্ধ বহন করে না, দয়েল কোকিল পাপিয়া 'বৌ কথা কও' ব্যতীত অন্য পাখী যখন লজ্জায় ডাকিতে চায় না, জলাশয়ে যখন কমল কুমুদ কহ্লারের নূতন পাতা নূতন ফুল, আকাশে সূর্য্যদেব যেন শীতের পর নূতন হইয়া নির্ম্মল কিরণ বিতরণে প্রণয়িনীর প্রণয়-পিপাসা মিটাইবার জন্য দিবাভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকেন, প্রকৃতি যখন নূতন বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া সংসারে সুখ-দুঃখের চক্রবৎ পরিভ্রমণ প্রত্যক্ষ করাইতে থাকেন, আমি ঠিক সেই সময়ে এই কর্ম্মভূমির কর্ম্মভোগ করিবার জন্য নূতন এক জন ইহলোকে আবির্ভূত হইলাম। কোথায় ছিলাম, কি ছিলাম, অন্যত্র না গিয়া কেন এখানে আসিলাম,—এই সকল গুপ্ত তত্ত্ব জানিবার জন্য কত শত কপিল কনাদ গৌতম জৈমিনির ন্যায় মহা মহা ঋষি তপস্বী আহার নিদ্রার ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া যুগ যুগান্ত কাল বায়ুভক্ষণে ভাবিয়া চিন্তিয়া 'হিমসিম' খাইয়া উঠিলেন, শেষ যখন দেখিলেন দর্শনে উহা দেখিবার নহে, তর্কের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার নহে, যুক্তিতে জুটিয়া উঠিবার নহে, তখন অধোবদনে ভূতের দেহ ভূতকে দিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন আমার মত ক্ষুধা তৃষ্ণাদির দাসানুদাসের সে সকল কথা ভাবিবার চিন্তিবার চেষ্টাই বিড়ম্বনা মাত্র।

যাহাই হউক সংসারে সকলে যেরূপে আসিয়া থাকে আমিও সেইরূপে আসিলাম। যখন আসিলাম তখন আসিবার উদ্দেশ্য-কথা কিছুই বুঝিতাম না, বুঝিবার বুদ্ধিও ছিল না। যাঁহাদের নিকট আসিলাম তাঁহারা কিন্তু অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। আত্মীয় অন্তরঙ্গগণের মধ্যে একটা আমোদের তুফান উঠিল, কেন উঠিল তাহারও রহস্য কিছু বুঝিলাম না। এখন দেখিতেছি এই সংসার-সমুদ্রে একটার পর একটা করিয়া কত শত সহস্র কোটী কোটী ঢেউ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে যেমন উঠিতেছে ও মিলাইতেছে, ইহাও তেমনি উঠিল,—পাঁচদিনের দিন একটু প্রসার পাইল। বাড়ীতে আজি একটা উৎসব, এই উৎসবের উদ্দেশ্য-কথা শাস্ত্রে কিছু খুঁজিয়া পাই নাই, তবে এই জানি হিন্দুর সকল কার্য্যই সুযুক্তিমূলক। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় দেহের যে পরিমাণ ভার থাকে, দুই তিন দিন পরে উহার কিছু কমিয়া যায়।* ক্ষয়প্রাপ্তিকালে

* The newly born infant weighs about 7 lbs., and about 9 inches in length; for the first two or three days there is a loss of weight amounting to from 4 to 7 oz., then a regular gain commences amounting to from 6 oz. to 3 oz. weekly for the first six months.
Notes on Physiology by Henry Ashby. M.D., M.R. C.P.

বহির্বায়ু ও সূর্য্যকিরণ কোমল কলেবরের উপযোগী না হইতে পারে, বোধ হয় এই জন্যই হিন্দুর সূতিকাগার হইতে শিশুকে বাহির করিবার ব্যবস্থা নাই। পরে চতুর্থ দিবস হইতে যখন দেহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন পাঁচুটের উৎসব হয়। এই দিন আমার প্রথম সূর্য্য দর্শন; সাংঘাতিক সূতিকা-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আজি সূর্প-শয্যা পাইলাম। অবস্থার একটু উন্নতি বলিতে হইবে। হিন্দু শিশুর সূর্পশয্যা শয়ন আর কিছুই নহে, কেবল সূর্প দ্বারা যেমন সারশূন্য শস্য উড়াইয়া সারবান গুলিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়—ইহাও তদ্রূপ। শিশুর যে কিছু অকল্যাণ তাহা সূর্পের গুণে উড়িয়া গেলেই শিশু রোগতাপ শূন্য হইবে। সূর্পশয্যা শয়নের ইহাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজি বাড়ীতে একটা উৎসব, কিন্তু এই উৎসবে আহার নাই, ব্যবহার নাই, হিন্দুর উৎসব-তালিকায় এরূপ নীরস উৎসব আর দ্বিতীয় নাই, তবে শুধু মুখে উৎসব ভাল লাগিবার নহে, এজন্য মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থাটা বেশ আছে। ভায়া, প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি মানবের উদরই সর্ব্বস্ব। সুতরাং উদর সেবা ব্যতীত উৎসবই হইতে পারেনা। উদরের জন্য রাজা রাজত্ব করেন, মন্ত্রী মন্ত্রণা দেন, হাকিম বিচার করেন, চোরে চুরি করে, যোদ্ধা যুদ্ধে মাথা দিয়া থাকেন, কেরাণী কলম পেশেন, গৃহস্থ গৃহস্থালীর বোঝা বহেন, দোকানি দাঁড়ি-পাল্লা ধরেন, মোসাহেব বাবুর মন যোগান। সংসারে যিনি যাহা করেন তাহাই উদরের জন্য করিয়া থাকেন। আজি গ্রামস্থ ছোট বড় সকলে মাথা পূরিয়া তেল মাখিবে, পেট পূরিয়া মিষ্টান্ন ভোজনের দাবী করিবে। শুনিয়াছি,এজন্য আমার পিতৃদেব মহাশয় ৩।০সিকায় একমন তৈল, আর ৩।০ সিকাতেই একমন সন্দেশ কিনিয়া রফা নিষ্পত্তিমতে ভদ্রাভদ্র সকলের দাবী মিটাইয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেক দিন পর্য্যন্ত গ্রামের ছোট বড় অনেকেরই মুখে আমার পাঁচুটের তৈল-সন্দেশ-বিতরণের কথাটা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে পাঁচুটের দিনটা চলিয়া গেল,পরদিন অন্তঃপুরাঙ্গনাগণ ষেটেরা পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন, সূতিকা-গৃহে সিন্দুর মাখাইয়া হরিদ্রারঞ্জিত নেকড়ায় সাজাইয়া ষষ্ঠী দেবীর প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা হইল। আজি কালি যেমন হ্যাটকোট ইংরেজত্ব বা তদ্রূপত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে, বর্ণ ফর্সা হউক বা না হউক, হ্যাট কোট ও চুরুট.চস্‌মাধারী দেখিলেই যেন তাঁহাকে প্রণম্য বা নমস্য বলিয়া মনে করিতে হয়,তদ্রূপ সিন্দূর ও পুষ্প হিন্দু দেবতার দেবত্বসূচক ; যেমন

বর্ণ ফর্‌সা হইলে সাহেব হয় না, তেমনি দারু প্রস্তর ও মৃত্তিকারচিত সুন্দর ব-পদাদিধারী সুগঠিত মূর্ত্তি হইলেই দেবতা হয় না,—যতক্ষণ তাহাদের অঙ্গে সিন্দুর পুষ্প না দেখা যাইতেছে ততক্ষণ তাহাকে কেহ দেবতা বলিয়া প্রণাম করিতে কখন দেখিয়াছেন কি?—সম্মান হ্যাটকোটের,পক্ষান্তরে পুষ্প সিন্দুরের; তাহা না হইলে ভগবানের দ্বাপর মূর্ত্তির লাবণ্য অপেক্ষা গাঢ়তর নবনীরদকান্তি চুনা-গলির এণ্ডু পেণ্ডুর অগ্রে আমাদিগের নবদ্বীপ-ভাটপাড়ার তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ঠাকুর মহাশয়দিগকে সর্ব্বাগ্রে সাহেব বলিয়া ভক্তি করিবার দাবী চলিত। ফলতঃ মাটীর ঢিপি, পাথরের টুক্‌রা, কাঠের কুঁদা—এই সকলের, কোন আকার প্রকার থাকুক, বা নাই থাকুক, সিন্দূর ও পুষ্প দেখিলে হিন্দুর মধ্যে পনর আনা উনিশ গণ্ডা লোক তাহাকে প্রণাম না করিয়া সে পথে চলিবে না। সুতরাং আমার ষেটেরা পূজার উপলক্ষ করিয়া পুষ্প-সিন্দূরের সংস্রবে রক্তমাংস-হীন গোমুণ্ডেও দেবত্ব সঞ্চারিত হইল! সূতিকাগৃহের দেওয়ালে মাটীর গাছে কড়ির ছাউনী দিয়া বৃক্ষ রচনা হইল, তাহাতে ষষ্ঠীর আবির্ভাব কল্পিত হইল।

হিন্দুর ছয় দিনের ষেটেরা পূজার সহিত শাস্ত্রের ষোল আনা সংস্রব, ষষ্ঠী পূজার উদ্দেশ্যও অতি মহৎ। আমি যে পঞ্চ ভূতে গঠিত স্থূল দেহকে অবলম্বন করিয়া ইহলোকলীলার অবতার হইয়াছি সেই দেহকে যে পৃথিবী পোষণ করিবেন, যে দশদিকৃপতিরা আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র মধ্যে অনড় অটল ভাবে রক্ষা করিবেন, যে শান্তি আমার সকল কুশল সাধন করিবেন, যে ধৃতি আমার ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিবেন, এবম্ভূত ষোড়শ মাতৃকাদেবীর পূজা ষষ্ঠ দিবসে সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া এই পূজার নাম ষষ্ঠী পূজা ও পূজার অধিকারিণী দেবীর নাম ষষ্ঠী হইয়াছে, নতুবা ষষ্ঠী পূজা বলিতে ষোড়শ মাতৃকার পূজা বুঝিয়া লইতে হয়। ষষ্ঠী পূজায় হিন্দুর অত্যদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইহাতে যে কোন দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতে হয় তাঁহারা সকলেই শিশুর মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই, কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্রার্থ ব্যবহারে ভিন্ন রূপ ধরিয়া থাকে। মধুরেণ পূজা সমাপনান্তে রাত্রি প্রহরেক মধ্যে বাহিরের গোল কতকটা থামিল। অতঃপর সূতিকাগারে একটা জল্পনা চলিতে লাগিল। আজি রাত্রিতে বিধাতা-পুরুষ আমার ললাট-পট্টে ভাবী জীবনের সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মাদি লিপিবদ্ধ করিতে আসি-বেন। তজ্জন্য সূতিকাগৃহে লেখনী মস্যাধার প্রভৃতি লিখিবার উপকরণ

সং...ত হইল, সূতিকাগৃহবাসিনীরা বিধাতা-পুরুষ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠার ...হিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বিপুল বিস্তৃত ভূমণ্ডলে একইদিনে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানাদি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শত সহস্র পিতার অভিনব পুত্র-কন্যার ষষ্ঠ বাসর হইয়া থাকে, বিধাতা তীর-তারা-উল্কার গতিতে ভারত প্রশান্ত অটলাণ্টিকাদি সপ্ত সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া অসংখ্য শিশুর ললাট-ফলকে তাঁহার মামুলী হুকুম লিপিবদ্ধ করিবেন—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইলেও, সাধারণতঃ, হিন্দু মাত্রই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা মানিয়া থাকেন। বিধাতা বেচারার উপরওয়ালা থাকিলে হয়ত তাঁহাকে প্রতি রাত্রিতে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা প্রযুক্ত দণ্ড পাইতে হইত! আর দেবলোকে কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা প্রযুক্ত কোন রূপ দণ্ডবিধান থাকিলে অধুনা প্রতি বৎসর অনাবৃষ্টি ও অজন্মার নিমিত্ত দেবরাজকে নিশ্চয়ই কিছু কালের জন্য বৈজয়ন্তধাম ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ সংশোধনাগারে অবস্থিতি করিতে হইত! বিধাতা-পুরুষ দেবতার জাতি, তাঁহারাই আইন-কানুনের সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টি পালন জন্য আইন-পালকের পক্ষে তাহা খাটিতে পারে না, যে হেতু পাল্য ও পালকে বিভিন্ন সম্বন্ধ। সুতরাং যেখানে পাল্য-পালক সম্বন্ধ সেই খানেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া বিধাতা-পুরুষকে কেহ দেখিতে পাইল না। ইহাতে অন্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে নানা প্রকার জল্পনা চলিতে লাগিল,—কেহ বলিল বিধাতা-পুরুষ আসিয়া-ছিলেন,দেবমূর্ত্তি চর্ম্ম চক্ষের অগোচর,কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না,—কেহ বলিল সকলের ভাগ্যে দেবদর্শন ঘটিয়া উঠেনা, তজ্জন্য পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি সংস্থান আবশ্যক,—কেহ বা গৃহবাসিনীগণের রাত্রি জাগরণে শৈথিল্যের উল্লেখ করিয়া এই সুযোগে ঘটনান্তরে আপন কার্য্যতৎপরতা প্রভাবে তাঁহার সাক্ষাৎ-কার লাভের উপাখ্যানভাগ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সে সকল কথা যাহাই হউক—বিধাতা-পুরুষ আসিয়া থাকুন বা নাই থাকুন, ললাটলিপি লিখিয়া থাকুন বা নাই থাকুন—একথা স্থির যে মানবাদৃষ্ট কর্ম্ম বা ঘটনা সূত্রে আবদ্ধ, কর্ম্মবশে মানবের অবস্থা বহুবিধ। আমার বিবেচনা হয়,"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল"—ইহাই বিধাতা-পুরুষের সাধারণ লিপি। এই লিপি মানবের সহজাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং প্রতি রাত্রিতে বিধাতা-পুরুষের শত সহস্র সূতিকা-গৃহ-পরিভ্রমণ-দায় ইহা হইতেই রক্ষা পাইয়াছে।
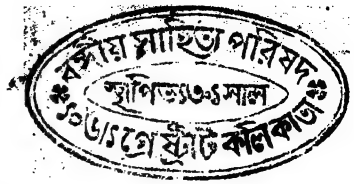
প্রকৃতি-পুরুষ।

"না ছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারি';
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।"

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মূল কথা এই যে, সৃষ্টির প্রথমে এক পরম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু ছিল না। ব্রহ্মের ইচ্ছা ও শক্তি যেই মিলিত হইল, অমনি সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। এই ইচ্ছা ও শক্তিকে পুরুষ ও প্রকৃতি কহে। যেমন দুই হস্ত একত্র করিলে শব্দের উৎপত্তি হয়, তেমনি এই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, উহার মূলে প্রথমতঃ ইচ্ছা, পরে শক্তি। ইচ্ছা ও শক্তির একত্র সংযোগ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। অনেক সময়ে আমাদের প্রাণে কত ইচ্ছার উদয় হয়, কিন্তু শক্তির অভাবে সে ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। পক্ষান্তরে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তির শক্তির অভাব নাই কিন্তু সদিচ্ছার অভাবে শক্তির অনুশীলন না থাকায় তাহা ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব ইচ্ছা ও শক্তির যুগপৎ মিলন প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক এই ইচ্ছা ও শক্তির প্রভাবে মানুষ কি না করিতে পারে? ইচ্ছা বৃক্ষ, শক্তি জল;—ইচ্ছা-বৃক্ষে যতই শক্তি-জল সিঞ্চন করিবে, বৃক্ষ ততই বর্দ্ধিত হইতে ও সাধন-ফল ধারণ করিতে থাকিবে; অধিক কি, সদিচ্ছার অনুশীলন দ্বারা আমরা ইচ্ছা-ময়েরও সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, এই ইচ্ছা ও শক্তির মূল স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহা হইতে যেন দুইটী ধারা বহির্গত হইয়া মানব-জীবনের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই স্রোত সদ্বিষয়ের দিকে যতই প্রবাহিত হইতে থাকে, ততই ইহার বেগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্তরকে ক্রমশঃ উদ্ভাসিত ও পরিপ্লাবিত করিয়া ফেলে। ক্ষুদ্র ইচ্ছা এইরূপে মহৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। সামান্য বালক বালিকাগণের বাল্যাবস্থার ইচ্ছা ও শক্তি জীবনে কত যে মহৎ কার্য্য করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সকলের প্রাণেই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তি বিরাজিত—এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইলে অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়, অলস প্রাণ জাগ্রত হইয়া উঠে। অতএব অন্তর্নিহিত ইচ্ছা ও শক্তির অনুশীলন দ্বারা ঈশ্বরকে অবগত হওয়াই প্রত্যেক জীবনের উদ্দেশ্য।

সহসা অনেকেই মনে করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত কেবল জ্ঞানমার্গের কথা,—ভক্তিমার্গের নহে; কিন্তু যাহা সত্য তাহা সকল পথেই সত্য। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই মত ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষে কতদূর উপযোগী তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

রাধা-কৃষ্ণ-লীলা বৈষ্ণবধর্ম্মের শেষ নহে, ইহার পর আর এক লীলা আছে—যে লীলায় ডুব না দিলে প্রকৃত রস পান করা হয় না। আজ কাল রাধা-কৃষ্ণের যত প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে প্রায় সর্ব্বস্থানেই রাধাকে জীবাত্মা ও কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই যুক্তি অবশ্য অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রেমতত্ত্বের একমাত্র উপাদান। কিন্তু এই দুই মূর্ত্তিকে ভগবানের ইচ্ছা ও শক্তি রূপে কল্পনা করিলে প্রাণ আরও তৃপ্তি অনুভব করে। বৈষ্ণবদিগের ইষ্টদেবতা কৃষ্ণ নহেন, রাধাও নহেন, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ;—একটীকে ত্যাগ করিয়া অপরটী ভজনা করিলে ইষ্ট দেবতার ঠিক পূজা হয় না। কোন বৈষ্ণবের মুখে কেবল রাধানাম বা কৃষ্ণনাম শুনিতে পাওয়া যায় না। ভক্তের প্রাণ সর্ব্বদাই "রাধাকৃষ্ণ" নামে ডুবুডুবু, জিহ্বা অনবরত সেই যুগল নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পবিত্র হয়। বৈষ্ণবেরা এই দুই নাম এরূপ ভাবে সাধনা করেন যে, তাঁহারা সর্ব্বত্রই এই দুই মূর্ত্তির অবিচ্ছিন্ন বিকাশ দেখিতে পান। মৃদঙ্গের সহিত করতালির বাদ্য হয়। করতালি দুই খানি; এক খানি রাধা, অপর খানি কৃষ্ণ; দুইয়ের ঘর্ষণে যে শব্দ হয় সে শব্দ গৌর নাম ব্যঞ্জক। "রাধাকৃষ্ণ" জপে বাস্তবিকই জীব নিজ শক্তির পরিচয় পায় ও অনন্ত শক্তির দিকে ছুটিতে চায়। রাধাকৃষ্ণ লীলার বিশেষ ভাব এই যে, ইহাতে একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এ লীলা জগতে কখনই প্রকাশিত হইত না, যদি প্রেমিক ও প্রেমিকা এক সময়ে আবির্ভূত না হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের নামও, বোধ করি, ধর্ম্ম-জগতে উঠিত না, যদি রাধা বিনোদিনী সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গিনী না হইতেন। আমরা শুক-শারীর বিবাদে শুনিয়াছি—

"শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রে ছিল।
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল॥"

সুতরাং কৃষ্ণ-লীলা রাধা-শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এ লীলায় দুই ভাব—রাধা ও কৃষ্ণ, সুতরাং ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা হইল না; তাই কবি বলিয়াছেন—

"গৌর লীলায় ডুব না দিলে
ব্রজ লীলার ভাব কি জানা যায় রে!"

অতএব গৌরলীলা বৈষ্ণবগণের "প্রাণের প্রাণ"। এই গৌরলীলা রাধা-কৃষ্ণ মাখান, ইহাতে দুই নাই—এক। কৃষ্ণলীলায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যমান, গৌরলীলায় তাহা এক সূত্রে সঞ্জড়িত,—একাধারে সম্মিলিত। রাধার "শক্তি," কৃষ্ণের "ইচ্ছা"— এই দুই উপাদানে গৌরাঙ্গের গঠন। "স্বপ্নবিলাস" নামক ব্রজলীলাত্মক নাটকে রাধা-কৃষ্ণের কথোপকথনচ্ছলে এই গৌর মূর্ত্তিকে অতি সুন্দর রূপে বিবৃত করা হইয়াছে, যথা—

রাধিকা।　"ওহে বঁধু, কহ দেখি সে নাগর কে?
স্বপনে আজ দেখেছি যা'কে,
সে তুমি, না কি আমি, বঁধু নিশ্চয় বল আমাকে।
তোমার মত অঙ্গের গড়ন, আমার মত গৌর বরণ,
সে যে ব্রহ্মার দুর্ল্লভ হরি নাম, বিলা'তেছে যা'কে তা'কে॥"

কৃষ্ণ।　"দর্পণাদ্যে হেরি, প্রিয়ে, আপন মাধুরী,
আস্বাদিতে বাঞ্ছা করি, আস্বাদিতে নারি।
তোমার স্বরূপ বিনে, নহে আস্বাদন,
এই হেতু হ'তে হ'বে গৌর বরণ॥"

গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন মনুষ্যের ভাগ্যে কদাচিৎ সম্ভবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তি স্বতন্ত্র ভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত। মনুষ্য নিজ জীবনে,অপর প্রাণী-জীবনে, এমন কি জড়-জগতেও, এই দুই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ দেখিতেছে, কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় কেবল গৌরাঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য গৌরাঙ্গ প্রভু স্বয়ং ভগবান বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়াছেন যে, যাঁহারা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ যদি এই কথা কয়টী বিশ্বাস করেন তবে যথেষ্ট হইল :—

১ম—শ্রীভগবান আছেন।
২য়—তিনি গুণের নিধি।
৩য়—তাঁহাকে পাওয়া যায়।

বাস্তবিক যে সকল বৈষ্ণব শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারা যে প্রথমোক্ত অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসী—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গৌরলীলা স্বয়ং ভগবানের লীলা ও পরিচয় মাত্র। ইহা নিত্য ও জন্ম মৃত্যুর অতীত। অতএব, যদি গৌরলীলা বিশ্বাস করিতে চাহ, ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইবে, নতুবা গৌরচন্দ্রকে চিনিতে পারিবে না। গৌরচন্দ্র কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিরোহিত হইয়াছেন,—এ কথা বলিলে প্রাণে বড় বাজে। গৌর চির বিদ্যমান, নিত্য, সত্য এবং কাল ও দেশের অতীত। যদি গৌরের তিরোভাবে গৌর-লীলারও অন্ত হইয়া থাকে, তবে মৃদঙ্গে ঘা পড়িলে, করতালির বাদ্য কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে,সে ভক্তির স্রোত—সে প্রেমের আবেশ—কোথা হইতে আসে? "হরি ব'লে আমার গৌর নাচে" গাহিলে প্রাণ অবশ হইয়া আসে কেন,—সংজ্ঞা শূন্য হয় কেন? সত্য সত্যই গৌর-লীলা-রসে ডুবিলে প্রাণ যেন অন্য কোন্ জগতে চলিয়া যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তির সংযোগে গৌরলীলা; এই লীলার ফাঁদে যিনি পড়িলেন, তিনি টানে টানে অসার সংসার হইতে সার বৈকুণ্ঠ-ধামে আকৃষ্ট হইলেন। এ মহাশক্তি সকল বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রাণকে কেবল নিজ বক্ষের নিকট টানিয়া লইতে চাহে।

আক্ষেপের বিষয়, অধুনাতন অধিকাংশ বৈষ্ণবগণ, সাধারণতঃ, গৌরাঙ্গ প্রভুকে "নবদ্বীপের ঠাকুর" বলিয়া ছোট করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে মহাপ্রভুর নিত্য ও সত্য ভাবের অপলাপ করা হইয়াছে,—তাঁহার ব্রহ্মত্ব লোপ পাইয়াছে। তাই লোকে নবদ্বীপে যাইতেছে, বৃন্দাবনে যাইতেছে, কিন্তু কোথাও প্রাণ পবিত্র হইতেছে না, প্রকৃত গৌরদর্শন ঘটিতেছে না। এক বার গৌর-দর্শনে মানুষ সোণার মানুষ হয়। এ সোণার মানুষ জগতে অতি বিরল। মুখে চীৎকার করিলে গৌর-দর্শন হয় না। যদি সোণার মানুষ হইতে চাও, যদি সত্য সত্যই গৌর-দর্শনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে, তবে শক্তি দেবীর আসিবার আর বিলম্ব নাই। প্রকৃতি পুরুষ একত্র হইলে তোমার ভবসাগর-পারের তরণী প্রস্তুত হইবে। সেই নৌকায় উঠিয়া "রাধাকৃষ্ণ" নাম জপ করিতে করিতে "গৌর-তীর্থে" উপনীত হইবার জন্য প্রস্তুত হও, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আসিয়া সেই জ্ঞানাতীত, মায়াতীত, নির্ব্বিকার ব্রহ্মে লইয়া যাইবেন,—অসম্ভব সম্ভব হইবে,—জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটিবে,—মনুষ্য দেবতা হইয়া পরম ব্রহ্মে লীন হইবে,—এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারে অনন্ত শান্তির ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

রামচন্দ্র কবিরাজ।

আমরা রামচন্দ্র কবিরাজ কৃত একখানি বাঙ্গালা পুথি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে আমাদিগের মনে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। কেন?—পশ্চাৎ বলিব; অগ্রে সঙ্ক্ষেপে গ্রন্থকারের পরিচয় দিই।

রামচন্দ্রের পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা। চিরঞ্জীব শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে মূলশাখা বর্ণন পরিচ্ছেদে চিরঞ্জীবের নাম পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের মাতামহ বিখ্যাত দামোদর পণ্ডিত। দামোদর নৈয়ায়িক ও শক্তি-উপাসক ছিলেন। ভক্তি রত্নাকরে লিখিত আছে, তিনি—

"গীত পদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন।
শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গীগণ॥"

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ, ইনিই স্বনামখ্যাত পদকর্ত্তা। রামচন্দ্র ও গোবিন্দে মাতৃকুলের কবিত্ব ও পিতৃকুলের বৈষ্ণবত্ব সংক্রামিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। এখন যেমন অধিকাংশ 'শিক্ষিত' গণের নিকট বঙ্গভাষা অকিঞ্চিৎকর, তখনও প্রায় তদ্রূপ ছিল। "প্রায়" বলিলাম, কারণ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ সেরূপ মনে করিতেন না।

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর, শ্রীনিবাস আচার্য্য, * নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়; প্রকৃত পক্ষে ঐ সময়কে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সমুন্নত অবস্থা বলা যাইতে পারে। কোন নূতন মত প্রচারিত হইলে তাহা বুঝিতে লোকের অনেক সময় আবশ্যক হয়, শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে প্রথমতঃ কতক তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্যের সময়ে সাধারণ লোক দলে দলে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে। ঐ সময়েই গোস্বামীগণের ভক্তি গ্রন্থাদি প্রচারিত হইয়াছিল; তাহাতেও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার পক্ষে অনেক সুবিধা ঘটে। এই প্রচার-কার্য্যে রামচন্দ্র একজন প্রধান ছিলেন।

শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে একদিন নিজবাটীসংলগ্ন পুষ্করিণীর তটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, একটী রূপবান যুবক বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত

---

* শ্রীনিবাসাচার্য্যের ১৪৫৩ শকাব্দে জন্ম হয়, রামচন্দ্র কবিরাজ ইঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

হইয়া দোলারোহণে যাইতেছে। বরের রূপের তুলনা নাই। রূপ দেখিয়া অনাসক্তচিত্ত শ্রীনিবাসও মোহিত হইলেন। তখনই তাঁহার মনে একটি ক্ষোভের উদয় হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—

"কি অপূর্ব্ব যৌবন দেবতা মনে লয়।
এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

(ভক্তিরত্নাকর।)

দোলায় বসিয়া রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের কথা শুনিতে পাইলেন ও মনে মনে তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে আচার্য্যের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল; পরদিনই তিনি শ্রীনিবাস সন্নিধানে আগমন করিলেন। উভয়ে কিছু শাস্ত্রালাপ হইল, উভয়ে উভয়ের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজীবের শাণিত অস্ত্র,—রামচন্দ্রকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল। শ্রীনিবাসও রামচন্দ্রের ন্যায় দেশবিখ্যাত পণ্ডিতকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। আনন্দে তখন—

"আচার্য্য দু'বাহু তাঁর ধরি' দুই করে।
উঠাইয়া গাঢ় হর্ষে আলিঙ্গন করে॥"

(ভক্তিরত্নাকর।)

এই রামচন্দ্র আর নরোত্তম শ্রীনিবাসের দুই বাহু স্বরূপ ছিলেন। রামচন্দ্রের বৈষ্ণবতা ও অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে কনিষ্ঠ গোবিন্দ প্রথমতঃ বিস্মিত হয়েন, কিন্তু অচিরে তিনিও জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করেন। শ্রীনিবাস হইতে দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত হওয়ার পর গোবিন্দ যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইয়েন, তাঁহার মনে তখন যে ভাবের উদয় হইল, ছন্দোবন্ধে তাহা প্রকাশ করিলেন—

"ন দেব কামুক, না দেবী কামিনী, কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর, চরণে কিঙ্কর, কহতহি গোবিন্দ দাস॥"

তখনও গোবিন্দ পূর্ব্বাভ্যাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। "যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে"—সেই কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ দাসের প্রথম পদ ইহাই। গোবিন্দের এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া শ্রীনিবাস তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন—

"স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ লীলা।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে রচিলা॥"

(প্রেমবিলাস।)

গোবিন্দদাস গুরুর আদেশ যে সম্যক্ প্রতিপালন করেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠ-

কের অবিদিত নহে। গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতিকে আদর্শ রাখিয়া পদ রচনা করেন।*

রামচন্দ্র কেবল মাত্র দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, কবিও ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"রামচন্দ্র নাম কবি নৃপতি বিদিত।
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বী প্রবর।
বৈদ্যকুলোদ্ভব বাস কুমার নগর॥"

এই কুমার নগরে রামচন্দ্র চিরদিন ছিলেন না, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরেই তিনি কুমার নগর ত্যাগ করিয়া পদ্মানদীর সন্নিকট তেলিয়াবুধরি গ্রামে আগমন করেন।

সেই সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বড় আক্রোশ ছিল, থাকিবারই কথা। রামচন্দ্রের স্থায় একজন দিগ্বিজয়ী ও পদস্থ পণ্ডিতকে বৈষ্ণব হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন ও নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। একদিন রামচন্দ্র নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, তাঁহাকে রীতিমত শিবপূজা করিতে না দেখিয়া কোন পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"কি গো, তোমাদের কৃষ্ণ শিবের দাস। তুমি কি এতই বড় হইয়া গেলে যে, শিব পূজা কর না।" রামচন্দ্র সেই ক্রুদ্ধ বিপ্রের সহিত তর্ক করিলেন না, কিন্তু তিনি তখনই দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া বলিলেন। শ্লোক দুইটি এই—

"শিবোভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ং
তথা সমতয়াথবা বিধিহরাদি মূর্ত্তিত্রয়ং।
বিলোক্য ভববেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গ ক্রমং
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেন্দ্র দাস্যং শ্রিতাঃ॥ ১।
প্রহ্লাদধ্রুবরাবণানুজবলিব্যাসাম্বরীষাদয়-
স্তেঽশ্রীবিষ্ণুপরায়ণা বিধিভব প্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ।
যেঽন্যে রাবণবাণপৌণ্ড্রকশিপুক্রোঞ্চাদিকা অপ্যহো
যদ্ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়াঃ ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥ ২।"

---

* গোবিন্দদাস দুই জন ছিলেন—একজন মৈথিল—জাতি ব্রাহ্মণ। পদকল্পতরুর ১৭৮৩ সংখ্যক পদের টিপ্পনিতে ইঁহার কথা লিখিত আছে। "প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে" গতিগোবিন্দের পদ গোবিন্দদাসের পদের সহিত ছাপা হইয়াছে। কিন্তু গতিগোবিন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র, ইহা সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত—প্রসিদ্ধ কথা।

[শিব বিষ্ণুর উপাসনা করেন বলিয়া বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, অথবা বিষ্ণু শিবের উপাসক বলিয়া শিবই জগদুপাস্য হউন, কিম্বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন জনই সমভাবে জগৎ পূজ্য হউন। আমরা ব্রহ্মা শিবের ভক্তগণের ক্রম অবলোকনে ভগবানের আশ্রয় লইয়াছি। ১।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ,অম্বরীষাদি বিষ্ণুপরায়ণ ; এজন্য (শাস্ত্রে কথিত আছে) তাঁহারা ব্রহ্মা ও শিবের পরম প্রিয় ও জগন্মঙ্গল কারণ। কিন্তু রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি ব্রহ্মা ও মহাদেবের ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের প্রিয় হয় নাই, হরিরও প্রিয় হয় নাই, সুতরাং জগদ্বৈরী হইয়াছিল। ২।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য দেবতার প্রতি দ্বেষ থাকিলে স্বীয় আরাধ্য দেবতাও বিমুখ হয়েন।]

এই প্রতিভাজাত সদুত্তর শ্রবণে প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মণ লজ্জিত ও নিরস্ত হইলেন। রামচন্দ্রও চলিয়া আসিলেন।

ইহার পর রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন, সেইখানে গোস্বামীগণ তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। যথা—

"বৃন্দাবনে শ্রীভট্টগোস্বামী আদি যত।
সবে রামচন্দ্রে প্রশংসয়ে অবিরত॥
শুনি' রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার।
কবিরাজ খ্যাতি হইল সম্মত সবার॥"

(ভক্তিরত্নাকর।)

গোবিন্দদাসের পদও গোস্বামীগণের নিকট তুল্য রূপে আদৃত হইয়াছিল, এমন কি শ্রীজীবগোস্বামী পদ পাঠাইবার জন্য বৃন্দাবন হইতে গোবিন্দদাসকে পত্র লিখিতেন।* গোস্বামীগণ গোবিন্দদাসকেও "কবিরাজ" উপাধি দান করিয়াছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজের কৃত "সঙ্গীতমাধব" নামে সংস্কৃত একখানি নাটক আছে। রামচন্দ্র প্রসিদ্ধ সংস্কৃত লেখক ; সুখের বিষয়, তিনি বঙ্গভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না—"স্মরণ দর্পণ" নামক গ্রন্থখানিই তাহার

---

* গোবিন্দদাসের প্রতি শ্রীজীবের পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—"সম্প্রতি বৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনময় স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে। পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যং।" গোবিন্দদাসের পদের ইহা হইতে গৌরব আর কি ?

পরিচয়। আমরা ঐ গ্রন্থের একশত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত একখানি প্রতিলিপি পাইয়াছি। ঠাকুর মহাশয়ের "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন ; "স্মরণ দর্পণ" অনেকাংশে তৎসদৃশ,—এক ভাবেরই রচনা। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, গ্রন্থের মধ্যস্থিত একটি পাতা নাই। আমরা বহু স্থানে এই গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কেহ ইহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। "সাহিত্য সেবক" প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশের পক্ষপাতী ; তাই নিবেদন,— যদি উহার লেখক, পাঠক বা গ্রাহকের মধ্যে কেহ ঐ গ্রন্থ খানির তত্ত্ব অবগত থাকেন, তাহা "সাহিত্য সেবকে" প্রকাশ করিয়া বা প্রস্তাব লেখককে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।*

স্মরণ দর্পণে—

"শ্যাম অঙ্গে ঝলমল, ধাতু প্রবাল দল,
এত রূপে নিরমিল বিধি।
অষ্টাদশ বৎসর করি, তবে সে ভজিতে পারি,
অসীম গরিমা গুণ নিধি॥
তার বামে রঙ্গিণী, লাবণ্য ভুবন জিনি,"

(ইহার পর হইতে কতক অংশ নাই।)

(তৎপরে)

"তবে রস পুষ্টি লাগি, রূপে গুণে ডগমগি,
সখি রূপে তাহে করি ভেদ॥"

[এই পদ হইতে শেষাংশ সম্পূর্ণ আছে।]

সে যাহা হউক, রামচন্দ্রের কাহিনী অতি সুমধুর ও সুবিস্তৃত ; এই প্রস্তাবে তাহার অতি অল্প কথাই বলা হইল। এস্থলে আমরা রামচন্দ্র রচিত একটি বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম—

"পহুঁ মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি মহিমা যাঁর গায়॥

---

*'সাহিত্য-সেবক' সম্প্রতি 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যদি কাহারও নিকট উক্ত 'স্মরণ-দর্পণ' গ্রন্থ থাকে, তবে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী (কানাইয়ের বাজার, ময়না পোষ্টাপিস, শ্রীহট্ট) অথবা 'শিলং সাহিত্য-সভা'র সম্পাদককে জানাইয়া সাহিত্য জগতের উপকার সাধন করিবেন। সা-সে-স-স।

কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলী।
সে পহুঁ কাঁদয়ে হরি বলে বাহু তুলি॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
কীর্ত্তন ধূলায় সে ধূসর অবিরাম॥
ক্ষণে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
রহে নরহরি গদাধর মুখ চাইয়া॥
পুরুব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝেও না রঙ্গ॥"

কবিতা-কুঞ্জ।

(১)

শিশু-মঙ্গল।

"Shades of the prison house begin to close
Upon the growing boy.—"

Wordsworth.

এ যে সুকঠিন ধরা—উপল বন্ধুর—
হেথায় পড়িলি কোন্ সুরপুর হ'তে—
অনাবিল! নিষ্ঠুর এ সৃজনের স্রোতে
কে তোরে ভাসালে বল্? আজিও যে সুর
কাণে লেগে তোর—উর্ব্বশীর বীণাধ্বনি,
নন্দনের তটবাহী কলমন্দাকিনী—
অলোক মন্দারগন্ধে নেশা ভরপুর!
এমন সরল মন, দেবের হৃদয়,
থাক্, শিশু, চিরকাল—চিরজ্যোৎস্নাময়—
এ মলিন মর্ত্ত্যাবাস হোক্ সুমধুর,—

হোক্ প্রীতি পবিত্রতা এই ধরাধাম
শুনি' তোর অমরার বাণী প্রাণারাম,—
দেখি' ও সারল্যপূর্ণ পবিত্র মু'খানি ;
মিথ্যা শুধু স্বর্গ,—আর ঈশ্বরে না মানি !

---

(২)

বিল্ববৃক্ষ ।

কি আছে তোমাতে বল ?
স্বরগের পবিত্রতা ?— মরতের গঙ্গাজল ?
আঙ্গিনার এক ধারে
সম্ভ্রমে র'য়েছ স'রে,
শোভি'ছে নীহার-কণা— শত মন্দারের ফল !
কি আছে তোমাতে বল ?

কি মহান্ অবয়ব !
সুগম্ভীর স্তব্ধ রব
ঢালি'ছে মানব-প্রাণে বৈরাগ্যের শান্তি-জল !—
আকাশে কনক-কুচি,
শুভ্র নিরমল শুচি,
তারকা ঢালি'ছে শিরে প্রেম-ধারা অবিরল !
কি আছে তোমাতে বল ?

---

(৩)

কে তুমি ?

নিরাশার তমিস্রার মাঝে, ক্ষীণপ্রাণ
দেউটীর মত, কে তুমি, গো আদরিণি,
আশার তড়িত-লেখা দিতেছ আঁকিয়ে ?—

সযতনে দিতেছ বাঁধিয়ে হৃদয়ের
ছিন্ন তার গুলি ?—আজি কত দিন হ'ল,
কোন সন্ধ্যাকালে, কোথায় মেঘের কোণে,
কে যেন গাহিয়েছিল, অতি সকরুণ
ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে, ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি
ক্ষুদ্র এক খানি গান ; তুমি যেন তা'রি
আধ-ফুটো গোটা দুই কথা,—কিম্বা তা'রি
নয়নের এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল !
কিম্বা তুমি কি, গো, মানস-দর্পণে আঁকা
সুখময় অতীতের শান্তিময়ী ছায়া ?—
নিবে যাও স্মৃতি তবে,—টুটে যা'ক্ মায়া !

আলোক-চিত্র-বিদ্যার উপযোগিতা।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, আলোক-চিত্র কেবল নয়ন-বিমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে ইহা দ্বারা অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও আবিষ্কৃত হইতেছে। য়ুরোপের বৃহৎ চিকিৎসালয় সমূহে ইহার সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের চিত্র সমুদায় অঙ্কিত হইতেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও কেমেরার (Camera) সাহায্যে জীবাণুতত্ত্বের (Bacteriology) অনুশীলন হইতেছে এবং জীবাণুগণ যে সংক্রামক ও লোকবিনাশক ব্যাধি সমূহের কারণ তাহা চিকিৎসকগণ অবগত হইতে পারিতেছেন। ফটোগ্রাফির সাহায্যে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির মানচিত্র অঙ্কিত হইতেছে। একমাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে সকল নক্ষত্র ও নীহারিকা (Nebula) প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তত্ত্ব জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এত দিন অবগত হইতে পারেন নাই, অধুনা তৎসঙ্গে ফটোগ্রাফির সাহায্যে তাহা অতি অল্প সময়ে ও সুস্পষ্ট রূপে অবগত হইতে পারিতেছেন। (১)

(1) The marvellous details photographed in the Andromeda Nebula, the spiral Nebula in Canes Venetici, in the Pleiades and in other Nebulæ,

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার সাহায্যে পৃথ্বীস্তরের চিত্র সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এমন কি বায়ুবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ (Meteorologists) পর্য্যন্ত গগনমণ্ডলস্থ মেঘমালার আলোক-চিত্র লইয়া তদ্দ্বারা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও ঝটিকাদি কখন্ কোন্ স্থানে হইবার সম্ভাবনা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। শুনা যায়, এতদুদ্দেশ্যে য়ুরোপের প্রধান প্রধান কয়েকটী নগরে সম্প্রতি কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক মেঘের চিত্র লওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ফটোগ্রাফীর সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণীত হইতেছে,—অধিক কি,যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যন্ত শত্রুর গতিবিধি অবগত হইবার জন্ম ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে দলিল-পত্রাদি জাল করিলে তাহা বাস্তবিক জাল কি না নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণ করিবার বিশেষ কোন উপায় ছিল না। ফটোগ্রাফী সে অভাবও দূর করিয়াছে। আইরিশ দলপতি পার্ণেলের (Parnell) বিপক্ষগণ তাঁহার বিরুদ্ধে কতকগুলি অমূলক পত্র কমিশন (Commission) সমক্ষে উপস্থিত করিলে সেই গুলি যে জাল, ফটোগ্রাফির সাহায্যে তাহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। পুলিস এবং ডিটেক্‌টিভ বিভাগেও ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ দস্যু ও তস্করদিগের আলোক-চিত্র পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারালয়ে অপরাধীগণের স্বরূপ নির্দ্দেশ (identification) পক্ষেও ইহা সামান্য উপযোগী নহে।

সভ্যতার অভ্যুত্থানে দিন দিন অসভ্য জাতি সমূহের বিলোপ ঘটিতেছে। হয়ত এমন সময় উপস্থিত হইবে যখন য়ুরোপীয় ও অন্যান্য দেশীয় সভ্য জাতির সংমিশ্রনে অসভ্য জাতিদিগের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে ও তাহা হইলে সেই সমস্ত অসভ্য জাতির আদিম ভাব ও বেশ-ভূষাদি নির্ণয় করা দুরূহ হইবে। বস্তুতঃ ইংরাজরাজের সমাগমে আমাদিগের ভারতবর্ষেই অনেক বর্ব্বর জাতির বসন-ভূষণ, আচার-ব্যবহার অতি দ্রুত গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া মানব-দেহ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ (Anthropologists) অসভ্য জাতিবর্গের আকৃতি, বেশভূষা, গৃহ-সামগ্রী ও আচার-ব্যবহার প্রভৃতির পরিচয়-

---

have clearly demonstrated that more can be learned by photographing these objects than can possibly be ascertained by an eye observation with the most powerful telescopes in the world."

—*Anthoney's International Annual of Photographic Bulletin for 1891-92.*

সূচক আলোক-চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিতেছেন। ভবিষ্যতে এই সমস্ত চিত্র মানব জাতির ইতিহাসে অতি উপাদেয় ও আদরের বস্তু হইবে।

চিত্রকরগণও ইহার উপযোগিতা ও উপকারিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। এমন এক সময় ছিল, যখন অতি সুনিপুণ চিত্রকরও বিভিন্ন মনুষ্যের মুখাকৃতি মধ্যে পার্থক্য-রেখা-সম্পাত করিতে সমর্থ হইতেন না; একারণ তাঁহাদিগের অঙ্কিত চিত্রাবলোকনে, মুখাকৃতির 'সৌসাদৃশ্য বশতঃ, সকলকেই এক পরিবারভুক্ত ভ্রাতা-ভগ্নী বলিয়া দর্শকের মনে সন্দেহ জন্মিত,—ফলতঃ চিত্র দেখিয়া লোক নির্ণয় করা সহজ হইত না। এমন কি, অনেক সময় চিত্রাঙ্কিত ব্যক্তি সম্মুখে থাকিলেও এ যে তাঁহারই প্রতিকৃতি তৎপক্ষে কোন মতেই প্রতীতি জন্মিত না। তখন স্বভাবতঃই মনে হইত—

> "Menodotes' portrait here is kept, most odd it is,
> How very like to all the world, except Menodotes."

অধুনা ফটোগ্রাফী চিত্রকরগণের সেই ত্রুটী অপনয়ন করিয়াছে। তাঁহারা দ্রুতগামী ঘোটকের পদ, উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষ, ক্রীড়নশীল মনুষ্যের হস্তপদাদি কখন কোন্ ভাগে থাকে তাহা ফটোগ্রাফীর সাহায্যে নির্ণয় করিয়া যথাযথ অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইতেছেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কাষ্ঠ কিম্বা তাম্রফলক খোদিয়া যে সকল ছবি প্রস্তুত করা হইত তাহা এখন এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। এখন ফটোগ্রাফির সাহায্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদ পত্রে অতি সুন্দর চিত্র অতি অল্প ব্যয়ে সন্নিবেশিত হইতেছে। ফটোগ্রাফির সাহায্য অভাবে পূর্ব্বে সচিত্র দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল; অধুনা বিলাতের Graphic নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকাতে একমাত্র ফটোগ্রাফির সাহায্যে প্রতিদিন বিবিধ চিত্র অঙ্কিত হইতেছে।

অতি অল্পদিন হইল জর্ম্মনদেশীয় অধ্যাপক রোয়েণ্টজেন (Röntgen) এক প্রকার তাড়িতালোকের সাহায্যে জীবিত মনুষ্যের দেহস্থ অস্থির ও কাষ্ঠ বা কাগজনির্ম্মিত বাক্সের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর চিত্র উঠাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া সমস্ত সভ্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এই আবিষ্কার দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। এই আলোক কাষ্ঠাবরণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থিত পদার্থে পতিত হইতে পারে। সুতরাং গৃহের দ্বার উন্মোচন না করিয়াই তন্মধ্যস্থিত পদার্থের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা যাইতে পারে। কিন্তু কেমেরা যন্ত্র দ্বারা

যেরূপ ইচ্ছামত ছোট কি বড় ছবি লওয়া যায়,ঐ আলোকের দ্বারা তাহা হয় না। এই অভাব বোধে রোয়েণ্টজেন অচিরে ইহার সঙ্গে কেমেরা যন্ত্র সুকৌশলে সংযুক্ত করিয়া এমন এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, তৎপ্রবর্ত্তিত আলোক-চিত্র ইচ্ছানুরূপ ছোট কিম্বা বড় করা যাইতে পারে। এ স্থলে সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক।

ফলতঃ, ফটোগ্রাফির আবিষ্কারকাল হইতে এই কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইহা মানব-সমাজের অতি প্রয়োজনীয় নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, এবং কাল সহকারে, হয় ত, আরও কত কল্যাণকর কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ইহা এখনও একমাত্র বিলাসের বিষয় বলিয়াই পরিগণিত হইতেছে। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকৃতি রক্ষা করা ভিন্ন ইহার দ্বারা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে,—আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাহা বুঝিয়া থাকেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। আমাদের সে শিক্ষা নাই, সে দৃষ্টি-শক্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা সেই অতুল সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতে পারি। আলোক-চিত্র-বিদ্যাশিক্ষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা প্রকৃতির গুপ্ত সৌন্দর্য্য আমাদের চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেয় এবং তাঁহাতে বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। দিগন্তপ্রসারী গগনমণ্ডলে, অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে, নিভৃত শৈল-নিকুঞ্জে, সুদূর বনস্থলী মধ্যে এবং সম্মুখস্থ সামান্য বৃক্ষ-পত্রে ও ফল-পুষ্পে চিত্রকর এমন সৌন্দর্য্য অনুভব করেন যাহা সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। তিনি যখন চতুর্দ্দিকস্থ নরনারী ও বালক-বালিকাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন তখন তাহাদের সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। তিনি বৃক্ষহীন পর্ব্বত-শিখরে, পত্রহীন বৃক্ষশাখায়, আলোক ও ছায়ার খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন। আলোক-চিত্র-বিদ্যা উপলক্ষ করিয়া প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার মন নিখিল সৌন্দর্য্যাধার বিশ্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়, তিনি তখন বিস্ময়-বিহ্বল বিমুগ্ধ ভাবে, কৃতজ্ঞতার আকর্ষণে, বলেন—"What hath Good wrought!"

দুর্গাপঞ্চরাত্রি ।

ষষ্ঠী পালা ।

প্রতিমা-গঠন ।—(৩) অষ্টনায়িকাদি ।

কঞ্চুলী লিখিয়া বিশ্বকর্ম্মা ভাবে মনে । তা'র পর করে অষ্টনায়িকা (১) গঠনে ॥
অষ্টদল পদ্ম এক প্রসব (২) নির্ম্মা'ল । তাহার কর্ণিকা (২) মধ্যে দেবীরে স্থাপিল ॥
অষ্ট সুনায়িকা অষ্ট দিকে অষ্টদলে । তা'তে নির্ম্মাণের যোত্র (৩) কৈল কুতূহলে ॥
পূর্ব্বদলে রুদ্রচণ্ডা গোরচনা আভা । অগ্নিকোণে অগ্নিবর্ণা প্রচণ্ডার প্রভা ॥
চণ্ড-উগ্রা কৃষ্ণজ্যোতি দক্ষিণ দলেতে । নীলবর্ণা সেই চণ্ডনায়িকা নৈর্ঋতে ॥
শুক্ল দীপ্তি চণ্ডারে পশ্চিমে নির্ম্মাইল । ধূম্রকান্তি চণ্ডাবতী বায়ব্যে স্থাপিল ॥
উত্তর দলেতে চণ্ডরূপা পীতজ্যোতি । ঈশানে চণ্ডিকা অতিপাণ্ডুর আকৃতি ॥
সকলে ষোড়শ ভুজা সবে সিংহবাহা । আলীঢ়স্থা (৪) মহিষ-মর্দ্দনে সবে স্পৃহা ॥
মূর্দ্ধজ খেটক ঘণ্টাঙ্কুশ ধনুধ্বজে । পাশ শক্তি আদি অস্ত্র অষ্ট বামভুজে ॥
মুদগর ত্রিশূল বজ্র খড়্গাঙ্কুশ শরে । চক্র আদি অষ্টায়ুধধৃতদক্ষ করে ॥
নবীন যৌবনী পীনস্তনী সমতেজা । এ অষ্টনায়িকা মধ্যে দেবী দশভুজা ॥
সব্যে অপসব্যে জয়া বিজয়া নির্ম্মাণ । দক্ষিণ কমলে সে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ॥
তারে যে নির্ম্মাণ কৈল কিদিব তুলন । এ নহিলে হৃদে কি ধরেন নারায়ণ ॥
তপ্ত জাম্বুনদ (৫) অঙ্গ ত্রিভঙ্গ ললিত । বদন দেখিলে কোটী মদন মোহিত ॥

---

(১) অষ্ট নায়িকা—"মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তীচাপরাজিতা । নন্দিনী নারসিংহীচ কৌমারী-ত্যষ্ট নায়িকা ॥"—কিন্তু কবি এখানে কালিকাপুরাণোক্ত 'দুর্গা-পূজা-পদ্ধতি' অবলম্বন করিয়াছেন ।

(২) প্রসব—পুষ্প । কর্ণিকা—পদ্ম মধ্যস্থ বীজকোষ ।

(৩) যোত্র—স্থান । অষ্ট দেবীর ধ্যান 'দুর্গা-পূজা-পদ্ধতি'তে দ্রষ্টব্য ।

(৪) আলীঢ়—শরাদি ক্ষেপণ কালে উপবেশন বিশেষ । "বিতস্ত্যন্তরণৌ পাদৌ মণ্ডলং তোরণাকৃতী । সমানৌস্যাৎ সমপদমালীঢ়ং পরমগ্রতঃ । দক্ষিণং বামমাকুঞ্চ্য প্রত্যালীঢ়ং বিপর্য্যয়ে ।"

(৫) জাম্বুনদ—স্বর্ণ ।

চতুর্ভুজা মহাতেজা কমলধারিণী। উচ্চ কুচ ক্ষীণ কটী সুন্দর সুশ্রোণী (৬)॥
নীল পট্ট কটিতটে কিঙ্কিণী ললিত। চরণ উপরি মণি মঞ্জীর (৭) রঞ্জিত॥
নাসাতে বেশর কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল। ভালেতে সিন্দুর-বিন্দু করে ঝলমল॥
অধরে লালিমাতুল (৮) প্রবালের প্রায়। হাস্যযুক্ত মুখ যেন অমৃত চুয়ায়॥
নানা আভরণেতে সাজা'ন হরিপ্রিয়া। সমাদরে সরস্বতী গড়ে মন দিয়া॥
বামেতে বিমল শুভ্র কমল উপরে। রৌপ্যজিত দিব্য দেহ পরম সুন্দরে॥
হিমকরবর নিন্দি বদন উজ্জ্বল। নিন্দি ইন্দিবর নেত্রে রঞ্জিত কজ্জল॥
বাম করে বীণা দক্ষে বাজা'ন ললিত। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীতে বেষ্টিত॥
নানা হারে অলঙ্কারে আবেশে সাজা'ল। বেণীতে কনক ঝাঁপা আন্দোলিত কৈল॥
যাঁর অনুগ্রহ বিনা মূক এ সংসার। তাঁহার বর্ণনা করে হেন ভাব (৯) কা'র॥
বামেতে সাত্বিক ভাবে কার্ত্তিকে বনায়। ময়ুর বাহন যাঁ'র কনকের কায়॥
শঙ্করীর প্রিয় সুত সুন্দরের সীমা। মস্তকে মণ্ডিত চিত্র উষ্ণীষ লালিমা॥
অসংখ্য মদন জিত বদন বিমল। কমলের দল তুল লোচন যুগল॥
অতনুর (১০) ধনু নিন্দি ভ্রূযুগ সুন্দর। জিত করীশুণ্ড ভুজদণ্ড মনোহর॥
বাম করে বলয় বিপুল ধনু ধরি'। দক্ষিণেতে বাণ সুসন্ধান তুণ পূরি'॥
জামার উপরেতে ঝিলিম ঝলমল। পৃষ্ঠভাগে তুণ বাণ শাণিত সকল॥
কোমরে কাতার তা'র পুটকা (১১) উপরে। পদে উপানহ তা'তে মণি থরে থরে॥
হৃদি মাঝে কিবা সাজে মণি মুক্তা মালা। অহিবর উপরি অবণী করে আলা॥
প্রতিমা উপরে করে মহেশ নির্ম্মাণ। দুর্গাপঞ্চরাত্রি গায় জগত অজ্ঞান॥

প্রতিমা-গঠন।—(৪) মহাদেব।

বৃষ'পরে বৃষধ্বজে, গড়ে বিশাই (১২) কি অব্যাজে, রজত বিজিত কলেবর।
জটাজূট মৌলীমাঝে, জাহ্নবী যাহাতে সাজে, চারু চন্দ্র শোভিত সুন্দর॥

---

(৬) সুশ্রোণী = সুনিতম্বা।
(৭) মঞ্জীর = নূপুর।
(৮) লালিমাতুল (লালিমা = রক্তিমা, তুল = পরিমাণ)—রক্তিমার অনুকরণ।
(৯) ভাব = সাধ্য।
(১০) অতনু = মদন।
(১১) পুটকা = খাপ, আবরণ বিশেষ।
(১২) বিশাই = বিশ্বকর্ম্মা।

প্রফুল্লিত পঞ্চ আস্য, মন্দ মন্দ সুধা হাস্য, স্থর শশি বহ্নি ত্রিনয়ন।
কর্ণেতে স্বর্ণের ফুল, নাসার নাহিক তুল, শ্মশ্রু-পাটা পরম শোভন॥
মণিযুত ফণীমালে, লম্বমান দিব্যগলে, কালকূট কণ্ঠেতে কালিমা।
অতি সুবিশাল বক্ষ; তাতে মাল্য সে রুদ্রাক্ষ, তুন্দিল জঠর পরিসীমা॥
নাভিপদ্ম চক্রাকার, যেমত সরসী সার, ব্যাঘ্র চর্ম্ম কটিতে বেষ্টিত।
জলজ অরুণ পদ, ভজিলে ভঞ্জয় খেদ, তা'তে মণি-মঞ্জীর ললিত॥
নখ-ইন্দু পদাঙ্গুলে, ভ্রমর ভ্রমিয়া বুলে (১৩), হেন বিধি করিল নির্ম্মাণ।
জানুসীমা ভুজদণ্ড, যেন যুবা করি-শুণ্ড, তা'তে শোভে ডমরু বিশান॥
সিদ্ধ ঝুলী কক্ষদেশে, মহাকাল দক্ষ পাশে, বামে নন্দী অঙ্গ-ভঙ্গি করে।
প্রেত ভূত চারি পাশে, মগ্ন সবে নগ্নবেশে, নির্ম্মাণ করিল সমাদরে॥
দুর্গাপঞ্চরাত্রি গান, রসিক জনার প্রাণ, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-বাঞ্ছিত।
ইচ্ছাপূর্ণ কল্পবৃক্ষ (১৪), তারিণী তাহার পক্ষ, দ্বিজ জগদ্রামের রচিত॥

প্রতিমা-গঠন।—(৫) অষ্টশক্তি, পঞ্চদেবতা, প্রভৃতি।

নির্ম্মাইছে বিশ্বকর্ম্মা ল'য়ে বেদ যুক্তি। চতুষ্কোণে যুগল যুগল অষ্ট শক্তি॥
দেবীর ঈশান কোণে গড়িল ব্রহ্মাণী। হংসারূঢ়া চতুর্ম্মুখা প্রসন্ন বদনী॥
সেই স্থানে বৃষভ উপরি মাহেশ্বরী। রৌপ্যবর্ণা ত্রিনয়না অতি শুভঙ্করী॥
বহ্নিকোণে ময়ূর বাহনে সিত আভা। সে কৌমারী পীতবস্ত্রা শক্তি হস্তে কিবা॥
সেই কোণে গরুড়ে বৈষ্ণবী চতুর্ভুজে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মক্রমে হস্তে সাজে॥
নৈঋর্তে নির্ম্মাণ কৈল শক্তি সে বারাহী। দন্ত মধ্যে শোভে যার সপ্তদ্বীপা মহী॥
সেই স্থানে নারসিংহী নৃসিংহরূপিণী। প্রচণ্ড আকার যেঁহ দৈত্যবিদারিণী॥
বায়ব্যে বনা'ল বিশা ইন্দ্রাণী শকতি। গজারূঢ়া সহস্র নয়না শুভ্র ভাতি॥
সেই স্থানে চামুণ্ডা মূরতি ভয়ঙ্করী। অট্টহাসা মুণ্ডমালী (১৫) দেবী দিগম্বরী॥
এই অষ্ট শক্তি নির্ম্মাইয়া মনে ভাবে। তা'পরে গঠিল গণেশাদি পঞ্চদেবে॥

---

(১৩) বুলে—গুঞ্জন করে।
(১৪) ইচ্ছাপূর্ণ কল্পবৃক্ষ—বাঞ্ছাকল্পতরু স্বরূপা।
(১৫) মুণ্ডমালী—মুণ্ডমালিনী। ছন্দঃ মিলাইবার অনুরোধে অশুদ্ধ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

গণেশ দিনেশ হরি হর হৈমবতী। পঞ্চদেবে (১৬) বনা'ল যাহার যে আকৃতি ॥
দশদিক্‌পাল ভাল কৈল দশ দিকে। ঐরাবতে ইন্দ্রস্থাপ্য কৈল পূর্ব্ব ভাগে ॥
ছাগল উপরেতে অনল অগ্নি কোণে। মহিষ-বাহনে যমে গড়িল দক্ষিণে ॥
রাক্ষসের স্কন্ধে নিজ স্থানেতে নৈর্ঋতি। পশ্চিমে বরুণ মকরেতে যা'র গতি ॥
মৃগেতে মরুতদেব বায়ুকোণে কৈল। নরের উপরেতে কুবের নির্ম্মাইল ॥
ঈশানে মহেশ বৃষ উপরি নির্ম্মাণ। উর্দ্ধে হংসে সর্ব্বোপরি ব্রহ্মা অধিষ্ঠান ॥
অধোতে অনন্তদেব অহির উপরে। দশদিক্‌পাল কৈল বিলম্ব না ক'রে ॥
নবগ্রহ কৈল সেহ প্রতিমা ভিতরে। রবি শশী কুজ বধ গুরু উশনারে ॥
শনৈশ্চর রাহু কেতু আদি গ্রহ নয়। যা'র যে বাহন যে আকার যা'র হয় ॥
তা'পর ব্রহ্মার পুত্র বিশ্বকর্ম্মা জ্ঞানী। প্রতিমা চৌদিগে গড়ে চোষট্টি যোগিনী ॥
সে সবার নাম বলি শুন বেদ মতে। জগত পয়ার রচে পার্ব্বতীর প্রীতে ॥

প্রতিমা-গঠন-সমাপ্তি।

চৌষট্টি যোগিণী বিশা গড়ে মন দিয়া। প্রথমে বনা'ল মাতা ত্রৈলোক্য-বিজয়া ॥
ত্রিজগত-মাতা মহানিদ্রা তারা ক্ষমা। ত্রৈলোক্য-সুন্দরী মা ত্রিপুরা সিদ্ধা ভীমা ॥
ত্রিপুর-ত্রাসিনী মহেশানী রণপ্রিয়া। জয়ন্তী অপরাজিতা জলেশা বিজয়া ॥
কমলাক্ষী ধৃতি জয়া ত্রিপুরা ভৈরবী। বিদ্যুজ্জিহ্বা কোটরাক্ষী শিবা-রবা দেবী ॥
গজবক্ত্রা শঙ্খিনী কামাখ্যা শবাসনা। শুভনন্দা ত্রিব্যক্তা ত্রিনেত্রা ষড়াননা ॥
ত্রিপাদা সর্ব্বমঙ্গলা সুধাগরুত্মতী। সর্পমুখা স্থানেশ্বরী স্বাহা পদ্মাবতী ॥
অনন্তা সর্ব্বসুন্দরী হুঙ্কার-কারিণী। পাশপাণি খরমুখা ময়ূরবদনী ॥
শুদ্ধি বৃদ্ধি ব্রজতারা কাকী পদ্মকেশা। পদ্মাস্যা পদ্মবাসিনী বন্দি প্রণবেশা ॥
অজপা বর্গরহিতা ত্রিবর্গী দুষ্করা। সুরাত্মিকা জপসিদ্ধি মোহিণী অক্ষরা ॥
মায়াজপহারিণী তাপিনী মিত্রনেত্রা। বলোৎকটা উচ্চাটনী রক্তেশ্বরী মিত্রা ॥
যোগসিদ্ধি তপঃসিদ্ধি গড়ে ক্ষেমঙ্করী। পরামৃতা বহুমায়া দেবী শাকম্ভরী ॥
মহোক্ষবদনা দনুজেন্দ্রবিনাশিনী। সুরেশ্বরী জ্বালা অশ্বারূঢ়া সে জম্ভিনী ॥
মোক্ষলক্ষ্মী গড়ে ছিন্নমস্তকা তা'পর। সিদ্ধিকরী শুভা নানা নির্ম্মা'ল সুন্দর ॥

---

(১৬) পঞ্চ-দেবতা—শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী। কবি এখানে ভ্রম বশতঃ 'অগ্নি-' স্থানে 'গণেশ' করিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বাগ্রে গণেশের পূজা করিয়া শিবাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়।

ত্রিবর্গফলদায়িনী ছিন্না বার্ত্তামুখী। চতুঃষষ্টি যোগিনী গঠিল মন সুখী॥
তা'র দাসদাসী কত কৈল অগণন। অসংখ্য মাতৃকাগণ করিল গঠন॥
প্রতিমা নির্ম্মা'য়া বিশ্বকর্ম্মা কৈল নতি। উপস্থিত নিশা শেষে যথা রঘুপতি॥
নতি করি' বলয়ে প্রতিমা হৈল সায়। পদধূলি পেলে বিশ্বকর্ম্মা ঘর যায়॥
প্রভু ক'ন ধন্য বিশ্বকর্ম্মার জীবন। একরাত্রি মধ্যে কৈল প্রতিমা গঠন॥
বিশ্বকর্ম্মা বলে, নাথ, করি নিবেদন। এই হেতু মোরে প্রভু ক'রেছ সৃজন॥
আজ্ঞা হ'ল রাত্রিতে প্রতিমা হ'তে চায়। আজ্ঞাতে প্রতিমা হৈল বিশা যশ পায়॥
হইল প্রভাত হে প্রতিমা দেখ গিয়া। মোরে কৃপাদান দেহ দাসেতে গণিয়া॥
এই বলি' পদধূলি বন্দিয়া মস্তকে। বিশ্বকর্ম্মা বাটী যায় বিপুল পুলকে॥
হেথা রাম ঘনশ্যাম ধনু ল'য়া হাতে। লক্ষ্মণ সংহতি যা'ন মৃন্ময়ী দেখিতে॥
শত অক্ষৌহিণী সেনা সংহতিতে যায়। দূরেতে প্রতিমা দেখি' কোটী ভানু প্রায়॥
আহা মরি মরি করি' কপিগণ বলে। না দেখি না শুনি হেন এ মহীমণ্ডলে॥
'জয় দুর্গা' বলি' রাম আগে প্রণমিলা। 'দুর্গা জয়'-বোল সবে বলিতে লাগিলা॥
তাহা শুনি' শত অক্ষৌহিণী সেনা মিলি'। 'জয় জয় দুর্গা' সবে বলে বাহু তুলি'॥
একি কালে ধ্বনিতে গগন ভেদ কৈল। 'জয় দুর্গা'-শব্দ তিন লোক ব্যাপ্ত হৈল॥
পার্ব্বতীর পদ বন্দি' নব্য কাব্য কয়। জগদম্বা! জগতের হর ভব-ভয়॥

অপূর্ব্ব বাসর।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঘটক-বিদায়।

প্রাতঃকালে শিবপ্রসাদ একাকী বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আছেন। আজি কোন ছাত্র পড়িতে আসে নাই। তিনি স্থিরভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। হেমলতা বয়ঃস্থা হইয়াছে, আর অনূঢ়া রাখা ভাল দেখায় না;—অনেক স্থানে পাত্র-অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোন খানে সুবিধা হইতেছে না;—এদিকে দিগম্বরী হেমের বিবাহের জন্য অত্যন্ত বিরক্ত করিতে আরম্ভ

করিয়াছে—তিনি কি করিবেন, কিরূপে এই বিষম দায় হইতে উদ্ধার পাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। প্রবোধচন্দ্রের সহিত হেমের বিবাহ দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু দিগম্বরী তাহাতে একেবারে অসম্মত। তাঁহার সহিত ঐ সম্বন্ধে কথা হইলেই দিগম্বরী নাকে কাঁদিয়া একেবারে কাণের পোকা বাহির করিয়া দেয়! সুতরাং তিনি সেই ভয়ে আর সাহস করিয়া সে কথা মুখে আনিতে পারেন না। বারাসতে যে পাত্রটীর সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, অনেক দিন হইল তাহারও কোন সংবাদ নাই।—পরমেশ্বর! এমন বিপদেও মনুষ্য পড়ে?

শিবপ্রসাদ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক গুরু গম্ভীরস্বরে প্রশ্নটী করিলেন, "কি হে, কি মনে ক'রে?"

ঈশ্বরচন্দ্র যেন কিছু থতমত খাইয়া "আজ্ঞে এই" বলিয়া চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া অপূর্ব্ব মুখভঙ্গিসহকারে 'ঘস্-ঘস্' করিয়া সর্ব্বাঙ্গ চুল্‌কাইতে লাগিল। শিবপ্রসাদ অবাক্ হইয়া তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ তুমুল সংগ্রাম করিয়া রক্তাক্ত কলেবর হইল, কিন্তু তথাপি বিজয় লাভ করিতে পারিল না,—শরীরের বস্ত্রাবৃত অংশের চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গমধ্যস্থ রণোন্মত্ত সেনাসমূহের ন্যায় চুলকণারাজি একেবারে 'চিড়-বিড়' করিয়া উঠিল! "ঘেঁটু ঠাকুর" তাহাদিগের বিশেষ দমনের জন্য দুই তিন বার হস্ত প্রসারণ করিল,কিন্তু,দ্রুপদাত্মজকে সম্মুখীন দেখিলে ভয়ে ভীষ্মদেব যেমন জড় শড় হইতেন,শিবপ্রসাদকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্রও তদ্রূপ মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া অতি কাতর নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বার বার সেই স্থানে হাত বুলাইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "যাও, অতঃপর যাহা বাকী রহিল, বাহির হইতে সারিয়া আইস।"

ঈশ্বর কিছু অপ্রতিভ হইয়া "আজ্ঞে না হ'য়েছে, আজ্ঞে না হ'য়েছে," বলিয়া বসিয়া পড়িল। পরে কিছুক্ষণ একথা ওকথা কহিয়া শেষে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিবার সূত্রপাত করিল। প্রথমতঃ নানাপ্রকারে শ্যামাচরণের গুণ বর্ণনা করিল,এবং পরে শ্যামাচরণ যে স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, ও তৎসাহায্যে সম্প্রতি একখানি সুবৃহৎ জমিদারী ক্রয়

করিয়াছে, এ কথাগুলি বলিতেও বিস্মৃত হইল না। শিবপ্রসাদ তাহার কথার ভাবে আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কতদূর দৌড় দেখিবার জন্য প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সুহৃদ্বর শ্যামাচরণের গুণ বর্ণনা করিয়া শেষে হেমলতার কথা পাড়িল। তাহার ন্যায় সুশীলা, সুরূপা কন্যা সৎপাত্রে ন্যস্তা হইলে যে সকলেই পরম সুখী হয়, একথাও বার বার বলিতে ভুলিল না, এবং শ্যামাচরণই যে হেমের অনুরূপ পাত্র ইহাও শিবপ্রসাদকে ক্রমে আভাসে বুঝাইয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত তাহার সহিত শ্যামাচরণের গোপনে পরামর্শ এই সম্বন্ধেই হইয়াছিল। শ্যামাচরণ হেমলতার রূপরাশিতে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, বার বার শিবপ্রসাদ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহাকে প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; বরং—এখন তাহার "জমিদার" নাম রাষ্ট্র হইয়াছে—শিবপ্রসাদ সহজেই তাহার সহিত হেমলতার বিবাহ দিতে পারেন—এইরূপ দুরাশাই মনে স্থান দিয়াছিল। সে ইহাও বিশেষ জানিত যে, হেমলতার প্রতি তাহার দুর্ব্যবহারের কথা প্রবোধ কিম্বা হেমলতা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এই সাহসে নির্ভর করিয়া মূর্খ শ্যামাচরণ পুনরায় হেমলতা লাভে কৃতসংকল্প হইল, কিন্তু এবার আর নিজে না যাইয়া প্রিয় সুহৃদ্ ঈশ্বরচন্দ্রকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার মানস করিল। ইহার দুই উদ্দেশ্য—এক, সে এখন বড় লোক হইয়াছে, নিজে যাইয়া নিজের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে আপন মর্য্যাদা বিনষ্ট হইবে, দ্বিতীয়তঃ, তাহার প্রতি গ্রামের লোকের, বিশেষতঃ শিবপ্রসাদের, যেরূপ আস্থা তাহাতে যদি কিছু বিপরীত ফল হয়, তবে তাহা পরের উপর দিয়াই যাইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া শ্যামাচরণ ঈশ্বরের নিকট আসিয়া সমস্ত কথা বিবৃত করিল, এবং যদি তাহা কর্ত্তৃক এ কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কৃত করিবে এ কথাও বলিতে ভুলিল না। ঈশ্বর একেবারে গলিয়া গেল,—বলিল, "তাহার জন্য চিন্তা কি? আমি এইক্ষণেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিব, তিনি আমার কথা কখনই লঙ্ঘন করিবেন না।" ঈশ্বরের এরূপ সাহসের কারণ, তাহার মনে মনে ধারণা যে—সে গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত এবং শিবপ্রসাদও পণ্ডিত লোক,—পণ্ডিতের কথা, পণ্ডিতের উপরোধ, পণ্ডিত কখনই অবহেলা করিতে পারিবেন না! নির্ব্বোধ এই সাহসে নির্ভর করিয়া সেই উদ্দেশে হেমলতার পিতার নিকট উপস্থিত।

শিবপ্রসাদ সমস্ত শুনিয়া ঈষৎ হাস্তে বলিলেন যে "আমিও এই কথা ভাবিতেছিলাম,—শ্যামের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যা দান করা ত বিশেষ শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে আবার তুমি যখন তাহার পক্ষে ঘটক হইয়া আসিয়াছ তখন ত আর কথাই নাই। তা দেখ, আমাদের পূর্ব্বাপর নিয়ম আছে, যে বিবাহের অগ্রেই ঘটক বিদায় করিয়া থাকি ;—এখন সমস্তই যখন ঠিক হইল, তবে সেই কাজটা হইয়া যাউক পরে সময় মত বিবাহ দেওয়া যাইবে!" এই বলিয়া শিবপ্রসাদ আপন চর্ম্ম-পাদুকার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ঘেঁটু ঠাকুর বন্দোবস্ত বুঝিয়া "আজ্ঞে না আমি" "আজ্ঞে না আমি"—বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। শিবপ্রসাদ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিলেন, "আরে! না, না, ঘটক ঠাকুর, রাগ ক'র না, বিদেয় নিয়ে যাও!"

ঘটক ঠাকুর একেবারে অদৃশ্য!

দশম পরিচ্ছেদ।

তারাচাঁদ।

বিচিত্র বিধানে ঘটক বিদায়ের পর শিবপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। বসিয়া একখানি পুথী লইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় মাথায় একখানি গামছা, বগলে একটী শত ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ ছাতা, কোমরে একখানি আধ-ময়লা চাদর জড়ান, পায়ে এক যোড়া শত তালিযুক্ত চটি জুতা, হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলামাথা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকৃতি একটী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল! ইহার নাম তারাচাঁদ। পাঠক মহাশয়ের সহিত তারাচাঁদের এই প্রথম সাক্ষাৎ, সুতরাং এ স্থলে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম।

ইহার নাম "কালাচাঁদ" না হইয়া "তারাচাঁদ" কেন হইল, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না। তবে এইমাত্র বোধ হয় যে, পাছে আঁধারে আঁধার মিশাইয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহার পিতা এই মেঘঢাকা অমাবস্যা-রাত্রে দু'টী জ্যোৎস্না পোকা জ্বালাইয়া লোকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন! কন্দর্পপুরের নিকটবর্ত্তী গোস্বামী গ্রামে তারাচাঁদের বাস। তারাচাঁদ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পৌরোহিত্য করিয়া এবং সময়ে সময়ে ভদ্রলোকদিগের বিবাহের ঘটকালী দ্বারা দুঃখে

কষ্টে সংসার চালান। তাঁহার পোষ্য অনেকগুলি, বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি মা-ষষ্ঠীর অসামান্য কৃপা! শিবপ্রসাদ হেমলতার বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধানে তাঁহাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বদা কন্দর্পপুর আগমন পক্ষে তারাচাঁদের এক বিষম ব্যাঘাত,—তাঁহাকে দেখিলেই বালকেরা চারিদিক হইতে"দুর্গা""দুর্গা" করিয়া পিছনে লাগে, তারাচাঁদ তাহাতে বড়ই বিরক্ত হয়েন। "দুর্গা" নাম করিলেই কেন যে তিনি এত ক্ষেপিয়া উঠেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। একবার তারাচাঁদ তাঁহার শ্বশুরালয় বসন্তপুরে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সবেমাত্র একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, তিনি রাত্রে নির্দ্দিষ্ট শয়নগৃহে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় উত্তমরূপ বেশ-ভূষা করিয়া গজেন্দ্রগমনে স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তারাচাঁদ তাঁহার এই অপরূপ রূপ দেখিয়া কিছু রসিকতা সহকারে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আহা! মরি, মরি! যেন মা দুর্গা এলেন!"—তারাচাঁদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাঁহার এই স্তুতিপাঠে—এই উদ্বোধন মন্ত্রে—শক্তিরূপিণী সন্তুষ্টা না হইয়া বরং একেবারে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুবৃহৎ শতমুখী দ্বারা তারাচাঁদকে বিলক্ষণ প্রত্যভিবাদন করিলেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, এবং নানা প্রকারে স্তব স্তুতি করিয়া মহাশক্তিকে সেই ভীষণ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিলেন! সেই দিন হইতে তারাচাঁদ দুর্গানামের উপর এতদূর চটিলেন যে আর কোন স্থানে যাত্রাকালেও সে নাম মুখে আনিতেন না,—তৎপরিবর্ত্তে "সিংহ-বাহিণী" নাম স্মরণ করিতেন।

কন্দর্পপুরের সুবিখ্যাত শ্যামা ঠাকুরাণীর পিত্রালয় বসন্তপুরে। শ্যামাঠাকুরাণী অবশ্যই বিধবা, কন্দর্পপুরে তাঁহার প্রতাপ অসামান্য। 'শ্যামা'নামটী যেমন রূপে, গুণেও সেই প্রকার। কলহ কালে ইহার কণ্ঠে যেন সহস্র বাগ্‌দেবী আবির্ভূতা হয়েন,—পরনিন্দায় বাসুকী রূপ ধারণ করেন! সুতরাং কন্দর্পপুরের মেয়ে-মহলে তাঁহার সর্ব্ব প্রধান আসন। শ্যামাঠাকুরাণী পিত্রালয় হইতে তারাচাঁদের এই ব্রত-কথা শুনিয়া আসিয়া কন্দর্পপুরের নারী-সমাজে তাহাপ্রচার করেন,এবং তথা হইতে আরও কিঞ্চিৎ সুরঞ্জিত হইয়া বালক-মহলে তাহা বিঘোষিত হয়। তাহারা তারাচাঁদকে দেখিলেই চতুর্দ্দিক হইতে "দুর্গা" "দুর্গা" বলিয়া অত্যন্ত পাগল করে। তবে তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে,তাঁহার নিজ গ্রামে এ কথা অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে তথাকার বাস উঠাইতে হইত। তারাচাঁদ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কদাচ কন্দর্পপুরে

আসিতেন না, তাহাতেও আবার সময় বুঝিতেন, যখন দেখিতেন যে বালকেরা পাঠশালে আছে, তিনি সেই সুবিধামতে কন্দর্পপুরে আসিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতেন। সুতরাং আজ তাঁহাকে প্রাতঃকালে "দুর্গা"নাম শুনিয়া সেই বহুকালের নিগ্রহ-নির্য্যাতন স্মরণ করিতে হয় নাই।

তারাচাঁদ আসিবামাত্র শিবপ্রসাদ বলিলেন, "কি হে! আমি এই মাত্র তোমার কথা ভাবিতেছিলাম। তবে, সংবাদ কি বল দেখি,—বারাসতে গিয়াছিলে?"

"গিয়াছিলাম।"

"কি হইল?"

"হইল না, তাহার অন্যত্র সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

"তবে উপায়? আর কি কোন স্থানে তোমার সন্ধানে নাই?"

"কৈ, দেখিতে ত পাই না, আমি ত সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, প্রায় আট দশ দিন বাড়ী ছাড়া, কেবল আপনার জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কোন স্থানেই আপনার মনোমত পাত্রের অনুসন্ধান পাইলাম না, যে দুই একটি সন্ধানে ছিল, তাহা হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এদিকে আবার ঘরে না থাকিলে চলে না, সংসারের সম্পূর্ণ অনাটন—পরিবারের সমূহ কষ্ট।"

শিবপ্রসাদ তারাচাঁদের মনের ভাব বুঝিয়া, বলিলেন—"ভাল, তাহার জন্য ভাবনা নাই, তোমার পরিবারের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তাহার উপায় করিতেছি।"

তারাচাঁদ এতক্ষণ কিছু গম্ভীর ভাবে কথা কহিতেছিলেন, শিবপ্রসাদের এই আশ্বাসে হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, তাহারা ত আপনারই প্রতিপাল্য, আপনার অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করে, তাহা না হইলে কি আমি আর কাহারও জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করি?"

শিবপ্রসাদ সুযোগ বুঝিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ভাল, আর কি তোমার সন্ধানে কোন পাত্র নাই?"

তারাচাঁদ হর্ষগদগদ স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ্ঞে, তারাচাঁদের সন্ধানে পাত্র নাই, এও কি সম্ভব? আর একটী অতি উত্তম—ঠিক আপনি যেরূপ চাহেন সেইরূপ—সুপাত্র আছে।"

"কোথা?"

"বীরনগরে। রূপে গুণে, ধনে মানে, সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট।"

ভাল, অদ্যই তাহার সন্ধানে যাও। বলিয়া শিবপ্রসাদ বাটীর মধ্য হইতে কয়েকটী টাকা আনিয়া তারাচাঁদের হস্তে দিলেন। তারাচাঁদ মহা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দিগম্বরীর নৃত্য।

একে একে তুইবার ঘটক বিদায় করিয়া শিবপ্রসাদ সম্মুখস্থ পুঁথিখানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ পড়িতে পাইলেন না,—সহসা সম্মুখে তৃতীয় এক ঘটক সমুপস্থিত! শিবপ্রসাদ মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—যোগেন্দ্রনাথ।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যোগেন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রের মুখে হেমলতার সহিত তদীয় প্রণয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া,যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরে পরিণয়-সূত্রে সংবদ্ধ হয়, তজ্জন্য হেমলতার পিতার নিকট আসিয়া বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু সহসা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হয় বলিয়া, এবং তথায় সম্ভবাতিরিক্ত কাল বিলম্ব ঘটায় এত দিন সে চেষ্টা করা হয় নাই। উপস্থিত, গত রজনীতে তিনি বাটী আসিয়াছেন, এবং আজ প্রাতঃকালেই সেই সংকল্পিত কার্য্য উদ্দেশে শিবপ্রসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শিবপ্রসাদ যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক বসাইলেন। পরে উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তার পর হেমলতার বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ সুযোগ পাইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কথা-প্রসঙ্গে হেমলতার সহিত প্রবোধচন্দ্রের প্রণয়-বৃত্তান্ত আভাসে অথচ সুস্পষ্টরূপে অতি চতুরতার সহিত শিবপ্রসাদকে আমূল জ্ঞাত করাইলেন, এবং উভয়ের মধ্যে পরিণয়-সূত্রে সংবদ্ধ হইলে যে উভয়েই পরম সুখী হয়, সে কথাও বলিতে ভুলিলেন না। শিবপ্রসাদ ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু এই প্রণয়ের কথা শুনিয়া হাসিলেন, ভাবিলেন "বালিকার আবার প্রণয় কি?" যাহাহউক,স্পষ্টতঃ সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, যে প্রবোধের সহিত হেমের বিবাহ দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, তিনি ইহাতে পরম সুখীও হন, কিন্তু ইহাতে দিগম্বরীর সম্পূর্ণ অমত। তিনি এই জন্য তাহাতে অগ্রসর হইতে পারেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয় তাঁহার মত হইতে পারে।"

"অনেক বলিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। ভাল, আরার দেখিব, কিন্তু ভরসা নাই।"

"আপনি একটু ভাল করিয়া বলিলে এবং একটু জিদ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন। তিনি আমাকেও বিশেষ স্নেহ করেন,—আমিও এজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিব। আর তাঁহার অসম্মতির কারণ ত কিছুই দেখিতে পাই না।" বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ বিদায় হইলেন। শিবপ্রসাদও উঠিয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। যাইবামাত্র দেখিলেন যে দিগম্বরী রোয়াকে বসিয়া চুল শুখাইতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিগম্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন— "ঘটক এসেছিল ?"

"এসেছিল।"

"কোন সন্ধান হ'ল ?"

"না।"

"বারাসতের সে পাত্র কি হইল ?"

"তাহার অন্য স্থানে সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।"

"তবে এখন উপায় ? আর ত মেয়ে ঘরে রাখা যায় না ?"

শিবপ্রসাদ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উপায় আর কি ?—প্রবোধের সহিত বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলাম।"

দিগম্বরী অমনি ঈষৎ একটু নাকি স্থরে বলিলেন, "তা তোমার মেয়ে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর, আমি যদি আর এ সম্বন্ধে কথা কই তবে আমার দিব্যি।"

শিবপ্রসাদ বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, "ওগো ক্ষমা কর, আর এই সকাল বেলা তোমায় নাকি সুর চড়া'তে হ'বে না! আমি অন্যত্র চেষ্টা ক'র্‌চি।"

এই "ক্ষমা কর" কথাটী দিগম্বরীর প্রাণে বড়ই বাজিল। শিবপ্রসাদ বড় হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন, সুতরাং "দাদা আমার অকল্যাণ ক'রলেন" বলিয়া দিগম্বরী সেই মৃদু-মন্দ নাকিস্থরের আরও দুই চারি গ্রাম চড়াইয়া দিলেন।

শিব-প্রসাদ বিষম বিপদে পড়িয়া বলিলেন, "না, না, তোমার নিকট ব্যগ্রতা করি, তুমি চুপ কর। এতে তোমার কিছুমাত্র অকল্যাণ হবে না, বরং আমি বল্‌চি, এই আমার মাথায় যত চুল আছে তত তোমার পরমায়ু হবে।"

এই কথা বলিবা মাত্র "আমার এক্ষুনি মরণ হোক্, এক্ষুণি মরণ হোক্" বলিয়া দিগম্বরী একেবারে 'ধেই ধেই' নৃত্য করিতে লাগিলেন!

শিবপ্রসাদ তদ্দর্শনে বাহির বাটীতে পলায়ন করিলেন। এমন সময় একটী অন্ধ ভিক্ষুক দ্বারে দাঁড়াইয়া গাহিল—

"ওমা দিগম্বরী নাচ গো!—"

গান শুনিয়া দিগম্বরীর তাল ভঙ্গ হইল। তখন হেমলতা গৃহ মধ্য হইতে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, না, না, পিসিমা থাম্‌লে কেন?—নাচ, নাচ!" দিগম্বরী হা! হা! শব্দে উচ্চ হাসি হাসিয়া দৌড়িয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

হেমলতা হাসিতে হাসিতে ভিক্ষা দিয়া অন্ধকে বিদায় করিল, এবং বলিয়া দিল যে আবার যদি পিসিমা ঐরূপ করিয়া নাচেন, তবে যেন সে আসিয়া ঐ গানটী গায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরাজয়।

শ্যামাচরণের বাটীতে আজ মহাধূম, তাহার মাতা ভগ্নী প্রভৃতি সকলেই কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়াছেন। শ্যামাচরণের সহসা অপর্য্যাপ্ত অর্থলাভ ও তৎসঙ্গে জমিদারী ক্রয়ের সংবাদ যথা সময়ে তাঁহাদের কর্ণ-গোচর হইয়াছিল,—তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা নাই। বাটী আসিয়া জমিদার পুত্রের ও জমিদার ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যরাশি ভোগ করিতে তাঁহারা অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। বিশেষতঃ, ভগ্নীগণের মেজাজ একেবারে ফিরিয়া গেল,—চাকুরে ভাইয়ের অন্ন আর তাহাদের ভাল লাগিল না,—তাহারা সর্ব্বদাই নাক তুলিয়া কথা কহিতে লাগিল। লালমোহন এই সমস্ত প্রত্যহই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

একদিন লালমোহনের মাতা কথায় কথায় শ্যামাচরণের কথা ইচ্ছা পূর্ব্বক পাড়িয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ্‌লে, তুমি ত তা'কে সর্ব্বদাই তুচ্ছ-তাচ্ছল্য কর্‌তে, সে এখন আপন অদৃষ্ট-জোরে কত বড়লোক হ'য়েছে—আমি ত বরাবর বলি'চি, যখন তা'র কপালে অতবড় রাজদণ্ড আছে, তখন তা'র অন্ন খায় কে?"

লালমোহন ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন,—বুঝিলেন যে, তাঁহার মাতারও আর চাকুরে ছেলের ভাতে আস্থা নাই। এদিকে ভগ্নী দু'টী দিন দিন যেন রণমূর্ত্তি

ধারণ করিতে লাগিল। সুতরাং তিনি বিরক্ত হইয়া সকলকে কন্দর্পপুর পাঠাইয়া দিলেন, এবং স্ত্রীকে লইয়া একাকী কলিকাতায় থাকা নানারূপ অসুবিধা দেখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

এইমাত্র তাঁহারা বাটী পৌঁছিয়াছেন,—গৃহ-প্রাঙ্গণে পা দিতে না দিতে বাড়ীখানি যেন হাট হইয়া উঠিয়াছে,—বাড়ীতে যেন মহা-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, একেবারে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ! মাতা পথে আসিতে আসিতে গোপনে মেয়েদের এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলেন যে, "গোলমাল না করিলে বড় মানুষের বাড়ী মানায় না।"

সঙ্গে একটীমাত্র চাকরাণী আসিয়াছে, বেচারী মারা পড়িবার উপক্রম হইল, তাহাকে নানা জনে নানাপ্রকার ফরমাইস করিতেছে। শ্যামের মা বলিতেছেন যে, "আমার পা দুটোয় বড় কাদা লেগেছে, আগে ধুইয়ে দে।" বৃদ্ধা মাসী বলিতেছেন, "নৌকায় আর কোন জিনিষ পত্র পড়িয়া আছে কি না, শীঘ্র দেখে আয়।" বড় ভগ্নিটী রান্নাঘরের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া একটু সৌখীন সুরে বলিতেছে, "ওলো! আগে এই ছাদের উপর তিন খানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে যা'।" দাসী কোন্ কাজ আগে করিবে, কাহার হুকুম আগে মানিবে, তাহার কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া নাকে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিরাজমোহিনীর বড়ই রাগ হইল, সে ছাদ হইতে বিলক্ষণ রুক্ষস্বরে বলিল, "আ মর্ মাগী! এখন আবার চর্কা কাট্‌তে ব'স্‌লেন। বলি, আমার কথা কি গ্রাহ্য হ'চ্ছে না? আগে এখানে তিন খানা পিঁড়ি দিয়ে যা', তার পর যত পারিস্ তোর ও মন্‌সার গান করিস্।"

চাকরাণী অগত্যা সর্ব্বাগ্রে তাহারই হুকুম তামিল করিল, ছাদে সারি সারি তিন খানি পিঁড়ি আসিয়া পড়িল। তখন বিরাজমোহিনী তাহার ছোট ভগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ওলো সোদি! বৌকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সৌদামিনী নীচে হইতে বলিল, "বৌ যেতে চায় না।"

তখন বিরাজমোহিনী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিল, "তা আস্‌বেন কেন? আমরা কি ওঁর সমযুগ্যী, আমাদের কথা গ্রাহ্য হবে কেন?"

বিরাজমোহিনী আরও কিছুক্ষণ জটিলার চণ্ডী-পাঠ করিত, কিন্তু মঙ্গলাচরণেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইল, অল্পক্ষণ পরেই সৌদামিনী ও লালমোহনের

স্ত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তখন তিন জনে হেমলতাদের বাড়ীর দিকে পিছন করিয়া তিন খানি পিঁড়িতে বসিল, এবং ভগ্নীদ্বয় আপন আপন মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিল ও বৌকেও সেই রূপ করিতে বলিল, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হইল না। তখন বিরাজমোহিনী আবার রাগে গর-গর হইয়া কি বলিতে বলিতে জোর করিয়া তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া দিল।

বিরাজমোহিনীর এরূপ করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল,—তাহাদের মাথায় রূপার কতকগুলি নূতন ফুল-কাঁটা হইয়াছে, সেই ঐশ্বর্য্যরাশি হেমলতাকে দেখাইবার জন্য তাহার এত আগ্রহ।

বস্তুতঃ তাহার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধও হইল। সেই সময় হেমলতা ও সরোজ একত্র বসিয়া গল্প করিতেছিল। বিরাজদের ছাদে দাঁড়াইয়া পিঁড়ির জন্য চীৎকার এবং তার পর সৌদামিনী ও বৌকে সেখানে আহ্বান, প্রভৃতি সমস্তই তাহারা শুনিয়াছিল, কিন্তু তখন তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। পরে যখন তাহারা তাহাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া একে একে মাথার কাপড় খুলিয়া দিল, তখন সরোজ বুঝিল, কিন্তু হেমলতা বুঝিল না।

সরোজ ভারি দুষ্ট। সে হাসিতে হাসিতে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে হেমলতাকে বলিল, "হ্যাঁ, সই! তোর সে দিন যে মাথার সাজ এসেছে একবার আন্‌তো দেখি—আমি ভাল ক'রে দেখিনি।" বলিয়া আপনি তাহার আঁচল হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিল, খুলিয়া গহনাগুলি সমস্ত বাহির করিয়া একে একে হেমলতাকে পরাইয়া দিল,—দিয়া বলিল "চল্ ভাই আমরা একবার ছাদে যাই।" বলিয়া জোর করিয়া হেমলতাকে টানিয়া লইয়া দ্বিতল ছাদের উপর উঠিল,—উঠিয়া যে দিকে বিরাজমোহিনীরা বসিয়াছিল সেই দিকে পিছন ফিরাইয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল,—দিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল, "ওগো পাড়ার লোক! তোমরা সকলে দেখ, আজ আমার সই সোণার ফুল-কাঁটা মাথায় দিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে র'য়েচে, তোমাদের চোক্ থাকে ত দেখে নেও।"

এতক্ষণের পর হেমলতা সমস্ত বুঝিতে পারিল। সে দৌড়িয়া সরোজিনীর নিকটে যাইয়া গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "ছি ভাই! এইজন্যে বুঝি তুই গহনা দেখা'বার ছুতো ক'র্‌লি?" সরোজ হেমলতার হাত ছাড়াইয়া উচ্চহাসি হাসিল।

শ্যামাচরণের ভগ্নীগণ যখন দেখিল যে তাহারা বিলক্ষণ পরাভূত হইল,—তাহাদের মাথায় দুই চারিটী রূপার ফুল মাত্র, কিন্তু হেমলতার মাথার সাজ সমস্ত সোনার, উহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে তাহারা অপারগ, সুতরাং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাই ভাল,—তখন দুই ভগ্নিতে চুপে চুপে কি বলাবলি করিয়া বিষণ্ণ-বদনে উঠিয়া গেল, লালমোহনের স্ত্রীও সময় বুঝিয়া দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেল; সে সময় যদি কেহ তাহার মুখের প্রতি চাহিত তবে দেখিতে পাইত যে, তাহার মুখে আহ্লাদের হাসি রাশি যেন উথলিয়া পড়িতেছে। সরোজ উহাদিগের এইরূপ সহসা রণ-ভঙ্গ দেখিয়া আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল।

হেমলতা আবার তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আবার, আবার? চুপ্ কর্ বল্‌চি।" বলিয়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শারদ উৎসব।

সেই বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে, বর্ষার পরে শরতের সমাগম হইতেছে, তরুণ শিশির-সম্ভারে শরতের স্বচ্ছাকাশে প্রকৃতির নীলিমাময় কৈশোর কান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে;—দুর্ব্বার দশাস্যবিজয়কামী শ্রীরামচন্দ্রের সেই মহা-শক্তি-উদ্বোধন-কাল হইতে প্রতি বৎসর শক্তিহীন বাঙ্গালীর গৃহে শক্তি-সঞ্চার-কামনায় দুর্গা পূজার মহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে;—সেই দালান-যোড়া দনুজ-দলনী দশভুজা বিরাটমূর্ত্তিতে এখনও তিন দিনের জন্য বঙ্গগৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, আর আনন্দের উন্মেষাকাঙ্ক্ষায় নিরানন্দময় বঙ্গসন্তান উন্মত্তচিত্তে চিদানন্দময়ীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে; কিন্তু কৈ, জীবের কামনা পূরিতেছে কৈ?—আকাঙ্ক্ষার প্রবল পিপাসা মিটিতেছে কৈ?—নৈরাশ্যের তুমুল বাত্যা মন্দীভূত হইতেছে কৈ?—মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলের হাহাকার-ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রবণগোচর হইতেছে, আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদের বিভীষিকা-ময় তামস ছবিই নিরন্তর হৃদয় আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, সাম্য-মৈত্রীর সুস্নিগ্ধ ছায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রান্ত জীব বিবাদ-বৈষম্যের মরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জাতীয় মহাশক্তির বিলয় সাধন করিতে বসিয়াছে। জগজ্জননী শিবানীর শুভাগমনে পদে পদে এমন অশুভ লক্ষণ কেন?

মা কি তবে আসেন নাই?—আসিলে এ অশান্তি কেন?—এই শুভদিনে দারুণ দুর্দ্দশায় সন্তানের হৃদয় বিদীর্ণ হয় কেন?—এই শঙ্কটময় ভবসাগরে পড়িয়া ভ্রান্ত জীব 'হাবু-ডুবু' খায় কেন?—না, সত্য সত্যই তিনি আসেন নাই, সত্য সত্যই সেই ব্রহ্মময়ী সনাতনীর শুভাগমন ঘটে নাই, সত্য সত্যই সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণা পরাশক্তির প্রকৃত উদ্বোধন হয় নাই। আসিয়াছে কেবল খড়-দড়ি-বদ্ধ ক্ষণভঙ্গুর মৃৎ-প্রতিমা, আসিয়াছে কেবল নগ্ন নয়ন-বিমোহন অসার ডাকের গহনা, আসিয়াছে মাত্র মহামায়ার মৃত্যুময় প্রেত-ছায়া! মা, আসিবেন কোথা? সচ্চিদানন্দময়ী মা আসিয়া বসিবেন কোথা?—প্রাণ যে পাপ-প্রবাহে পঙ্কিল, মন যে কপটতার কুটিল অন্ধকারে মলিন, শরীর যে সন্তাপস্পর্শে অশুচি,—মাকে বসিবার স্থান দিব কোথা? প্রীতি-পুষ্প বিশুষ্ক, ভক্তি-চন্দন গন্ধহীন, পবিত্রতা-মন্দাকিনীর ধারা রুদ্ধ,—কি দিয়া জননীর চরণে অঞ্জলি দিব? অজ্ঞান-অন্ধকারে হৃদয় যে অনুক্ষণ আচ্ছন্ন, কেমন করিয়া মা'র মণ্ডপ আলোকিত করিব? কোন সংস্থান নাই, কোন আয়োজন নাই—মা আসিবেন কোথা?

কিন্তু এ কি?—উৎসব ত চলিতেছে,—ঢাক-ঢোল ত বাজিতেছে, ঝাড়-

লণ্ঠন ত ঝুলিতেছে, মিঠাই-মনোহরা ত আহূত-অনাহূতের মনোরঞ্জন করিতেছে!—পথ-ঘাট পরিষ্কৃত, গৃহ-প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত, বিলাতী উপকরণে বাবুর 'বৈঠক' পরিপূরিত!—'ফ্যাশন' ও বাহারে বাজার সুবিন্যস্ত—"কিস্ মি কমলিনী" পেড়ে সাড়ী, হীরা কাটা সোনার চুড়ি,-কেরাণী-বাবুর কমনীয় কামিজ, সুন্দরী সজ্জার "সৌদামিনী শেমিজ," অনঙ্গ-মোহন ভুজঙ্গ-হার, তরুণী-তৃপ্তিকর কনক-তাড়, "মিশ্র-কুসুম কুন্তলীন," হেম-কান্তি "হেয়ার-পিন"—কিছুরই ত বাজারে অভাব নাই। কে বলে তবে বাঙ্গালী নিরানন্দ?—এ যে আনন্দ-কোলাহলে কর্ণ বধির হইতে বসিয়াছে! আর সর্ব্বোপরি কর্ম্মকর্ত্তার কেলিকুঞ্জে কোকিল-কণ্ঠীগণের কি শ্রুতি-বিমোহন কলধ্বনি! এ কি মা আনন্দময়ীর আগমনে ভক্ত হৃদয়ের সুখোচ্ছ্বাস, না প্রেতপুরীর পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য-কোলাহলে বিরহ-বিষাদের পূর্ব্বভাষ? এ কি মাতৃ-পূজার উপকরণপূর্ণ পবিত্র শান্তি-নিকেতন, না বীভৎস বিলাসিতাময় শয়তানের ক্রীড়া-ভুবন? এ কি স্বদেশহিতকামনায় দুর্ব্বল প্রাণে দেব-শক্তির আবাহন, না বিষয়-মোহ-মদিরায় মত্ত হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্র মানব-শক্তির বিসর্জ্জন?

তাই ত বলিতেছিলাম, মা আসিবেন কোথা? এ শ্মশান-ভূমে, প্রেতপুরীর মধ্যে, শয়তানের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, জননীর আবির্ভাব হইবে কোথা? ও ত আনন্দ নহে—চিত্ত-বিকার, অর্চ্চনা নহে—নীতি-ধর্ম্মের ব্যভিচার, জ্ঞানালোক নহে—তমোগুণের অমান্ধকার! তবে কি, মা, এই বিকলাঙ্গ বঙ্গভূমির বিজয়ের আশা চির বিসর্জ্জিত?—এই অবোধ আত্মা-বিড়ম্বিত হতভাগ্য সন্তানের উদ্ধারের উপায় একেবারে অন্তর্হিত?—এই আশ্বিনের আনন্দোৎসব আসুরিক নৃত্য-কোলাহলে চির পরিণত? তুমি ত, মা, নির্জ্জীবেরও জীবনদান কর, অজ্ঞানেরও মনের অন্ধকার দূর কর, নিরানন্দ প্রাণেও আনন্দের সঞ্চার-বিধান কর। একবার স্নেহবিস্ফারিত নেত্রে চাও, একবার মহিমা-মণ্ডিত মৃদু-হাস্য-যুত মুখমণ্ডল দেখাও, একবার চরাচরব্যাপী সুচারু চরণ-ছায়া দাও;—দুর্গতিহারিণি মা! অধমের দুর্গতি হরণ কর, দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ কর, দুর্দ্দিন দূরীভূত কর;—একবার এই আশ্বিনের অমল জ্যোৎস্নায় অনন্ত আলোক-ময় দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ কর, একবার "দয়ার দুগ্ধধারা" বিতরণে সন্তাপ-বিশুষ্ক বিকল প্রাণের পিপাসা দূর কর, একবার "সান্ত্বনার শীতল সমীর" সঞ্চালিত করিয়া নিরাশ মুমূর্ষু প্রাণ শীতল কর। আনন্দময়ি মা! এই চির নিরানন্দময় কাতর প্রাণে মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দ-ধারা বর্ষণ কর, এ শরণাগত সন্তানের নমস্কার গ্রহণ কর—

"শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে!
সর্ব্বস্যার্ত্তি-হরে দেবি! নারায়ণি! নমোহস্তুতে॥"

সম্মিলন।

জড়-জগৎ পরমাণু-সমবায়ে সংগঠিত। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহাতেই পরমাণু-সংহতির অর্থাৎ জড়পদার্থের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু একদিকে যেমন আকর্ষণ, অপর দিকে তেমন বিকর্ষণ-ক্রিয়া চলিতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে বিকর্ষণকে সম্মিলনের বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও, উহা তত্ত্বতঃ অন্যতর আকাশখণ্ডে বিজাতীয় পরমাণুপুঞ্জের স্বজাতীয় সম্মিলন বই আর কিছুই নহে। এজন্য আকর্ষণ, বিকর্ষণ—এতদুভয়কেই সম্মিলনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

জড়-জগতের ন্যায় মানব-সমাজও আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়মের অধীন। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, কোন বিশেষ স্বার্থে—বিশিষ্ট প্রয়োজনে—নিন্দায়ই হউক, আর বন্দনায়ই হউক —সাধু সঙ্কল্পেই হউক, আর অসাধু উদ্দেশ্যেই হউক—সমাজে সমাজে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সর্ব্বদাই সংযোগ-বিয়োগ-ক্রিয়া সাধিত হইতেছে। কতিপয় ব্যক্তি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সমবেত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে সহসা মতদ্বৈধ ঘটিল, অমনি সেই সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবর্গ অভিরুচি ও অভিমতের একতা বশতঃ আর একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। এইরূপ ব্যাপার মানব-সমাজে অহরহঃ সঙ্ঘটিত হইতেছে।

সম্মিলনে কেন যে এরূপ বিরহের ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, তাহার অবশ্যই বিশিষ্ট কারণ আছে।—যাঁহারা উদ্দেশ্য অবধারণ না করিয়া, লক্ষ্য নির্দ্দেশ না করিয়া, কেবল ক্ষণিক তত্ত্বালোচনা-জনিত আনন্দ সম্ভোগের জন্য কোন স্থানে সম্মিলিত হয়েন, তাঁহাদের চরিত্রগত, হৃদয়গত, অথবা রুচিগত ঐক্য না থাকিলেও, মূল বিষয়ে প্রীতি নিবদ্ধ না থাকায়—সমীহিত সাধনের অভাবে—এরূপ সম্মিলন, রসায়ন-বিজ্ঞানের Mechanical Combination বা যৌগিক সম্মিলনের ন্যায়, ক্ষণস্থায়ী ও বিচ্ছেদপ্রবণ হইয়া উঠে। একটী পাত্রে ধূলিমিশ্রিত জল আর কতক্ষণ আবিল অবস্থায় রহিবে? নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, দেখা

যায়, ধূলিরাশি পাত্রের নিম্নদেশে পুঞ্জীকৃত হইয়া জল ও ধূলিকণার পৃথক্ সত্তা প্রদর্শন করিতেছে।

তবে কি প্রকৃত সম্মিলন অসম্ভব?—তাহা নহে। যদি উদ্দেশ্য সরল ও সারবান হয়, অনুরাগ সত্য আদর্শে সমাকৃষ্ট হয়, তবে অভিরুচি, সংস্কার, শিক্ষা বা প্রকৃতির প্রভেদ সত্ত্বেও কদাচ সেইরূপ সম্মিলনের ব্যতিক্রম ঘটে না। বরং উহা Chemical Combination অর্থাৎ রাসায়নিক সম্মিলনের ন্যায় সুদৃঢ় ও ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহা কতিপয় ব্যক্তির সদিচ্ছা-প্রসূত সম্মিলনেরই পরিণতি। খৃষ্টের বল, বুদ্ধের বল, চৈতন্যের বল, আর মহম্মদের বল, সমস্ত বৃহৎ সম্প্রদায়ই কতিপয় অল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রাথমিক শুভ সম্মিলনের ফল। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকা যে জগতে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহারও মূলে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির সমবেত যত্ন ও সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি বিদ্যমান।

একটী পদার্থের উপাদানরাশি, বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট অবস্থাভেদে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন গুণাক্রান্ত হয়, ব্যক্তিবৃন্দও বিচ্ছিন্ন বা সম্মিলিত অবস্থার পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধারণ করে। জলের মৌলিক উপাদান অম্লজান দাহক, অজান দাহ্য গুণবিশিষ্ট; কিন্তু উক্ত উপাদানদ্বয়ের রাসায়নিক সম্মিলনের ফলস্বরূপ যে জলরাশি, তাহা দাহকও নহে, দাহ্যও নহে—পরন্তু অগ্নিনির্ব্বাপক। এইরূপ আমরা যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকি, তখন ব্যক্তিগত জীবনে যে গুণ বা যে শক্তির প্রভাব অনুভব করি, সম্মিলিত অবস্থায় তাহার রূপান্তর দেখিতে পাই। দশজন মিলিত হইয়া মোহবশতঃ যখন কোন সাধু ব্যক্তির নিন্দায় রত হয়, সে সময়ে অতি ধর্ম্মভীরু লোকের প্রাণেও নিন্দাপ্রবৃত্তি সন্ধুক্ষিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে দশজন কাহারও গুণের প্রশংসায় উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইলে, নিতান্ত নিন্দক ব্যক্তির প্রাণেও যেন গুণগ্রাহিকা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। অতএব সম্মিলনকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবার যো নাই।

সম্মিলন যদি সামান্য না হয়, যদি অশ্রেষ্ঠ না হয়, তবে যাহাতে কল্যাণদায়ক হয়, উন্নতিলাভের উপযোগী হয়, তদ্বিষয়ে অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ও বিশিষ্ট মনোযোগী হওয়া অত্যাবশ্যক।

সম্মিলনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিবার, হিতসাধক বা উন্নতিপ্রদায়ক করিবার,

যতবিধ উপায় আছে, তৎসমস্তই একটী মহতী নীতির অন্তর্নিবিষ্ট। সেই নীতি-সূত্রটী এই—"সত্যান্নপ্রমদিতব্যং"—অর্থাৎ, সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। সত্যপ্রাণ মহাত্মা Channing বলিয়াছেন—

"One thing above all is needful and that is the Disinterestedness which is the very soul of virtue. To gain truth, which is the object of the understanding, I must seek it disinterestedly. Here is the first and grand condition of intellectual progress. I must choose to receive the truth, no matter how it bears on myself. I must follow it, no matter where it leads, what interests it opposes, to what persecution or loss it lays me open, from what party it severs me, or to what party it allies."

ফলতঃ একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করাতেই প্রাচীন ভারতে উপনিষৎকার মহর্ষিগণ, চীনে মহাত্মা কন্‌ফজি, পারস্যে জরদস্ত, প্যালেষ্টাইনে খ্রীষ্ট এবং আরবদেশে মহম্মদ নিজ নিজ দেশপ্রচলিত পুরাতন ধর্ম্ম অপেক্ষা বিশুদ্ধতর ধর্ম্ম সমূহ সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। একমাত্র সত্যের শরণাপন্ন হইয়াই বঙ্গদেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও জার্ম্মেণিরাজ্যে মহাত্মা লুথর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতির প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আহা! সত্যের কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! এই জ্যোতিঃ প্রাণকে আলোকিত করিয়াছিল বলিয়াই ইংলণ্ডে উইলবার্‌ফোর্স ও টমাস ক্লার্কসন এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট লিনকন, পার্কার প্রভৃতি সদাশয় মহাত্মাগণ গভীর উদ্যম সহকারে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হইতে পারিয়াছিলেন। সত্যপ্রাণ বল্‌তেয়ার, রুসো, লাফায়াৎ, টিয়ার্স্‌ ও গ্যাম্বেটা প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত না হইলে ফ্রান্সদেশে রাজতন্ত্র অপেক্ষা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীর প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত। আজি ইংলণ্ডের রাজনীতির অভ্যন্তরে যে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত হইতেছে, পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কর—দেখিতে পাইবে, তাহার মূলে সত্যপ্রাণ রাজনীতিজ্ঞ ম্যাগ্নাচার্টার-প্রবর্ত্তকগণ, হালিফাক্‌স্‌, সণ্ডারল্যাণ্ড, এবং পীট প্রভৃতি মহাত্মাগণের শুভ সম্মিলনই তাহার কারণ। সত্যের প্রভাব প্রাণে প্রবিষ্ট হওয়াতেই আমেরিকার মহাত্মা রাজনীতিজ্ঞ ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন ও ওয়াশিংটন রাজনীতিকে সত্য-সলিলে ডুবাইয়া উহার চির-প্রথিত কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছেন। ঐ দেখ সত্যের সুনির্ম্মল আভাপুঞ্জ, হার্বি-প্রবর্ত্তিত শারীরতত্ত্বে, সার্‌ চার্‌ল্‌স্‌ লায়েল-

প্রবর্ত্তিত ভূতত্ত্বে, ফ্যারাডে, ডেভি ও হাক্সি-প্রবর্ত্তিত রসায়নতত্ত্বে এবং জার্ম্মেণির পেষ্টালজি, সুইজারল্যাণ্ডের ফেলেনবার্গ, ইংলণ্ডের জোসেফ্ ল্যাঙ্কেষ্টর ও উইলডারস্পিন-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীতত্ত্বে সম্প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রদেশ কিরূপ আলোকসম্পন্ন করিয়াছে।

বিরল সূর্য্য-কিরণ-জাল সূর্য্যকান্তমণির অধিশ্রয়ণ-বিন্দুতে (Focus) পুঞ্জীকৃত হইয়া যেমন কঠিন পদার্থকেও মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, সত্য-পিপাসু ও সত্যপ্রাণ ব্যক্তিবৃন্দের সমীহিত সাধনও তদ্রূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক অত্যুজ্জ্বল সত্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া অজ্ঞানতা ও মোহের ঘনীভূত আঁধারকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

ফলতঃ সত্যানুগত্য ও সত্যসঙ্কলনার্থ সম্মিলন যে কত উন্নতির নিদান, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের রচিত নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিতপ্রধান রঘুনাথ শিরোমণির "চিন্তামণি-দীধিতি" যে বিদ্বৎসমাজে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে উহার মূলে আমরা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ও মথুরানাথ তর্কবাগীশের সত্যসন্ধিৎসা ও সম্মিলন দেখিতে পাই। এসিয়াটিক সোসাইটীর শুভকর সম্মিলনে এদেশের যে কত বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে, তাহা কে না জানেন? এদেশে সাঙ্খ্যসূত্র, সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য ও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহাদি গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্যের মূলে আমরা মহাত্মা কেরি ও উইল্‌সন্ প্রভৃতির সমবেত সমীহা দেখিতে পাই।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, কি ধর্ম্ম, কি বিজ্ঞান, কি রাজনীতি, কি শিল্প-বাণিজ্য, কি শাস্ত্রব্যাখ্যা, কি শাস্ত্রালোচনা—সকলেরই মূলে, সম্মিলন অত্যাবশ্যক। ধন্য তাঁহারা, যাঁহাদের সম্মিলন পরম সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর;—ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তত্ত্বালোচনে, সৎপ্রসঙ্গে ও সদনুষ্ঠানে, সতত সত্যের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ বিভাসিত দেখেন। আসুন, ক্ষুদ্রপ্রাণ আমরাও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি—যেন দিন দিন তাঁহার অপার করুণার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকলে সমবেত ক্ষীণশক্তি দ্বারা সত্য-সঙ্কলনে ও একে অন্যের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

ভ্রান্তি।

(২)

বিপুলশক্তি ভ্রান্তি কোথা হইতে আসিল এবং কিরূপেই বা সত্যের সংসারে আধিপত্য বিস্তার করিল, এই প্রশ্ন মানবের মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন সময় হইতে জ্ঞানী মহাত্মাগণ গভীর গবেষণা দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এবং অনেকে এই সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবল অনুসারে মনুষ্যের আদি পিতা-মাতাই সংসারে ভ্রম আনয়ন করিয়াছেন; তাঁহারা সয়তানের প্ররোচনায় ভ্রমে পতিত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন; তাই ঈশ্বর দণ্ড স্বরূপ তাঁহাদিগকে রম্য ইডেন্ উদ্যান হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া এই অভিসম্পাত করেন যে, "তোমাদের বংশধরগণও তোমাদের ভ্রমের উত্তরাধিকারী হইয়া তজ্জনিত আধি,ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতির অধীন হইবে।" তাই মানব মাত্রই ভ্রান্তির পরবশ। আবার কতগুলি উপধর্ম্ম সৎ ও অসৎ এই উভয় প্রকার শক্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া, সত্য ও কল্যাণকর ব্যাপারগুলিকে একজনের স্কন্ধে এবং অসত্য ও অকল্যাণকর গুলিকে অপরের স্কন্ধে সংন্যস্ত করিয়া থাকে। হিন্দুদর্শন মতে, যে উপাদান হইতে জগৎ নির্ম্মিত, তাহা সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট। সত্বগুণ সুখ-স্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক; রজোগুণ দুঃখ-স্বরূপ ও উপষ্টম্ভক; ও তমোগুণ মোহ-স্বরূপ গুরু ও আবরক। এই তমোগুণের আবরণী শক্তি দ্বারাই সত্য সকল প্রচ্ছন্ন থাকে এবং তৎস্থলে ভ্রান্তি বিরাজ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার আরও অনেক মত আছে, সেই সকলের অবতারণা করিয়া তন্মধ্যে কোন্‌টী সমীচীন ইহা নির্ণয় করা প্রবন্ধলেখকের উদ্দেশ্যও নহে এবং ক্ষমতাধীনও নহে। ফলতঃ বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভ্রান্তির সত্তা ও ক্রিয়া অনুভব করি এবং ভ্রান্তি হইতেই যে সংসারে সর্ব্বদা অনর্থ ঘটিতেছে ইহাও বুঝিতে পারি। এতদ্‌প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রকৃতিভেদে ভ্রান্তি দ্বিবিধ; কতকগুলি ভ্রান্তি মনুষ্যের পক্ষে অনতিক্রমনীয়, আর কতকগুলি আকস্মিক। যে ভ্রান্তি মনুষ্যের জ্ঞান ও শক্তির অপূর্ণতা বশতঃ সংঘটিত হয়, তাহা অপরিহার্য্য। মানব প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই দেখিতে পাইল, যে সে একটী প্রকাণ্ড নীল চন্দ্রাতপ তলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। প্রকৃতিদেবী সর্ব্বপ্রথমেই তাহার নিকট মায়া-পুরী সৃষ্টি করিলেন। মানব নভস্তলে লম্বমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও থালা, কাহাকেও পুষ্প, কাহাকেও বা সিন্দুরবিন্দুর আয়তন-বিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করিল; পরে সহস্র সহস্র বৎসর-ব্যাপী জ্ঞানালোচনার ফলে যদিও তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলির আয়তন অঙ্গুলি, যবোদর-ক্রমে, এমন কি পরিমাণ মাসা-ভরি পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু চক্ষু শান্ত শিষ্ট বালকের ন্যায় তাহা মানিয়া লইল কই? এখনও সে "সুয্যিমামার" লক্ষ লক্ষ যোজন-বিস্তৃত বপুখানি এক বিঘত অপেক্ষা অণুমাত্রও অধিক আয়তনের বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, এবং যে নক্ষত্র-দ্বয়ের অন্তরস্থিত ব্যবধান কোটী কোটী ক্রোশ, তাহাদিগকেও 'গায়ে গায়ে ঘেঁসা-ঘেঁসি' বলিয়া উপলব্ধি করিতে কুণ্ঠিত নহে। এরূপ হয় কেন? না, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ কূপমণ্ডূক সদৃশ, অতি অল্প পরিসর স্থানে চির আবদ্ধ, অনন্ত-প্রসারী ভাব কোথা পাইবে? সুতরাং এই সকল ভ্রান্তি মানব-ইন্দ্রিয়ের অনতিক্রমণীয়, মানব-জীবনের সহিত অভেদ্য ভাবে বিজড়িত।

আবার কতকগুলি ভ্রান্তি আকস্মিক। ইন্দ্রিয়-বিকৃতি, মনের অনবধানতা প্রভৃতি কারণে যে ভ্রান্তি সংঘটিত হয় তাহা এই শ্রেণীস্থ। মণ্ডূকের বসা দ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে প্রলিপ্ত করিলে বংশকে সর্প বলিয়া বোধ হয়; পাণ্ডু রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সমুদয় পদার্থ হরিদ্রাভ প্রতীত হয়; উপযুক্ত প্রণিধানের অভাবে দূরস্থিত মুক্তাফলকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, ইত্যাদি। যে যে কারণে ঐ সকল ভ্রমের উৎপত্তি হয় তাহা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তিরূপ ক্রিয়াও অন্তর্হিত হয়। মানুষ অনেক সময়ে কাল্পনিক বা অনিশ্চিত শুভাশুভ বিষয়ের চিন্তায় উৎফুল্ল বা অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ আকস্মিক ভ্রান্তির উদাহরণ। রাগ দ্বেষ ও মোহের অভিভবে মানবের চিত্ত যখন বিকৃত ভাবাপন্ন হয়, তখনই এই সকল ভ্রান্তি মায়াজাল বিস্তার করিয়া থাকে। সুতরাং উহা মানবের অনেকটা আয়ত্ত, একপ্রকার ইচ্ছাধীন বলিলেই হয়।

আবার ভ্রান্তিকে অধিকরণ ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে;

যথা—(১) ঐন্দ্রিয়িক (২) মানসিক ও (৩) আধ্যাত্মিক। যে ভ্রান্তি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক্ এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের বিকৃতি নিবন্ধন উৎপন্ন হয় তাহাই ঐন্দ্রিয়িক ভ্রান্তি বলিয়া উক্ত হইল। ঐন্দ্রিয়িক ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে;—নিদাঘার্ত্ত পথিক প্রতপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে যে মরীচিকা দেখিতে পান, উহা তাঁহার চাক্ষুষ ভ্রান্তি; এইরূপ দ্রুতগতি যানে যাইবার সময়ে আপনাকে একস্থানে স্থির ও পার্শ্বস্থিত পদার্থগুলিকে প্রতিকূলাভিমুখে গতি-শীল বলিয়া অনুমান হয়; অনন্ত-বিস্তৃত নভস্তল পৃথিবীর সহিত অদূরে চক্রবালে (Horizon) বেষ্টিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়; জলমধ্যে বক্রভাগে প্রোথিত যষ্টিখণ্ডের মধ্যদেশ ভগ্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে; ইত্যাদি অসংখ্য চাক্ষুষ ভ্রম সকলেরই লক্ষিত বিষয়। দূরে বাষ্প-যান-চক্রের ঘর্ষণের শব্দকে অনেক সময়ে মেঘগর্জ্জনের শব্দ বলিয়া অনুমান হয়; গৃহপালিত ময়না টিয়া প্রভৃতির অনুকৃত স্বরে অনেক সময়ে মনুষ্যের স্বরের প্রতীতি জন্মে; অত্যন্ত ত্রস্ত বা ঔৎসুক্যান্বিত ব্যক্তি বায়ু-তাড়িত পত্রের শব্দ পদশব্দ বলিয়া মনে করে; স্বরচালনা (ventriloquism)-বিদ্যাবিৎ উদরের মধ্যে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিয়া মুখাদির ভঙ্গীদ্বারা তাহা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আগত হইতেছে, শ্রোতৃবর্গের এই প্রকার ভ্রম উৎপাদন করে;—এ সমস্ত কর্ণের ভ্রান্তির প্রসিদ্ধ উদাহরণ। কোন তীব্র গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে তাহা সেই বস্তুর সহিত ঘ্রানেন্দ্রিয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার অনেক পরেও অনুভূত হয়, ইহা নাসিকার ভ্রম। হরিতকী চর্ব্বণ করিয়া জল পান করিলে জলের শৈত্য ও মাধুর্য্য অধিকতর মাত্রায় অনুভূত হয়, ইহাকে জিহ্বার ভ্রম বলা যাইতে পারে। তর্জ্জনী মধ্যমা মিলিত করিয়া একটী মটর স্পর্শ করিলে দুইটি মটরের অনুভূতি জন্মে, ইহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের ভ্রমের একটী দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রত্যহ শত শত ইন্দ্রিয়-বিভ্রম আমাদের সম্মুখে দেহ-বিস্তার করিতেছে, আমরা অভিজ্ঞতার ফলে তৎসমুদয়ের মধ্যে কতকগুলির স্বরূপ অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ভ্রমোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি; আর কতক-গুলির দুশ্ছেদ্য বন্ধন অদ্যাপি ছিন্ন করিতে পারি নাই।

যে ভ্রমের বিষয় অন্তর্জগতে, তাহা মানসিক ভ্রান্তি। স্বপ্নোপলব্ধ মনোময় জগৎ এই প্রকার ভ্রান্তির সৃষ্ট। জাগ্রৎ অবস্থাতেও আমরা অনেক সময়ে ভ্রান্তি-রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। এই রাজ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন আমরা অষ্টমহাসিদ্ধি (১) লাভ করিয়া থাকি,—আমাদের অসাধ্য, অচিন্তনীয় কিছুই থাকে

(১) সাহিত্য-সেবক, ৪র্থ সংখ্যা, ১২১ পৃঃ ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

না। কখনও স্থূল দেহ পশ্চাতে রাখিয়া, অতীন্দ্রিয় শরীরে সুনীল গগন ভেদ করতঃ ইথার-সমুদ্রে ভাসমান হই,—অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব; অকল্পিতপূর্ব্ব গ্রহ-উপগ্রহবাসী জীবগণের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, নক্ষত্র বধূগণের অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা স্নাত হইতে হইতে, ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে, শূন্য হইতে শূন্যে উঠিতে থাকি, অবশেষে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া মহাশূন্যে মিশাইয়া যাই, অনন্ত আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে,—কখনও বা মুহূর্ত্তমধ্যে এই মর্ত্ত্যভূমিতেই অপ্-সরাসেবিত অমরাবতী আনয়ন করিয়া তাহাতে বিহার করিতে থাকি, আবার কখনও বা ধনজনমান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সুখোপকরণের অধিকারী হইয়াও একটী তুচ্ছ বস্তুর অভাবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ মানবগণ সর্ব্বদাই এইরূপে রুচি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন পদার্থে সুখ-দুঃখের কল্পনা করিয়া প্রতারিত ও বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

মনুষ্য আর একপ্রকার ভ্রান্তির অধীন, তাহা নিত্য পদার্থে অনিত্যতার অথবা অনিত্য পদার্থে নিত্যতার আরোপ অর্থাৎ আত্ম পদার্থকে অনাত্ম কিম্বা অনাত্ম পদার্থকে আত্ম বলিয়া মনে করা। ইহার নাম আধ্যাত্মিক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি-বশে আমরা নিজ শরীরেই আমিত্ব আরোপ করিয়া থাকি, শরীর রুগ্ন কিম্বা ক্লিষ্ট হইলে, আমি রুগ্ন কিম্বা ক্লিষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে করি। অথবা অন্য পক্ষে শরীরের সহিত আত্মারও ধ্বংস হইবে বলিয়া মনে করি। বেদান্তাদিতে এই ভ্রমের নাম অধ্যাস বা অধিরোপ, এবং অন্যবিধ সমুদয় ভ্রান্তির মূলাধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং এই ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হওয়াই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে।

আমরা প্রকৃতিতত্ত্ব পাঠ করিলে বুঝিতে পারি যে জাগতিক বস্তু সকল, আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া, যে আকার-প্রকার লইয়া জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা উহাদের স্বরূপ নহে, অবভাস (phenomena) মাত্র। যেরূপ জলমধ্যে বক্রভাবে প্রোথিত যষ্টিখণ্ডের মধ্যদেশ ভগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে, কেবল আলোক-রশ্মির প্রতিফলন (reflection) পরাবর্ত্তন (refraction) প্রভৃতির নিয়মানুসারে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে, তেমনি যে যষ্টিখানি দূরে অবস্থিত দেখিতেছি, তাহাও প্রকৃত পক্ষে তৎস্বরূপ নহে, চাক্ষুষ স্নায়ুজালে (retina) কতকগুলি আলোকের কণা পতিত হইয়া, তাহাতে যে একখানি অতি ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, বহিঃস্থ যষ্টি তাহারই বিকৃত প্রতিচ্ছায়ামাত্র। আবার যেমন যষ্টির বাহ্য আকৃতির সহিত ভীতি-উৎপাদক কোন চিহ্ন না থাকি-

লেও, অন্যের পৃষ্ঠের উপরে উহার ক্রিয়া দেখিয়া আসিতেছি বলিয়াই, উহাতে ভয়ানকত্বের কল্পনা করিয়া লই, তেমনি চক্ষুরভ্যন্তরস্থিত মূলচিত্রে কাঠিন্যাদি গুণ না থাকিলেও বহিঃস্থ যষ্টিতে (যাহা মূলচিত্রের ছায়ামাত্র তাহাতে) ঐ সকল গুণের কল্পনা করিয়া লই, কেননা পূর্ব্বে যখনই ঐ আকৃতির কোন পদার্থ দৃষ্টি-গোচর করিয়াছি, তখনই স্পর্শাদির দ্বারা উহার কাঠিন্যাদি অনুভব করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ সকল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করা অসম্ভব। তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, যেমন শুধু চক্ষুর সাহায্যে যষ্টির কাঠিন্য ভয়ানকত্ব প্রভৃতির জ্ঞান, তেমনি শুধু ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বস্তু-স্বরূপজ্ঞান কেবল অনুমান-সাপেক্ষ, সুতরাং উহা যে ভ্রান্তিসঙ্কুল হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? আবার, আমরা পিপাসার্থ হইয়া যখন শূন্য প্রতপ্ত বায়ুমণ্ডলীতে মরীচিকার গঠন করিয়া লইতে পারি, তখন কাম-ক্রোধাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া নিত্যকে অনিত্য বা অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিব—তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাই এই ভ্রমময় সংসারে বাস করিয়া, ভ্রমের সহিত সর্ব্বদা 'কারবার' করিয়া কেহ একেবারে অভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ কল্পনা করাও অসমসাহসের কার্য্য। এবং যে ব্যক্তি অন্য কাহাকেও ভ্রমে পতিত দেখিয়া ঘৃণা ও বৈরভাবের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়, সে ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও মহাভ্রান্ত ও করুণার পাত্র। তবে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম সকল ক্রমে তিরোহিত বা অল্পীভূত হয়, তাহা সত্য। মানব-ইতিহাস এই বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আদিম সময়ে মনুষ্য ও ইতর জন্তুর মধ্যে পার্থক্য অতি অল্পই ছিল। তখন মনুষ্যও ইতর জন্তুগণের ন্যায় উলঙ্গ গাত্রে অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, ভ্রমণ করিত, বন্যপ্রাণী বধ করিয়া তাহার আমমাংসে উদর পূরণ করিত এবং তাহাদিগেরই ন্যায় আত্মরক্ষার্থ একে অন্যের বিনাশ সাধন করিত। সেই মনুষ্যের বংশধরগণ আজ পর্ব্বত-অরণ্যানী-সমুদয় সুরম্য সর্ব্বসুখোপকরণ-সমন্বিত নগরীতে পরিণত করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আলাপ, পরিচয়, প্রীতি, মৈত্রী সংস্থাপন করিয়া ধরাকে স্বর্গধাম করিয়া তুলিয়াছে। এ সমুদয়ই ক্রমানুসারী জ্ঞানবলে প্রাকৃতিক তত্ত্ব সকলের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। মনুষ্যের জিজ্ঞাসাবৃত্তি উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের গুণে পরিতুষ্ট হইয়া প্রকৃতি যেরূপ দিন দিন সত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া অমূল্য গুপ্তধনরাশি বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে ভ্রান্তি কুসংস্কার প্রভৃতি যে ক্রমেই অল্পীভূত হইয়া আসিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতে আরও অশেষবিধ সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ

জ্ঞানই ভ্রান্তির একমাত্র প্রতিকার। ত্রিবিধ ভ্রান্তির নিরাকরণ জন্য ত্রিবিধ জ্ঞানের সেবা করিতে হইবে, শরীর মনঃ ও আত্মাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের প্রকৃতি নির্ণয় এবং জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই তিনটীর মধ্যে যাহার প্রতি সমধিক যত্নশীল হওয়া যায়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাই ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠে,—যাহার প্রতি অবহেলা করা যায়, তাহাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া দুঃখরাশি আনয়ন করে। শারীরিক তত্ত্বের উপযুক্ত জ্ঞানাভাব-নিবন্ধন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি আনয়ন করিয়া থাকি; বৈষয়িক তত্ত্বের জ্ঞানাভাব বশতঃই কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া অকৃতকার্য্য ও প্রতারিত হইয়া থাকি,—কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ বুঝিতে না পারিয়া ভালটী করিতে গিয়া মন্দটী করিয়া বসি; যশঃ উপার্জ্জন করিতে গিয়া কুখ্যাতি লাভ করি; ধন উপার্জ্জন করিতে গিয়া মূলধনের 'কাণা কড়ি'টী পর্য্যন্ত খোয়াইয়া বসি; তাই আমাদিগকে প্রায়শঃই

> "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
> অনলে পুড়িয়া গেল।
> অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
> সকলি গরল ভেল॥"

প্রভৃতি ধুয়া ধরিয়া বিলাপ-গীতি গাহিতে হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক ভ্রান্তি সকল প্রকার ভ্রান্তির মূলাধার। কেন না আমার স্বরূপ কি, ইতর পদার্থের স্বরূপ কি, তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধই বা কি প্রকার,—ইহা বুঝিতে না পারিয়াই অধিকাংশ স্থলে ভ্রমে পতিত হই। অহং-প্রত্যয় বা আত্মজ্ঞান জন্মিলে, আত্মানাত্ম 'বিবেক খ্যাতি' উৎপন্ন হইলে, অন্যান্য ভ্রম স্বতঃই নিরাকৃত হয়। যেহেতু তাহা হইলে আমার শক্তি কত, আমার অধিকার কত দূর পর্য্যন্ত, জানিয়া আপনার সুখ ও দুঃখ, আশা ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি সমুদয়ই নিয়মিত করিতে পারি; তখন প্রতি মুহূর্ত্তে দিগ্‌ভ্রান্ত, নিজের কক্ষচ্যুত, হইয়া যাইবার সম্ভাবনা কমিয়া আইসে। মানব পশুত্ব ও দেবত্বের মধ্যবর্ত্তী কোনও একটী প্রদেশে অবস্থান করে; অভিনিবেশ ঊর্দ্ধ দিকে চালনা করিলে দিব্য জ্যোতিঃ—স্বর্গের দুন্দুভিনাদ—হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, আবার অধোদিকে ছাড়িয়া দিলেই নরকের ভীষণ তামসীচ্ছটা ও বিকট কোলাহল আসিয়া অন্তঃকরণকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই সীমন্ত প্রদেশে বসতি করি বলিয়াই আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন্ রাজ্যভুক্ত তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে

পারি না। যখন যে উপস্থিত হয়, তাহারই নিকট আমরা আনুগত্য স্বীকার করি, তাহাকেই কর প্রদান করিয়া থাকি। তাই ভ্রান্তির অসংখ্য চর এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া সময়ে ও অসময়ে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করে। ভ্রান্তির প্ররোচনায় আশা ও আসক্তি সংসারের যাবতীয় পদার্থেই কল্পিত সুখ কিম্বা দুঃখের সজ্জা প্রদান করে। এই উভয়ের প্রসূতি কামনা। আত্মস্বরূপ সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না থাকা হেতু, কাম্য বস্তু কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, গৌণ প্রয়োজনকে (means) মুখ্য (end) বলিয়া মনে করি এবং তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই,শান্তিকে উপেক্ষা করিয়া যশঃ অর্থ প্রভৃতির সেবায় রত হই, রাজাকে উপেক্ষা করিয়া দ্বারবানের মনস্তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হই। সুতরাং আপনার অভীষ্ট লাভ করা সুদূরপরাহত হইয়া থাকে।

আত্মজ্ঞানের প্রভাবে যেমন নিজের ভ্রান্তি তিরোহিত হয়, তেমনই অপরের ভ্রান্তি আসিয়াও স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞান চক্ষুতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা, সমুদয় প্রদর্শন করে, এবং—"মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" অর্থাৎ, সুখের প্রতি মৈত্রী (পরের সুখে সুখ বোধ) দুঃখের প্রতি করুণা (পরের দুঃখে দুঃখ বোধ) পুণ্যের প্রতি মুদিতা (অনুমোদন) এবং পাপের প্রতি উপেক্ষা ("তাচ্ছিল্য) এই সকল ভাব দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা সাধন করিবে, এই অমৃতময় উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ করে। আত্মজ্ঞান-প্রভাবে ঈর্ষা, ঘৃণা, বৈর প্রভৃতির কলুষিত ভাব সকল অপগত হয়, অন্তঃকরণে ক্ষান্তি ও প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যে তীব্র আসক্তি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে জগৎ বিপর্য্যস্ত করিতেছিল, অঙ্গুলি সঙ্কেতে সংসারকে পাশ-বদ্ধ ভল্লুকের ন্যায় নৃত্য করাইতেছিল, তাহা সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করে, সুখ দুঃখ আয়ত্ত হইয়া আসে। ফলতঃ আত্মজ্ঞান জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন শ্রেয়ঃ ও প্রেয় এক হইয়া যায়, তেমনই ক্ষান্তি ও প্রীতির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম পর এক হইয়া যায়। জ্ঞান দ্বারা আত্মভ্রান্তির যেমন "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" শক্তির বিলোপ হয়, তেমনই ক্ষান্তি ও প্রীতির দ্বারা অপরের ভ্রান্তির চিত্তপ্রসাদ নষ্ট করিবার শক্তি তিরোহিত হয়। মহাত্মা ঈশা যখন পাইলেটের অনুজ্ঞায় বধ্য ভূমিতে নীত হইয়া ক্রুশ-মঞ্চে আরোহণ করেন, তখনও তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হয় নাই, তখনও তিনি নিজের প্রিয় শিষ্যগণের নিমিত্ত যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, প্রাণঘাতক

ভ্রান্ত শত্রুদিগের নিমিত্ত সেইরূপ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—"পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, ইহারা না বুঝিয়া এই প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (Father forgive them, for they know not what they do.)" ইহাই ভ্রম মুক্তির চরম দৃষ্টান্ত। এইরূপে ভ্রম মুক্ত হইয়া চিত্তে অবিচলিত শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই মানবের পরম পুরুষার্থ।

আমরা জ্ঞানানুশীলনের বিপক্ষে দুই চারিটী আপত্তি শুনিতে পাই, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথমতঃ "ভ্রান্তির সেবার ন্যায় জ্ঞানের সেবাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা, ভাল বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, মন্দ বস্তুর জ্ঞানও অপরিহার্য্য। আপাত-মনোরম দুষ্ক্রিয়া ও তাহা সাধন করিবার উপায় গুলির জ্ঞান না জন্মিলে লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। সুতরাং জ্ঞানই ঐ সকল অকল্যাণের হেতু। বাইবেল-বর্ণিত জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াই মানব পাপ-তাপের অধীন হইয়াছে, ইহা আলঙ্কারিক ভাবে নিতান্তই সত্য।" ইত্যাদি।

তাহার উত্তরে বক্তব্য যে, সত্য পদার্থের সঙ্গে অসত্য পদার্থের জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অসত্য পদার্থকে যদি জ্ঞান যোগে অসত্য বলিয়াই বুঝা গেল তবে আর তাহা হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা কোথায়? অগ্নিকে ফস্ফরেসেন্স (Phosphorescence) জানিয়া কোন ব্যক্তি তাহাতে হস্ত প্রদান করিতে পারে বটে,কিন্তু অগ্নিকে অগ্নি জানিয়া কেহ তাহা করিবে কি? অপরন্তু যত প্রকার আনন্দ আছে তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানজনিত আনন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাণের খাদ্য-স্বরূপ। তাহা লাভ করিতে গিয়া যদি দুঃখ পাই এই ভয়ে বিরত হওয়া, এবং খাদ্য পদার্থের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় অনশনে প্রাণ ত্যাগ করা, ঠিক একই প্রকারের কার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ "দুই চারি জন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনুষ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া জন সাধারণের পক্ষে অসীম জ্ঞান আয়ত্ত করা ও তাহা হইতে সত্য আবিষ্কার করা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানানুশীলন করিতে গিয়া সংশয়ের অন্ধকারে পতিত হইয়া সমধিক বিড়ম্বনা ভোগ করিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। তাই, অন্য দশ জন যাহা করে, তাহা করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।"

তদুত্তরে বক্তব্য যে, কে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, কে তদ্রূপ নহেন, তাহা কেবল ক্রিয়ার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতে পারে। অন্য দশ জন কি করে তাহা জ্ঞাত হইতে গিয়াও প্রকারান্তরে জ্ঞানেরই সেবা করিতে হয়।

বিশেষতঃ, রুচি ও প্রকৃতি ভেদে, শিক্ষা ও অবস্থা ভেদে, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পন্থার অনুসরণ করিয়া থাকেন,তাহার মধ্যে আমার পক্ষে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ ইহা জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকারেই স্থির করা সম্ভব নহে। বস্তুতঃই আমরা আপাত-পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মতের মধ্যে পতিত হইয়া নিরন্তর পিষ্ট ও বিপথে বিক্ষিপ্ত হইতেছি, আর ভ্রান্তি আমাদিগকে সেই অসহায় অবস্থায় তুলিয়া লইয়া ক্রীড়ণকের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে। এই অবস্থায় জ্ঞানই আমাদের একমাত্র মুক্তিদাতা—উদ্ধারকর্ত্তা। অপিচ অমর হইতে পারিব না বলিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে উদাসীন থাকা, ও অসীম জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিবনা বলিয়া জ্ঞানানুশীলনে বিরত থাকা, একই প্রকারের মূর্খতা।—

"অন্ধকার কাননের মাঝে, যতটুক আলো দেখা যায়,
এস সখে লভি সেইটুকু, এস খেলা খেলিব হেথায়।
* * *
—এ জীবন যতক্ষণ আছে,
এস সখে ঘুরি এই দিকে, আলোকের রেখাটির কাছে।
কিরণের রেখাটী ধরিয়া, উর্দ্ধে যদি হই অগ্রসর—
না হই কিই বা ক্ষতি তাহে, মরিব এ জ্যোতির ভিতর।"

কবির এই আশ্বাসপূর্ণ মধুর আহ্বান বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, "ভ্রান্তির ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিয়া এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায়, উহা অন্যথা অসম্ভব। কেননা ত্রিগুণাত্মক সংসারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কিছুই মিলে না। উপভোগ্য পদার্থ মাত্রই "ভাল-মন্দ"-মিশ্রিত। সুতরাং তাহা হইতে তৃপ্তিলাভ করিতে হইলেই মন্দ টুকুর কথা ভুলিয়া যাওয়া আবশ্যক।—

"Where ignorance is bliss, it is folly to be wise."
"কি ফল জাগিয়ে বল, সুখী যদি ঘুম ঘোরে ?"

কিন্তু এই 'ঘুমঘোর' কতক্ষণ স্থায়ী হইবে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়, যখন উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন ঐ 'মন্দ টুকু' কি শতগুণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দিবেনা ? বস্তুতঃ ভ্রান্তিঘটিত সুখও ভ্রান্তিরই ন্যায় প্রতারণাশীল। অসত্যের উপরে সুখের প্রতিষ্ঠা করা ও আকাশের গায়ে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা একই কথা। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উহা কখনই টিকিবে না ;—"Man's wishes and thoughts must be in harmony with the nature or he will surely suffer."

প্রকৃতিরাজ্যে বাস করিতে হইলেই, তাহার বিধি নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে এবং তদনুসারে ইচ্ছা,চিন্তা,উদ্যোগ প্রভৃতি নিয়মিত করিতে হইবে,নতুবা সত্যশীলা প্রকৃতির হস্তে নিস্তার নাই, বিনাশ নিশ্চিত। যতটুকু সত্যের উপরে দণ্ডায়মান,' ততটুকুই যোগ্যতম, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারবিণের আবিষ্কৃত "যোগ্যতমের স্থিতি" (The survival of the fittest) এই তত্ত্বের সারমর্ম্ম। অজ্ঞাত অবস্থায় অসত্যের সেবা করিলেও পরিণামে তাহার অকল্যাণ-কর ফল ভোগ করিতে হইবে। কেননা, গরল অজ্ঞাত অবস্থায় পান করিলেও তাহার প্রাণনাশিকা শক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ গরলের শোধন ভ্রান্তির দ্বারা, বিস্মৃতির দ্বারা সম্ভব নহে, পরন্তু জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। এই জ্ঞানশোধিত গরল পান করিয়াই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সক্রেটিশ অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

কবিতা-কুঞ্জ।

---

(১)

যূথিকা।

আমি অনূঢ়া যূথিকা।
শুধু সোহাগেতে গড়া প্রাণটুকু মোর ;
তাই ত সহিতে নারি ফুলের আঁচোড়,—
তাই ত নীরবে ফুটে নীরবেই ঝ'রে যাই,—
তাই ত ফুলের ঘায় মরমেতে ম'রে যাই।
মরতের ভালবাসা— সে শুধু চ'খের নেশা!
স্বরগের ভালবাসা— সে যে, গো, জীবন-নাশা!—
পরতে পরতে পশি' হৃদয়ের মাঝখানে
তীব্র হলাহল আনি' ঢেলে দেয় প্রাণে।
শিথিল হৃদয়-গ্রন্থি পিপাসা-তাড়নে
মরীচিকা পানে ধায় আশার ছলনে।

আশা তা'রে ভুলাইয়ে কোন্ দেশে যায় নিয়ে ;
এই মেটে,—এই মেটে,— এই দেয় ফিরাইয়ে !
অতি দূর দূরান্তরে—গগণের গায়—
অসীম নীলিমা মাঝে
অতি ম্লান ছায়া-পথ প্রায়—
স্মৃতিরে জাগা'য়ে দিয়ে আশা কোথা আঁধারে লুকায় !
তাই ত আঁধারে এসে আঁধারেই চ'লে যাই,—
তাই ত নীরবে ফুটে নীরবেই ঝ'রে যাই !

* * *

চপল মলয়া-বায়
লুটাইয়ে পড়ে পায়,—
কত ছলে খুলে দেয় মুখের বসন !
আমি, লতিকার ছায়ে
মুখখানি লুকাইয়ে,
কত যে তাহারে করি গালি বরিষণ !
ঘোম্‌টার পাশ দিয়ে
আড়-চ'খে দেখি চেয়ে—
হাসি'ছে গগণ-তলে চন্দ্রমা চপল,—
হাসি'ছে কৌতুকে ভাসি' তারকার দল !
চাঁদেরে হাসিতে দেখে সরসী হাসিয়ে নিল,—
কুমুদ সে হাসি-রাশি জগতে ছড়া'য়ে দিল !
নিশার মধুর হাসি,
শোভনা কৌমুদী রাশি,
উছলিয়ে প'ড়ে গেল নয়নের কোণে—
হাসিটি কুড়া'য়ে নিল মল্লিকা গোপনে !
পাপিয়া কোথায় ছিল,
সেও এসে যোগ দিল,—
হাসিটি ছড়া'য়ে দিল সুদূর গগণে !
প্রকৃতির হাসি দেখে লাজে মোর ফেটে গেল বুক—
নীরবে পাতার আড়ে লুকাইনু মুখ !

---

(২)

জাহ্নবীর প্রতি।

বুক-ভরা ব্যথা নিয়ে এসেছি জাহ্নবি! আজি,
তব উপকূলে;
দুইটী মরম-কথা,— হৃদয়-শোণিত সম—
রেখে যাব চ'লে!
সেধেছি কতেক জনে, শুনিতে করুণা করি'
দরিদ্র-কাহিনী;
ঘৃণায় কেহই ফিরি' চাহেনি অভাগা পানে,—
পাষাণ—পাষাণী!
কেনবা শুনিবে তা'রা নীরস জীবন এই,—
চির তমোময়?—
ঝটিকা-কল্লোল-পূর্ণ মহাসিন্ধু লভিবারে,
কা'র সাধ হয়?
তাই গো নিরাশ মনে ভ্রমিয়া পাগল সম,
এসেছি হেথায়;
বিফল বাসনা পূর্ণ কর, পুণ্য-প্রীতিময়ি!
নিজ করুণায়।
এম্নি আর একদিন এসেছিনু তব পাশে,
দিতে বিসর্জ্জন
জীবনের প্রিয় মম: কোমল প্রতিমাখানি,—
ত্রিদিব-রতন!
সেই যে স্বপন-বালা, প্রভাতী অরুণ মত,
এসেছিল, হায়!
বৈশাখী পূর্ণিমা-কোলে, আধ-ঘুম-জাগরণে,
ল'য়েছে বিদায়!
পায়নি সুখের কভু আস্বাদ পীযূষময়,—
মুহূর্ত্তের তরে;
মহাসংগ্রামের মাঝে জীবনের পটখানি
গেছে তা'র স'রে!

ছেড়েচে সংসার সে গো,— আমার প্রকৃতিরাণী,—
মহা অভিমানে ;
স্নেহের কোমল ছায় রাখিও তাহারে দেবি !—
কুসুম-শয়ানে !

---

(৩)

দগ্ধ-হৃদয়।

কি আছে ? হৃদয়ময় শুধু হাহাকার,
করুণা-ক্রন্দন শুধু তীব্র নিরাশার।
দগধ হৃদয় ভূমি মরুভূমি প্রায়,
নিরাশার দাবানলে জ্বলিতেছে হায় !
দিবানিশি কাঁদিতেছে কি করুণ তানে,
নির্ম্মম যাতনাময় অবসন্ন প্রাণে।
ভাবি তাই, প্রিয় দেব ! চরণে তোমার
কি দিবে অভাগী তব যোগ্য উপহার ?
বাসন্ত মল্লিকা, নাথ ! নাহি ত হেথায়,
ক্ষুদ্র তুচ্ছ বন ফুল—তাও নাহি হায় !
চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, ঔজ্জ্বল্য ভানুর,
কিছু নাই,—আছে শুধু আঁধার প্রচুর !
আছে আর অশ্রু জল—প্রাণের সম্বল—
অর্পিব চরণে প্রিয় ! তাহাই কেবল।
প্রফুল্ল ফুলের হাসি প্রভাত বেলায়,
উজ্জ্বল নক্ষত্র-ছটা নীল নভঃ-গায়,
দূরাগত বংশীরব গভীরা নিশীথে,
মধুর সে কুহুস্বর বসন্ত প্রভাতে,
পাইবেনা, প্রিয় দেব ! অভাগীর পাশে,—
ভগন হৃদয় সে যে গভীর নৈরাশে।
শুধু তপ্ত অশ্রুদাম ঢালিবে চরণে,
নিরাশ সঙ্গীত কভু কবে কাণে কাণে।

দগধ হৃদয় ভূমি মরুভূমি মত;
করুণা-সলিল তায় ঢালি' অবিরত
করিতে পার, গো, যদি শ্যামল শোভন,
লও তবে,—দগ্ধ হৃদি করিনু অর্পণ!

---

(৪)

কি চা'ব।

কি আর চাহিব নাথ?—
সবি ত দিয়াছ মোরে;
প্রাণের কামনা শুধু
যাইতে তোমার ক্রোড়ে।
তাই ত পাগল প্রাণে
পথে কেঁদে কেঁদে ফিরি,—
মরতের শোভা রাশি
কিছু না নয়নে হেরি।
দাও, নাথ, অকিঞ্চনে
রাতুল চরণ তব,
বাসনা সদাই তা'র
শান্তিময় তলে র'ব।
পাইলে করুণা তব
ভুলে যাই যত জ্বালা;—
বুঝি না ও প্রেমরাশি
কত যে পীযূষ ঢালা!
এমনি করুণা-ধারা
চিরদিন ঢেলো, প্রভু,—
জীবনে মরণে পদ
ছাড়ি না যেন, গো, কভু।

(৫)

শান্তি।

সংসার-কাননে ভ্রমিণু বিস্তর
দেখিতে শান্তির বদন, হায়!
শুনিনু কেবল অশান্তির গাথা
তরু-গুল্ম-লতা সবাই গায়।
রাজার প্রাসাদে, গৃহীর প্রাঙ্গণে,
পশিনু পিয়াসে যতেক ঠাঁই,
হিংসা-দ্বেষ-জ্বালা জ্বলন্ত কেবল—
শান্তি-বারি-ধারা কোথাও নাই।
শ্বাপদ-সঙ্কুল বিজন কানন,
হিংস্রক ধীবর তটিনী-তীরে,
পুণ্য নিকেতন তীর্থ-পুরী-মাঝে
অর্থলোভী যত পাষণ্ড ফিরে।
আকুল পরাণে ভাবি আন মনে—
এ ভুবনে শান্তি নাই কি তবে?
কে যেন তখন অন্তরীক্ষ হ'তে
কহিলা অপূর্ব্ব মধুর রবে—
"রাজার ভবনে, কিম্বা গৃহে, বনে,
জলে, স্থলে, শান্তি নাহিক রয়;
আপন হৃদয়ে সন্তোষে তুষিলে
শান্তি দেবী আসি' উদয় হয়।"

জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

(২)

এখন পূর্ব্বোল্লেখিত "শক্তি" এবং "পদার্থ" দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ কি বুঝেন তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়। সাধারণতঃ, উপলখণ্ড তুলিতে আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহাকেই আমরা "শক্তি" বলিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিকগণও শক্তি শব্দে প্রায় ইহাই বুঝিয়া থাকেন। একটি প্রতিরোধ-ব্যতিক্রম ঘটাইবার জন্য কিম্বা একটি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহাকেই শক্তি বলিয়া তাঁহারা মানিয়া লয়েন। এরূপ সংজ্ঞা দ্বারা জীবজগৎ ভিন্ন জড়পদার্থদিগেরও যে শক্তি থাকিতে পারে তাহা সহজে উপলব্ধ হইতে পারে। কামানের গোলা যখন প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে, তখন উহা যে কত শক্তি ধরে তাহা আর বলিতে হইবে না। মূলতঃ জীব ও জড় শক্তি একবিধ এবং উভয়ই জড়-শক্তি-পদবাচ্য হইলেও উহাদিগের মধ্যে এই টুকু প্রভেদ যে, জীবগণের—বিশেষতঃ মনুষ্যের—শক্তি ন্যূনাধিক ভাবে বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু জড়শক্তি কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। জড়শক্তি সম্মুখে যাহা পাইবে—কাহারও মুখের দিকে তাকাইবে না, পাত্রাপাত্র জ্ঞান করিবে না, কাহারও কথা শুনিবে না তাহা ধ্বংস করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যাইবে। শুনিয়াছ কি, বজ্রের প্রলয়ঙ্কর তাড়িতস্ফুলিঙ্গ কখনও সুকু-মারমতি পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর অথবা অলোকসামান্যা সুন্দরী রমণীর লাবণ্যময় মুখ দেখিয়া প্রতিহত হইয়াছে? শিলাবৃষ্টির সময় কখন কি পুষ্পোদ্যানের কোমল কুসুমনিচয় করকার দুর্দ্দান্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে? বর্ব্বর যবণদিগের আক্রমণের আসুরিক অত্যাচারের ন্যায় বুঝি দেববিগ্রহগণও ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পান না,—অসহায়া রমণী এবং শিশুগণ ত কোন্ ছার!

এখন বুঝা গেল যে, জড় পদার্থগণ যখন বেগবান হইয়া চলিতে থাকে, তখন তাহারা নিজবেগের পরিমাণ অনুসারে কিছু কিছু শক্তি ধরিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক কিরূপ অবস্থায় জড় পদার্থগণ নিজে নিশ্চল এবং স্থির থাকি-য়াও শক্তির অধিকারী হইতে পারে। ছাদের উপর একখানি ইষ্টক আছে—

নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, যেন বড় নিরীহ। ইহার আকারেঙ্গিত দেখিলে কি বোধ হয় যে ইহা প্রভূত শক্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে? তুমি তোমার নিজের একটু শক্তি খরচ করিয়া ছাদের প্রান্তভাগে লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে ইহাকে ছাড়িয়া দেও, দেখিবে তখনই এই নিরীহ পদার্থটি কেমন সহসা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়া নিম্নস্থিত কুসুমলতিকার সদ্যঃ প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইল! এ শক্তি ইহার কোথা হইতে আসিল? পৃথিবী নিজের মাধ্যাকর্ষণের ধর্ম্মে সকল পদার্থকে আপনার ক্রোড়ে টানিতেছে। এই ইষ্টক খানিও এই জগদ্ব্যাপী আকর্ষণের বিষয়ীভূত ছিল। এতক্ষণ কোন একটি অবলম্বনের আশ্রয়ে ছিল বলিয়া, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ইহাকে নিজের ক্রোড়ে টানিতে পারে নাই। যেই অবলম্বন-শূন্য হইল, অমনি সেই আকর্ষণের ফল ফলিল। এক খণ্ড লোষ্ট্র ঊর্দ্ধভাবে নিক্ষেপ কর, দেখিবে ক্রমে ক্রমে ইহার বেগ কমিতে কমিতে চলিল—যখন নিজের উচ্চতার শেষ সীমায় উপনীত হইল তখন ইহার কোন গতিই রহিল না। এরূপ অবস্থায় ইহা নিজের গতির ধর্ম্ম দ্বারা আর অধিক কার্য্য করিতে অক্ষম। যদিও এইরূপ অবস্থায় ইহার কোন গতি নাই, তথাপি এই লোষ্ট্র খণ্ডটির নিজের ঊর্দ্ধ গতির প্রথম অবস্থায় যত খানি শক্তি ছিল এখনও ইহা প্রায় তত খানি শক্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কারণ যদি এখন উক্ত উপরিস্থিত পদার্থটীর সহিত ভূমিতলস্থ অপর আর একটি সমভারী পদার্থকে কপিকল এবং রজ্জু সাহায্যে সংবদ্ধ করিয়া দিতে পারা যায় এবং যদি ঘর্ষণোৎপাদিত প্রতিরোধক বল (friction) বর্জ্জন করিতে পারা যায়,তাহা হইলে উপরিস্থিত পদার্থটি নিম্নে অবতরণ কালীন নিম্নস্থিত পদার্থটিকে নিজে যত খানি উঠাইয়াছিল ঠিক তত খানি উঠাইবে।

আমরা দুই প্রকার শক্তির দৃষ্টান্ত পাইলাম, প্রথম শক্তি নিজের গতির উপর নির্ভর করে—দ্বিতীয় শক্তি নিজের অবস্থান এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমটিকে গতিশক্তি (kinetic energy) এবং অপরটিকে স্থিতি শক্তি (potential energy) বলেন।

পর্ব্বতোপরি হ্রদস্থিত জলের কার্য্যকারিতা নিম্নস্থিত জলের অপেক্ষা অনেক অধিক। কারণ এই উপরিস্থিত জল নিম্নে নামিবার সময় যে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তদ্দারা কোন একটি কল চালাইতে পারা যায়। যদি কলের অপেক্ষা জল নিম্নে থাকে তাহা হইলে এই জলে কল চালান সম্বন্ধে কোনই উপযোগী কার্য্য হয় না। জ্যাবদ্ধ ধনু, খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট নর,—ঈদৃশ শক্তির উদাহরণ স্থল।

সকল স্থিতি শক্তিকেই (potential energy) শেষে গতি শক্তিতে (kinetic energy) পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। না হইলে সে শক্তি কৃপণের অর্থের ন্যায় শক্তি মাত্রই থাকিল, জগৎ সংসার নিজ উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়া যে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে সেই পরিবর্ত্তনে ঐ শক্তি কোনও সহায়তা করিল না। একটি যেন ব্যাঙ্কসঞ্চিত বিপুল ধনরাশি, অপরটি যেন ক্রেতাবিক্রেতাদিগের নিত্য খরচের টাকা। ব্যাঙ্কস্থিত অর্থ আমরা যখন ইচ্ছা বাহির করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে পারি, স্থিতিশক্তিকেও আমরা যখন ইচ্ছা কার্য্যে লাগাইতে পারি। মনে করুন দুইটি কল আছে, একটি জল বেগ দ্বারা চালিত হয় এবং অপরটি বায়ুশক্তি দ্বারা চালিত হয়। প্রথম কলটি চালাইতে হইলে আমরা যেখানে সুবিধামত জল পাইব সেই জলই কার্য্যে লাগাইতে পারি। দ্বিতীয় কলটি চালাইতে হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বায়ু প্রবল বেগে না বহিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। প্রথমটি ধনী ব্যক্তির ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীন—সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অপরটি তুচ্ছ দরিদ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে পরমুখাপেক্ষী—সম্পূর্ণ রূপে পরাধীন। যখন কোন ধনী বেতন দিয়া একটি শ্রমজীবীর দ্বারা নিজের কার্য্য করাইয়া লয়েন, তখন তিনি বাস্তবিকই নিজের অবস্থা প্রযুক্ত যে শক্তির অধিকারী সেই শক্তিকে সাধারণ শক্তিতে পরিণত করিয়া থাকেন। এই রূপে একটি যন্ত্রচালক উচ্চ স্থানে অবস্থিত জলরাশির কিয়দংশ লইয়া নিজের কার্য্য করাইবার সময় স্থিতি শক্তিকে গতি শক্তিতে পরিণত করে।

চিন্তাশীল পাঠকের মনে এখন আর একটী প্রশ্ন সহজেই উদিত হইতে পারে। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে এক খণ্ড লোষ্ট্র, ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়া যখন আবার ভূতল স্পর্শ করে তখন উৎক্ষিপ্ত হইবার সময় তাহার যত খানি শক্তি ছিল প্রায় তত খানি শক্তিই থাকে। যখন এই লোষ্ট্র, খণ্ডটি ভূতল স্পর্শ করিল তখন আবার নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল—ভূতল স্পর্শ করিবার সময় ইহার যে শক্তি ছিল সে শক্তি এখন কোথায় গেল? কথাটি একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে, আমাদের এই শ্রেণীর আরও অনেক উদাহরণ মনে স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। কর্ম্মকার যখন হাতুড়ি দ্বারা লৌহ পিটাইতে থাকে, তখন কত বেগে হাতুড়ি পরিচালন করে। এই হাতুড়ি এই শক্তির অধিকারী হইয়া লৌহ খণ্ড গিয়া আঘাত করে,করিয়া নিশ্চল হইয়া পড়ে, বোধ হয় যেন হাতুড়ির মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার জীবন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এখন

এই শক্তিটা কোথায় গেল ?—শূন্যে,তাও কি সম্ভব ? লৌহ খণ্ডে হাতুড়ি পিটাইতে থাক, দেখিবে লৌহ অচিরাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এখন যদি বলি হাতুড়ির শক্তি উত্তাপ শক্তি রূপে পরিণত হইয়া লৌহ খণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় পাঠক ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না। বাস্তবিক ইহাই ঘটিয়া থাকে। সীসা নির্ম্মিত গুলি বন্দুক হইতে ছুটিয়া অদূরস্থিত ধাতুময় লক্ষ্য পদার্থে (target) লাগিলে সময় সময় এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, গুলি তৎক্ষণাৎ গলিয়া যায়। লোষ্ট্র খণ্ডটার শক্তিও এইরূপে উত্তাপ শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উত্তাপের পরিমাণ এত অল্প যে আমরা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি ব্যতীত তাহা কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারি না। অণুমণ্ডলীর মধ্যে কোন রূপ একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে পদার্থ মাত্রই উত্তপ্ত হইয়া থাকে, ইহা উত্তাপবিজ্ঞানের অন্যতম অনুমিতি। একটি রাসায়নিক সংযোগের সময় আণবিক আকর্ষণ এবং প্রতিক্ষেপজনিত অণুপরমাণু মধ্যে যে ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হয় এবং ইহার জন্যই যে বহুল পরিমাণে উত্তাপের সৃষ্টি হয় ইহা রসায়নবেত্তা মাত্রই অবগত আছেন।

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে একপ্রকার শক্তি অন্যপ্রকার শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। সকলের মধ্যে সাদৃশ্য সংস্থাপন করা বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য, এইজন্য আজকাল শক্তি সমূহের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিকদের একটি মহৎ উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের পরিশ্রম এবং চেষ্টার অনেক সুফলও ফলিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শক্তি দ্বিবিধ ; গতি শক্তি (Kinetic energy) ও স্থিতিশক্তি (Potential energy)। গতিশক্তির উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক দুই-একটি কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।—এখন স্থিতিশক্তির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক। আমরা জড়জগতে স্থিতিশক্তির উদাহরণ প্রায়ই পাইয়া থাকি, তন্মধ্যে কয়েকটার উল্লেখ করা যাইতেছে:—

(১) ইন্ধন।—কাষ্ঠ এবং খনিজ কয়লাই ইন্ধনের প্রধানতম উদাহরণ। ইন্ধন জ্বালাইয়া আমরা অনেক উত্তাপ পাইয়া থাকি, এবং তদ্দ্বারা অনেক কার্য্য করিতে পারি। অগ্নি দ্বারা জগতে কি না হয় ?—সামান্য রন্ধন হইতে বাষ্পীয় রথাদি পরিচালন পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকেন, অগ্নির আবিষ্কার হইতেই মনুষ্যজাতির সভ্যতার সূত্রপাত। এই উত্তাপ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা যদি আমরা দেখিতে চেষ্টা করি,

তবে সূর্য্যকেই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া জানিতে পারি। এই স্থলে সূর্য্যের শক্তি একটি রাসায়নিক শক্তির সংযোগে স্থিতিশক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন যে, আকাশে প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে দগ্ধাঙ্গারক বাষ্প (Carbonic acid gas) থাকে। এই চরাচরের জন্তুগণ শ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে দগ্ধাঙ্গারক বাষ্প ফেলিয়া থাকে। এই বাষ্প পুনশ্চ শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে শরীরের হানি হইয়া থাকে। এখন দেখুন যে এই বাষ্প দূরীকরণের যদি কোন স্বাভাবিক নিয়ম না থাকিত তবে জীবের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিত। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার আশ্চর্য্য কৌশলে এই বাষ্পের উৎপত্তি হইবামাত্র বিদূরিত হইবার উপায়ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাষ্প অঙ্গার (carbon) এবং দহণ বাষ্প (অম্লজান—oxygen) দ্বারা নির্ম্মিত। সূর্য্যের রশ্মির এমনি ক্ষমতা আছে যে, ইহা উদ্ভিদজ হরিদ্বর্ণীয় পদার্থ সাহায্যে এই দগ্ধাঙ্গারক বাষ্পের উপাদানগণকে ইহাদের রাসায়নিক সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। অঙ্গার বিশ্লিষ্ট হইয়া কাষ্ঠরূপে পরিণত হয় এবং দহন বাষ্প আকাশে মিশ্রিত হইয়া "বিরহ সন্তপ্তের" ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, সুবিধা পাইলে আবার জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া আবার অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া আসে। সূর্য্যের শক্তি কাষ্ঠের মধ্যে এইরূপে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত হইয়া সঞ্চিত থাকে। ইহা স্থিতিশক্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।—যখন আমরা কাষ্ঠ জ্বালাইয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ করিতে থাকি তখন বাস্তবিকই আমাদের সেই বহুবর্ষ যাবৎ সঞ্চিত সৌর শক্তি ব্যয়িত হইয়া থাকে। (পাঠক এখানে সেই পূর্ব্বোল্লেখিত সঞ্চিত অর্থের উপমাটি স্মরণ করিলে এ বিষয়টি অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবেন) খনিজ কয়লাও এই কাষ্ঠ হইতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে স্থান বিশেষের বৃক্ষরাজি ভূস্তরে প্রোথিত হইয়া গেলে বহু সহস্র বর্ষ ভূমধ্যে থাকিয়া খনিজ কয়লারূপে পরিণত হইয়া যায়।

(২) জীবের খাদ্য।—জীবের খাদ্যকে শক্তিরূপে দেখিতে হইলে আমরা পূর্ব্বে কাষ্ঠকে যেরূপ ভাবে দেখিয়াছি সেইরূপ ভাবে দেখিতে হইবে। খাদ্য শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ দহন বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপে সেই খাদ্যের দহনক্রিয়া (oxidation) হয়। এই দহনক্রিয়া দ্বারা জীব-শরীরের উত্তাপ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এবং কার্য্যকারিণী শক্তিও ইহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শক্তির ব্যয় অনুসারে খাদ্যের ব্যয় হইয়া থাকে।

কঠিন পরিশ্রমকারী কয়েদীর লঘু পরিশ্রমকারী কয়েদী অপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্যের প্রয়োজন; সৈন্যগণ যখন যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তখন অধিক অন্ন তাহাদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ খাদ্যের উৎপত্তি সূর্য্য হইতে। যাহারা উদ্ভিদভোজী তাহাদের খাদ্য যে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহারা মাংসভোজী—তাহাদের আহার্য্য যে জীব, সেই জীব নিজ শরীরের উৎপত্তি এবং পরিপুষ্টির জন্য উদ্ভিদগণের নিকট বিশেষরূপে ঋণী; সুতরাং সূর্য্য হইতে তাহারা যে উৎপন্ন তাহা বলা যাইতে পারে।

(৩) উচ্চস্থানে অবস্থান হেতু জলশক্তি।—ইহারও উৎপত্তি সূর্য্য হইতে। সূর্য্যের তেজের দ্বারা সমুদ্র ইত্যাদির জল বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি। এই মেঘ বাত্যা-সঞ্চালিত হইয়া পার্ব্বত্য দেশে উড্ডীন হইয়া আসিয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এই বৃষ্টির জল উচ্চস্থানে অবস্থিতি হেতু আমরা সাধারণ শক্তিরূপে পরিণত করিতে পারি।

(৪) জোয়ারে জলশক্তি।—সকলেই জানেন চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাঁটার সময় যখন জল নামিয়া যায় তখন সেই জলবেগ দ্বারা অনেক কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এ শক্তি কিন্তু সূর্য্য হইতে উৎপন্ন নহে, আজকাল ইহাই অনেকের বিশ্বাস; পৃথিবী যে শক্তি দ্বারা স্বীয় কক্ষে চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান্ হইয়া থাকে, এ শক্তি সেই শক্তি হইতে উৎপন্ন।

এখন দেখা গেল যে পৃথিবীর জড়শক্তির মধ্যে অধিকাংশই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত। গতিশক্তিরও অনেকটা সূর্য্য হইতে উৎপত্তি। গতিশক্তির প্রধান উদাহরণ বেগবান বায়ু এবং স্রোতস্বিনী নদী। প্রথমটির কারণ যে সূর্য্যের উত্তাপ তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন, এবং নদীর জলও যে সূর্য্যরশ্মি হইতে উদ্ভূত বাষ্পের পরিণাম তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখন চিন্তাশীল পাঠক আর একটি অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। যদি সূর্য্যতেজের এত ব্যয়—তবে সূর্য্যতেজের হ্রাস হয় না কেন? সূর্য্যের তেজ কি অনন্ত? বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাহা নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে সূর্য্যের উত্তাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বলা আবশ্যক। তাঁহাদের ধারণা এই যে, সূর্য্য যে পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত—সেই পদার্থনিচয় আমাদের পৃথিবীর ন্যায় দৃঢ়রূপে পরস্পর সম্বদ্ধ নহে—তাহারা পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, এবং আকর্ষণী শক্তির দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণশক্তির জন্য পরস্পর জড়ভাবের উপর

পড়িতেছে ; এইরূপে সেই অনন্ত পদার্থরাশির মধ্যে এক অতি ভয়াবহ সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। এই সংঘর্ষ দ্বারাই সূর্য্যের উত্তাপ এবং আলোকের সৃষ্টি। এই সংঘর্ষ ব্যাপার হইতে সূর্য্যের এত অসীম আলোক ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়, ইহা অনেকের নিকট বিস্ময়াবহ বোধ হইতে পারে। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের পরিমাণ কত—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অন্তর্গত হইতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্যর উইলিয়ম টমসন (Sir William Thompson) মহোদয় গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে সৌরমণ্ডলে পদার্থনিচয়ের সম্পাতে সূর্য্যের শৈশবাবস্থায় যে উত্তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল—সূর্য্যোত্তাপের বর্ত্তমান ব্যয়ের হিসাবে সেই সঞ্চিত উত্তাপরাশি কোটী বৎসরেও নিঃশেষিত হইবে কি না সন্দেহ।

আমরা শক্তির বিষয় বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—এখন "পদার্থ" সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে বাকী রহিয়াছে। সকলেই জানেন যে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে। এরূপ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পদার্থের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহাতে উপযুক্ত শক্তি সংযোগ দ্বারা মনুষ্যগণ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কাচকলমের (prism) গুণ সকলেই জানেন—ইহাতে রামধনুকের রঙ দেখা যায়—ইহারই ধর্ম্মে এবং আলোকশক্তির সাহায্যে বর্ণলেখাবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার আবিষ্কারে রসায়নশাস্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে তাহা রসায়নবেত্তামাত্রই জানেন। পরকলা (Lens) এবং আলোকশক্তির সাহায্যে দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি; চুম্বক (Magnet) এবং সাধারণ শক্তির সাহায্যে তাড়িত যন্ত্রাদির (Dynamo machines) উৎপত্তি; জলের ধর্ম্মে এবং উত্তাপশক্তির সাহায্যে রেল-গাড়ীর ছুটাছুটি। আমরা যে লবণ প্রত্যহ ব্যবহার করি তাহা দুইটি উপাদান দ্বারা গঠিত—একটি সর্জ্জিক ধাতু (Sodium), অপরটি হরিণবাষ্প (Chlorine)। সর্জ্জিক ধাতু অতিশয় উগ্রধর্ম্মী—ইহা হাতে করিলে হাত পুড়িয়া যায়—জলে ফেলিলে অতি প্রচণ্ডবেগে জল আপন উপাদানদ্বয়ে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ইহার কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যেন অগ্নি ইহার সঙ্গে লাগিয়াই রহিয়াছে যেখানে সর্জ্জিকের ব্যবহার সেখানেই প্রায় অগ্নির উৎপত্তি ;—অপরের সহিত মিলিত হইবার সময় ইহার প্রথম যৌতুকই যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। হরিণবায়ুও বড় ছাড়িয়া কথা কহে না।

ইহা যে গন্ধ ছাড়ে তাহার কাছে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য ?—শুধু তাহাও নহে—ইহা নাসিকার মধ্যে কোন প্রকারে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়, একটু বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিলেই সর্ব্বনাশ !—নাক মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে, আর চাপ দ্বারা গাঢ়ভাবে যদি ইহা নাসিকা মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তাহা হইলে আর পরিত্রাণ নাই—ইহকালের মত অনন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিতে হয়। এই ত গেল লবণের উপাদানদ্বয়ের ধর্ম্ম। এই উপাদানদ্বয় রাসায়নিক শক্তির সংযোগে মিশ্রিত হইয়া আমাদের আহার্য্য লবণরূপে পরিণত হইয়াছে।—কি জানি কেমন করিয়া উভয়ের হানিকর এবং উগ্র ধর্ম্ম সকল লোপ পাইয়া পরম মূল্যবান, দেহের প্রধান অবলম্বন, লবণের প্রীতিকর এবং মানব-দেহের উপযোগী ধর্ম্ম সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে।—এই দুইটি অপকারী পদার্থ রাসায়নিক শক্তির সাহায্যে কেমন উপকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আর একটি উদাহরণ দেখুন। অনেকে বোধ হয় শ্যামতক দ্রাবকের (Prussic acid) নাম শুনিয়াছেন। ইহার অন্যতম ইংরাজী নাম হাইড্রোসায়ানিক আসিড (Hydrocyanic acid)। * ইহার ন্যায় তীব্র বিষ আর নাই ; একবিন্দুতে একেবারে অনেকগুলি লোকের প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। শুনিলে আশ্চর্য্য জন্মিবে যে এই ভয়ানক দ্রব্যের উপকরণের মধ্যে কোনটিও বিষ নহে বরং প্রত্যেকটি শরীর ধারণ পক্ষে অল্পাধিক পরিমাণে উপকারী। ইহার উপাদান অম্লজনক বাষ্প (Hydrogen), অঙ্গার (carbon) এবং মরুতক বাষ্প (Nitrogen)। অম্লজনক বাষ্প জলের অন্যতর উপাদান—ইহাতে বিষাক্ত ধর্ম্ম কিছুই নাই। অঙ্গার অতিশয় নির্দ্দোষী ; আমাদের শরীরের অধিকাংশই এই কয়লা,—উদ্ভিদ জগতের অধিকাংশই এই কয়লা—এই কয়লার নিকট জগৎ কত ঋণী তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মরুতক বাষ্পের বিষাক্ত ধর্ম্ম কিছুই নাই—ইহা বাতাসের একটি উপাদান—আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ইহা ফুস্ফুসের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি। বাতাসে উপস্থিত থাকিয়া ইহা দহকবাষ্পের উগ্রতা হ্রাস করিয়া থাকে। দহকবাষ্পের অভাবে আমরা বাঁচিতে পারি না ; অবশ্য সেইজন্য কেবলমাত্র মরুতক বাষ্পের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে আমরা

---

* এখানে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ গৃহীত হইল। Cynogen এর প্রতিশব্দ শ্যামৎ পাইলাম ; সেই সূত্রে Hydrocyanic acid কে শ্যামতক দ্রাবক করা গেল।

মরিয়া যাই। সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, এ মৃত্যু মরুতক বাষ্পের কোন বিষাক্ততাজনিত নহে—ইহা কেবল দহকবাষ্পের অভাবজনিত। এখন দেখুন এই তিনটি নির্দ্দোষী পদার্থ রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত হইয়া কিরূপ তীব্র বিষে পরিণত হইয়া থাকে। রাসায়নিক শক্তির কুটিলতা কে বুঝিবে? ইহা তিনটি নিরপরাধীকে মিলাইয়া কি কুহকে মুগ্ধ করিয়া জীব-সংহার-ব্রতে দীক্ষিত করে! ইহা আবার দুইটি পরহিংসাপরায়ণকে পরস্পর কিরূপ সম্বদ্ধ করিয়া পরোপকার ধর্ম্মে ব্রতী করিয়া দেয়! তুমি জড়শক্তি, তোমার কূটরহস্য মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য? তোমাকে দূর হইতে নমস্কার!

দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

ষষ্ঠীপালা।

বোধনের আয়োজন।

এক দৃষ্টে শ্রীরাম প্রতিমা পানে চা'ন। ধন্য ধন্য কৈলা বিশ্বকর্ম্মার বাখান॥
প্রভাতে সুগ্রীবে ক'ন দেব নারায়ণ। এখন না আ'ল (১) কেন ঋষি মুনিগণ॥
বলিতে বলিতে কি দণ্ডকারণ্যবাসী। উপস্থিত হইল ষাটি সহস্রেক ঋষি॥
মুনি-দারা আ'লা (১) তা'রা দেহ অতি কৃশা। কানন-কুটীরে কপিরাজ দিল বাসা॥
রঘুপতি মুনিগণে প্রণতি করিলা। সবে মিলে' এককালে শুভাশীষ দিলা॥
কুশল জিজ্ঞাসা কৈলা ভকত বৎসল। সবে ক'ন তোমার মঙ্গলে সুমঙ্গল॥
দশভুজা পূজা জন্য অনুমতি নিলা। বিপ্রগণ ক্ষিপ্র করি' শুভ আজ্ঞা দিলা॥
স্মরণ করিবামাত্র আ'লা (১) বৃহস্পতি। বামকরে শোভে দুর্গা-পূজার পদ্ধতি॥
প্রভুরে বলেন গুরু কর প্রাতঃস্নান। নিত্য কর্ম্ম চিত্ত দিয়া কর সাবধান॥

---

(১) আ'ল—আইল, আসিল। আ'লা—আসিলা।

বোধন করিতে চল বেল্ব (২) তরু-তলে। সায়াহ্নের ক্রিয়া বটে বেদে (৩) এই বলে ॥

বৃহস্পতি অনুমতি এই মতে দিলা। প্রাতঃক্রিয়া আদি সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপিলা ॥
সায়াহ্ন সময় উপস্থিত শেষ বেলা। বোধন করিতে জগন্নাথ যাত্রা কৈলা ॥
বসন ভূষণ মাল্য চন্দনে করিয়া। মুনিগণে বরণ করিলা প্রীত হ'য়া ॥
বৃহস্পতি পুরোহিতে করিয়া বরণ। আনন্দে অব্যাজে যা'ন দেব সনাতন ॥
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল খোল কাঁসী। ডম্ফ ঝম্ফ ঝর্ঝরী রবাব (৪) বীণা বাঁশী ॥
বাজে ঢাক ঢোল তোলপাড় করে মাটী। দশ দিক কাঁপে দুন্দুভিতে পড়ে কাঠি ॥
মাদল (৫) বাজায় যেন বাদল গর্জ্জন। রগড়ে দগড় বাদ্যে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
মেঘের উপমা হেন দামামার ধ্বনি। টমক টিকর কাড়া কর্ণ্নার সাহিনী (৬) ॥
খনক খঞ্জরী চুঙ্গ মৃদু সপ্তস্বরা। ভেমচা ভুরঙ্গ ভেরী মুরজ মন্দিরা ॥
ডিণ্ডিম মর্দ্দল ভেরু বাজয়ে মুচঙ্গ। বাজয়ে পিনাক বীণা মধুর মৃদঙ্গ ॥
পাখোয়াজ করিলাস সারিন্দা ত্রিতন্ত্রী। তম্বুরাতে তাল-মানে গায় যত যন্ত্রী ॥
এই যে ব্যাল্লিশ বাদ্য বাজে দিবানিশি। গৌরী-গুণ গায় সবে রাগিনী মালসী ॥
কেহ কা'র' ধ্বনি শুনিবারে নাহি পায়। 'জয় দুর্গা' বলি' কপিচয় মাচি' যায় ॥
কেহ নিল কুশ-কোষা কেহ বা তুলসী। গন্ধসজ্জা কা'র' করে পুষ্প রাশি রাশি ॥
ষোড়শাঙ্গ ধূপ দীপ ঘৃত-যুত ধূনা। ঘট জন্য স্বর্ণঘট নিল কত জনা ॥

---

(২) বেল্ব = বিল্ব।—সাহিত্য-সেবক, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠার ১ম টিপ্পনী দেখুন।

(৩) বেদে = শাস্ত্রে (এস্থলে দুর্গাপূজা-পদ্ধতিতে)—ঐ ঐ ৬৪ পৃঃ ৭ম টিপ্পনী।

(৪) "মেঘনাদবধ"-পাঠকের নিকট 'রবাব' যন্ত্র অপরিচিত নহে,—

"————কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিভিছে দেউটী,
নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী।"

(৫) 'মাদল" অস্মদ্দেশে বড় প্রচলিত নহে, তবে সাঁওতালদিগের মধ্যে উহার যে বিশিষ্ট প্রচলন—অধুনাতন কুলী-সংগ্রাহকদিগের কৃপায় (!) তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) এই পংক্তি ও পরবর্ত্তী কয়েক পংক্তির অন্তর্গত কোন কোন যন্ত্রের পরিচয় আমরা অবগত নহি ; অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ, বোধ হয়, 'বিশ্বকোষে' সে সকলের বিশেষ তথ্য জানিতে পারিবেন। কবিতার ছন্দঃ মিলনানুরোধে এক যন্ত্রের (যথা—মুরজ ও মৃদঙ্গ, মর্দ্দল ও মাদল, বীণা) পুনরুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ষোড়শোপচার যত নৈবেদ্য বিধান। এ সকল ল'য়া যাত্রা কৈল ভগবান॥
দুর্গাপঞ্চরাত্রি গা'ন জগদ্রাম দ্বিজে। শঙ্করী শরণ দেহ চরণ-অম্বুজে॥

বোধন-বিধান।

প্রবর্ষণ-পর্ব্বত নিকটে বেল্ব তরু। বোধন করিতে যাত্রা কৈলা দেবগুরু॥
বেল্বের সমীপে কৈলা পাদ-প্রক্ষালন। কুশহস্ত হ'য়া রাম কৈলা আচমন॥
বেল্বের সমীপে ষাটি-সহস্র ব্রাহ্মণ। স্বস্তি-বাক্য পাঠ কৈলা তণ্ডুল ক্ষেপণ॥
শ্বেত শর্ষা ত্যাগে দূর কৈলা বিঘ্নকারী। কনক-কলস ঘট থু'লা (৭) ধ্যানোপরি॥
জলপূর্ণ ঘট করি' গুবাক ক্ষেপণ। আম্রশাখা দিয়া তথি করেন পূজন॥
সূর্য্য সোম কুজ বুধ গুরু শুক্র শনি। রাহুকেতু আদি করি' নবগ্রহ গণি'॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য পঞ্চম। এই পঞ্চ উপচারে পূজে' যথাক্রম॥
তা' পর গণেশ দুর্গা মহেশ বিষ্ণুরে। পূজিলা পরমাদরে পঞ্চ উপচারে॥
পুনর্ব্বার শঙ্খে নিলা কুশ-তিল-জল। সংকল্প করেন প্রভু ভকতবৎসল॥
চৈত্রেতে চণ্ডীর পূজা সর্ব্বকালে ছিল। অকালে শরত যোগে পূজা আরম্ভিল॥ (৮)
আশ্বিনে অসিত পক্ষ নবমী হইতে। আগামী দশমী তিথি শুক্লা পর্য্যন্ততে॥ (৯)
পার্ব্বতীর প্রীতি কৈলা বেল্বেতে বোধন। এ বলি' সংকল্প কৈলা দেব নারায়ণ॥
শঙ্খ পাত্রে দধি-দূর্ব্বা-পুষ্প দিয়া তথি। ধেনু-মুদ্রা দিয়া তায় করিলা অমৃতী॥
তাহে পূজা-সামগ্রী স্বদেহসিক্ত কৈলা। বেল্ববৃক্ষে পূজা প্রভু করিতে লাগিলা॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমন স্নান জন্য জল। পুনরাচমন গন্ধ পুষ্প পরিমল॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য এ দশ উপচারে। বেল্ববৃক্ষে পূজা প্রভু করেন সাদরে॥
বসনে বেষ্টিত কৈলা বেল্বতরুবর। তাথে দেবী আবাহন করেন সত্বর॥
আগচ্ছ অম্বিকা বেল্বে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইথে। দশ উপচারে দুর্গে পূজা লহ প্রীতে॥

---

(৭) থু'লা—থুইলা, স্থাপনা করিলেন।

(৮) শ্রীরামচন্দ্র কৃত দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে শারদীয়া পূজা প্রথা বিদ্যমান থাকা সম্বন্ধে সাহিত্য-সেবক' ১ম সংখ্যা, ২৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

(৯) ছন্দঃ মিলনানুরোধে পর্য্যন্ততে শব্দের প্রয়োগ কিছু কষ্টকল্পিত বোধ হয়।

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী" মন্ত্র উচ্চারিয়া। বিবিধ বিধানেতে পূজিলা প্রীত হ'য়া॥
পার্ব্বতীর প্রীতে পুনঃ করেন প্রার্থনা। জগতে শুনিলে যা'বে যমের যন্ত্রণা।
দুরিত-পূরিত দ্বিজ জগদ্রাম গায়। দীন দাসে দয়াময়ী হইবে সহায়।

উদ্বোধন।

পুটকরে রঘুবর করেন স্তবন। আর্দ্রাযুত নবমীতে করিলা বোধন।
বেল্ববৃক্ষে বোধন করিয়ে একারণে। মোরে অনুগ্রহ করি' নাশিহ রাবণে।
তুমি চণ্ডী চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চিত্ররূপা। অভয়া অপর্ণা অম্বা অম্বিকা অজপা॥
গুহ-গজানন-মাতা গিরিজা গউরী। (১০) মহেশ-মানস-বিমোহিনী মাহেশ্বরী॥
জয় জয় দুর্গা জয় দৈত্যবিদারিণী। তুষ্ট হ'য়া দুষ্ট নাশ তারা ত্রিলোচনী॥
নমঃ নমঃ নারায়ণী নগেন্দ্র-নন্দিনী। জয় জয়ঙ্করী জয়া জগত-বন্দিনী॥
বিঘ্ন-বিনাশিনী বিন্ধ্যবাসিনী বিজয়া। রক্ষা কর দক্ষসুতা চক্ষুতে চাহিয়া॥
কর দয়া মহামায়া হর-জায়া তুমি। শঙ্কট-নাশিনী-শিবা তেঁই সেবি আমি॥
আজি হৈতে আশ্বিনে পূজিব (১১) তিনলোকে। যে তোমা' পূজিবে তা'র দূর ক'র' শোকে॥
এই বলি' কৃতাঞ্জলি করিলা প্রণতি। ধ্বনি করি' মুনিগণ বেদ পড়ে তথি॥
'জয় জয় দুর্গা' কয় যত কপিগণ। ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে জলধি গর্জ্জন॥
ভুবন ভরিয়া কয় জয়-জয়-কার। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে সীমা নাহি যা'র॥
শ্রীরামের মনোবৃত্তি জানি' পুরন্দর। স্বর্গের নর্ত্তকীগণে পাঠা'লা তৎপর॥
রম্ভা তিলোত্তমা বিদ্যাধরীগণ নাচে। হাহা-হুহু গন্ধর্ব্ব গাইছে কাছে কাছে॥
পারিজাত-পুষ্প-বৃষ্টি দেবগণ করে। মহা মহোৎসব মহীমণ্ডল ভিতরে॥
বোধন করিয়া প্রভু আইলা মণ্ডপে। ষাটি-সহস্রেক ঋষি যাহার সমীপে॥
মৃণ্ময়ী দেখিয়া পুনঃ প্রণমিলা হরি। কুটীর নিকটে আ'লা ধনুর্ব্বাণ ধরি'॥
মুনিচয় বিরল বাসাতে বাস কৈলা। কপিগণ প্রতিমা-যোগেতে যুক্ত হৈলা॥
দ্বিজ জগদ্রাম গায় দুর্গাপঞ্চরাত্রি। পামরে প্রসন্ন হ'বে' পর্ব্বতের পুত্রী॥

---

(১০) গউরী—গৌরী।
(১১) পুজিব—পূজিবে।—সাহিত্য-সেবক, ২য় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠা, ২য় টিপ্পনী দেখুন।

নবপত্রী-নির্ম্মাণ ও অধিবাস।

রাত্রিভাগে চতুর্দ্দিকে রত্ন-বাতি জ্বালি'। নৃত্য-গীত করে কত গুণীগণ মেলি'॥
কপিগণ স্থানে স্থানে মালসাট মারে। ভ্রূকুটী করিয়া কেহ গালবাদ্য করে॥
কেহ একপদে চলে অন্যে লুঠে ধূলে। কেহ কা'র' স্কন্ধে কেহ পৃষ্ঠে চাপি' চলে॥
এই নানাক্রমে রাত্রি হইল প্রভাত। ব্রাহ্মী মুহূর্ত্তেতে গাত্র তুলি' রঘুনাথ॥
মুখ ধৌত করিয়া তা'পর প্রাতঃস্নান। কৃতাহ্নিক হ'য়া মুনি আসেন সেস্থান॥
পূর্ব্বাহ্নতে বেল্বমূলে যাইয়া শ্রীহরি। পার্ব্বতীর পূজন করেন প্রীতি করি'॥
নবমী দশমী একাদশী কি দ্বাদশী। ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী অমা হৈল আসি'॥
শুক্ল প্রতিপদ গেলা দ্বিতীয়া তৃতীয়া। চতুর্থ পত্রিকা কৈলা চতুর্থীর ক্রিয়া॥
পূর্ব্বমতে পঞ্চমীতে পূজিলা পার্ব্বতী। 'বৃহৎ নন্দীকেশ্বর' পূজার পদ্ধতি॥
দ্বাদশ দিবস পূজা কৈলা যথাক্রমে। প্রত্যহ থাকেন রাম সংযম নিয়মে॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে সুগ্রীব রাজন। বিবিধ বিভোগে বিপ্রে করা'ন ভোজন॥
ষাটি-সহস্রেক মুনি মুনিপত্নী যত। যা'র যে ভোজন-রুচি দেন তা'র মত॥
তা'র পর মনঃকর ষষ্ঠীপূজা-বিধি। যে বিধান করিয়া পূজিলা কৃপানিধি॥
জ্যেষ্ঠাতারাযুত ষষ্ঠী তিথি হৈল তথি। সে দিবস অধিবাস কৈলা রঘুপতি॥
সুপ্রভাতে পূর্ব্বমতে বেল্ব বৃক্ষ সেবি'। তাহাতে অর্চ্চন প্রভু কৈলা উমা দেবী॥
নব পত্রী সলনে (১২) লাগয়ে বস্ত্র নয়। যত্ন করি' জনার্দ্দন করিলা সঞ্চয়॥
কদলী দাড়িম্ব ধান্য কচু মানপত্র। হরিদ্রা অশোক বেল্ব জয়ন্তী পবিত্র॥
অপূর্ব্ব অক্ষত পত্র নয় বস্তু আনি'। পত্রিকা সলন (১২) কৈলা দেব রঘুমণি॥
পাটের রজ্জুতে দিব্য হরিদ্রা মিশ্রিতে। নয় স্থানে বদ্ধ কৈলা পরম যত্নেতে॥
শ্বেতাপরাজিতা গুচ্ছ তাথে বেষ্টাইলা। নব পত্রী নির্ম্মাইয়া শঙ্খ বাদ্য কৈলা॥
স্বর্ণ পৃষ্ঠে রাখিলেন প্রতিমা নিকটে। আচ্ছাদিত কৈলা তাথে চারু চিত্রপটে॥
সায়ংকালে আদি সেই বেল্ব তরু মূলে। অধিবাস শ্রীনিবাস কৈলা কুতূহলে॥
তা'পর আসিয়া প্রতিমার সন্নিধানে। নব পত্রী অধিবাস করেন যতনে॥
দ্বিজ জগদ্রাম ভণে ভাবিয়া ভবানী। সংসার-সিন্ধুতে শিবে হইবে তরণী॥

---

(১২) সলন = নির্ম্মাণ।

আমন্ত্রণ-অধিবাস।

বাকল-বাস পরি'	তা'র উত্তরী' করি',	প্রভু বসিলা কুশাসনে।
ভালে গঙ্গার ফোঁটা,	মস্তকে বদ্ধজটা,	বিপ্রঘটা চারি পানে॥
দক্ষিণে বৃহস্পতি,	লইয়া সে পদ্ধতি,	করেন সকল বিধান।
শ্রীরাম কুশহস্ত,	উত্তর মুখে স্বস্ত,	আচমন যথাবিধ জ্ঞান॥
স্বস্তি-বাচন-বিধি,	স্মরিয়া মাধবাদি,	করিলা বিঘ্ন বিনাশন।
বামেতে বাক্য পাত্র,	তাহাতে দর্ভপত্র,	ত্রিকোণ উপরি স্থাপন॥
ত্রিভাগ পূর্ণ জলে,	অক্ষত দূর্ব্বাদলে,	করিলা তীর্থ আবাহন।
নৈবেদ্য স্বদক্ষিণে,	কুসুম সুচন্দনে,	রাখিলা দেব নারায়ণ॥
করিলা ভূতশুদ্ধি,	অঙ্গের ন্যাস বিধি,	মাতৃকা করিলা তা'পর।
যতনে দেব হরি,	ঋষ্যাদি ন্যাস করি',	করিলা শুদ্ধ কলেবর॥
শ্রীদুর্গা-মন্ত্র জপি'	রাঘব ধর্ম্মরূপী,	শোধন করিলা সমস্ত।
ঘন সে ঘণ্টাধ্বনি,	করেন রঘুমণি,	সাত্ত্বিক পূজা সুপ্রশস্ত॥
বেদিকা দিব্যোপরি,	অষ্ট সুদল (১৩) করি',	মণ্ডল পূজিলেন তূর্ণ।
কনক সুকলসে,	হরষ সুমানসে,	জলেতে ঘট কৈলা পূর্ণ॥
আম্রের পল্লব,	শ্রীরঘুবল্লভ,	গুবাক সহিত অর্পণ।
বৃহস্পতির উক্তি,	বিহিত পূর্ব্ব যুক্তি,	লইয়া করেন অর্চ্চন॥
শ্রীদুর্গা-প্রীতি-মনা,	সংকল্প সুরচনা,	জানকী-উদ্ধার কারণ।
গণেশ কি দিনেশ,	অনল বিষ্ণু ঈশ,	পার্ব্বতী কৈলা আবাহন॥
সূর্য্যাদি গ্রহগণ,	করিয়া আবাহণ,	ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল।
সাঙ্গোপাঙ্গ সনে,	সায়ুধ সবাহনে,	পূজেন পরম দয়াল॥
ষোড়শ উপচারে,	পূজিয়া এ সবারে,	প্রবৃত্ত হৈলা অধিবাসে।
মুনির দারা যত,	সে কালে উপস্থিত,	প্রতিমা বেড়ি' চারি পাশে॥
মৃত্তিকা গন্ধ ঘৃত,	সিন্দূর শঙ্খযুত,	কুসুম কজ্জল রোচনা।
সিদ্ধান্ন তাম্র রৌপ্য,	দর্পণ শিলা দীপ,	ধান্য দধি ফল সোণা॥
স্বস্তিক সে সিদ্ধার্থ,	প্রশস্ত শুদ্ধ পাত্র,	অমৃত অঙ্গুলি অগ্রে।
আদৌ ঘটেতে দিয়া,	পত্রিকা পরশিয়া,	মৃণ্ময়ে দেন অনুলীত্রে॥

(১৩) অষ্ট সুদল — অষ্টদল পদ্ম।

পুজিতে দেবী চণ্ডী, মন্ত্র বাইশ কাণ্ডী, পড়িয়া কৈলা অধিবাস।
ব্রাহ্মণীগণ মিলি', করয়ে উলু-লুলী, ধ্বনিতে ভেদিল আকাশ ॥
কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য মাঝে, বিবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ করতাল কাঁসী।
ঢক্কা ঢোল খোল, সাহিণী সুমর্দ্দল, রণশিঙ্গা কাড়া বাঁশী ॥
দামামা দুন্দুভি, ডমরু ডিবি ডিবি, রবাব খমক ঝর্ঝরী।
সেবাক করতাল, ডম্ভ বাজে ভাল, কম্পমান হইল পুরী ॥
অমৃত খঞ্জরী, বাজয়ে ভেরী তূরী, সারিঙ্গা তম্বুরা রসাল।
বেণু বীণা বাজে, দেবী-মণ্ডপ মাঝে, সুরস করিলা সভাল ॥ (১৪)
জগত দুর্ম্মতি, তাহার নিষ্কৃতি, না দেখি' ভব সংসারে।
দেবীর অধিবাস, রচিল করি' আশ, নিদানে তারিণী যে করে ॥

দেবী-আনয়নের আয়োজন ও ষষ্ঠীপালা-সমাপ্তি।

অধিবাস করি' হরি হইলা সুস্থির। পত্রের কুটীরে গেলা দেব রঘুবীর ॥
মুনিগণ গমন করিলা বাসা-ঘরে। ফলাহার কৈলা দুই ভাই সমাদরে ॥
একালে সুগ্রীবে ক'ন দেব সনাতন। কালি উষাকালে মৈত্র করিহ গমন ॥
আদর করিয়া উমা মায়েরে আনিতে। সসৈন্য সহিত চল গজ-বাজী-যুতে ॥
রবিবারে গজপৃষ্ঠে আনিব ভবানী। করীর করিবে সজ্জা অপূর্ব্ব আপনি ॥
প্রহরেক রাত্রিশেষ থাকিবেক যবে। নানা বাদ্যভাণ্ড ল'য়া সেজে এস তবে ॥
যে পথে আনিতে যা'বে আসিবেন যাথে। উচ্চ-নীচ ঘুচাইবে রাত্রির মধ্যেতে ॥
চন্দনের ছড়া দিয়া করিবে লেপন। কুসুম বিছা'বে তাথে করিয়া যতন ॥
মার্গের দু'ভিতে রোপ স-ফল কদলী। তার তলে পূর্ণঘট ঘৃত-দীপ জ্বালি' ॥
মণ্ডপ হইতে হ্রদ পরিমাণ সীমা। ধ্বজ বসাইবে শ্বেত-পিঙ্গল-লালিমা ॥
অতি উচ্চ ধ্বজ দুই ভিতেতে থুইবে। তদুপরি সারি-সারি বনমালা দিবে ॥
চন্দ্রাতপ টাঙাইবে আকাশ মার্গেতে। রবির কিরণ যেন আচ্ছাদয়ে তাথে ॥
তাহার ছায়াতে মাকে আনিব আদরে। কায়মনোবাক্য-ঐক্যে পূজ অম্বিকারে ॥
ভক্তিতে ভবানীরে ভাবিলে এ ভারতে। চতুর্ব্বর্গ দেন যে মা আপনা হইতে ॥
কালি হ'তে চারি দিন মহা মহোৎসব। ইথে বিঘ্ন হ'লে সখা পীড়া অসম্ভব ॥

---

(১৪) সভাল — সভায় সকলকে।

ক্ষুদ্র দোষে ছিদ্র হ'লে ভদ্র নাহি তাথে। অতএব সদা সাবধান হ'বে ইথে॥(১৫)
এ কথা শুনিয়া তথা সুগ্রীব রাজন। পুলকে পূরিত হ'য়া বলেন বচন॥
শুন সনাতন সব তোমাতে বিদিত। পূজা প্রকাশিয়া কৈলে জগতের হিত॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তেঁই নাম ধর। জগতের কাজ নিজগুণে নাথ কর॥
আমি কপি পশুরূপী কিবা মোর জ্ঞান। কিঙ্করেতে কৃতকৃত্য কৈলে ভগবান॥
যে যে বল সে সকল করিব নিশ্চয়। ভাল মন্দ তুমি জ্ঞান শুন কৃপাময়॥
এই বলি আ'লা চলি' সুগ্রীব রাজন। আয়োজন কৈলা যে বলিলা নারায়ণ॥
ষষ্ঠী দিবসের গান এই পরিসীমা। এ প্রসঙ্গ শ্রবণে প্রসন্ন হ'ন উমা॥
যে গায় গাওয়ায় ভাবে শুনে যত জনা। নিত্যানন্দময়ী মাতা করেন করুণা॥
দ্বিজ জগদ্রাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি গায়। হরি-ধ্বনি কর ষষ্ঠীপালা হৈল সায়॥

কালিদাসের কাহিনী।

(৪)

কালিদাস বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী বাণী নরীনৃত্যতে
তদ্দৃষ্ট্বা কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধা গুণৈঃ।
কীর্ত্তিশ্চন্দ্র করীন্দ্র কুন্দ কুমুদ ক্ষীরোদনীরোপমা
ত্রাসাদম্বুনিধিং বিলঙ্ঘ্য ভবতো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

হে রাজন্, সপত্নী সরস্বতী তোমার বদনবিবরে সতত নৃত্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও কমলা চঞ্চলা হইলেও ত্বদীয় গুণরাশি দ্বারা আবদ্ধা হইয়া তোমাতেই বিরাজমানা রহিয়াছেন। চন্দ্র, ঐরাবত, কুন্দ, কুমুদ এবং ক্ষীরোদ-নীরের সহিত যাহার উপমা সম্ভবে, ঈদৃশী ভবৎ-কীর্ত্তি * (কমলার বন্ধনাবস্থা দর্শনে যেন) ত্রাসিতা হইয়া সাগর পার হইয়াও বিশ্রামলাভ করিতে পারি-তেছে না।

---

(১৫) কবি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করাইয়া দিয়াছেন।—সাহিত্য-সেবক, ৯ম সংখ্যা, ২৭৬ পৃষ্ঠা, ২য় পংক্তি দেখুন।

* "যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাস-কীর্ত্ত্যোঃ"—সাহিত্য-দর্পণ।—কীর্ত্তিতে 'ধবলতা' আরোপ করা একটি কবি-সময়-প্রসিদ্ধি (*Poetical License.*)

যশোমুক্তাভিস্তে গুণিবর গুণৌঘৈঃ কমলভূ-
রতি প্রেম্না হারং গ্রথিতুমতুলং যত্নমকরোৎ।
গুণান্তং মৌক্তং বা গুণবিবরমালোক্য ন চিরা-
ক্রুষা ক্ষিপ্তাস্তেন ক্ষিতি-তিলক তারা বিয়তি তাঃ॥

হে গুণিবর, কমলযোনি ব্রহ্মা ত্বদীয় যশোরূপ মুক্তাসমূহ লইয়া তোমার গুণাবলী দ্বারা অতি আদর করিয়া একটি হার গাঁথিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও গুণের অন্ত কিংবা মুক্তায় ছিদ্র না পাইয়া বিরক্ত হইয়া তিনি ঐ মুক্তারাশি ছড়াইয়া ফেলিয়া দেন; হে নরপাল, ঐগুলি সম্প্রতি নক্ষত্র-রূপে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে।

শ্রীমন্নাথ ভবদ্‌যশোবিটপিনঃ খেতারকাঃ কোরকা-
স্তেষামেকতমঃ পুরা বিকশিতো যঃ পূর্ণিমাচন্দ্রমাঃ॥
তেনেদং মকরন্দসুন্দরসুধাস্যন্দৈর্জগন্মণ্ডিতং
শেষেষ্বেষু বিকাশ্বরেষু ভবিতা কীদৃঙ্ন জানীমহে॥

হে নরনাথ, আকাশের তারকারাজি তোমার যশোবৃক্ষের কোরক। উহা-দের একটি পুরাকালে প্রস্ফুটিত হইয়া পূর্ণিমার চন্দ্র হইয়াছে। তাহা হইতে ক্ষরিত মকরন্দ সদৃশ সুধাধারা দ্বারা জগৎ আপ্যায়িত হইয়াছে। না জানি অবশিষ্ট সকলগুলি (তারকাকোরক) বিকশিত হইলে কিরূপ শোভাই হইবে!

ত্বদ্বাহুব্যূহবেগক্ষতধরণিতলে বৈরিবামাশ্রুপঙ্কে
ক্ষিপ্তোন্মত্তেভকুম্ভস্থল দলন বশান্মৌক্তিকন্তত্র বীজং।
তজ্জাতা কীর্ত্তিবল্লীগগনবনচরীমূলমস্তাঃ ফণীন্দ্রঃ
শুভ্রাণ্যভ্রাণি পত্রাণ্যুড়ুগণকলিকাশ্চন্দ্রমাঃ ফুল্লপুষ্পং॥

তোমার বাহুবলে পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত হইয়া (যেন) চষিত হইয়াছে; তাহাতে শত্রুনারীগণের অশ্রুধারা পতিত হইয়া কর্দ্দম হইয়াছে; উহাতে মদ-মত্ত মাতঙ্গের বিদারিত কুম্ভস্থল হইতে মুক্তা বীজরূপে পতিত হইয়া তোমার কীর্ত্তিলতার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই কীর্ত্তিলতা আকাশরূপ কাননে অদ্যাপি বিরাজিত; ফণিরাজ অনন্ত ইহার মূল, শুভ্র মেঘগণ ইহার পত্র, নক্ষত্রসমূহ ইহার কলিকা এবং চন্দ্রমা ইহার বিকশিত কুসুম।

ধীর ক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহরীলাবণ্যলক্ষ্মীমুষ-
স্ত্বৎকীর্ত্তেস্তুলনাং কলঙ্কমলিনো ধত্তে কথং চন্দ্রমাঃ।

স্যাদেবং ত্বদরাতিসৌধশিখরে প্রোদ্ভূতশষ্পাঙ্কুর-
গ্রাসব্যগ্রমনাঃ পতেদ্‌যদি পুনস্তস্যাঙ্কশায়ী মৃগঃ॥

হে ধীর, ক্ষীরসমুদ্রের নিবিড় লহরী লীলার যে সৌন্দর্য্য, তত্তুল্য শোভা-শীলা তোমার কীর্ত্তির সঙ্গে কলঙ্কমলিন চন্দ্রের কিরূপে উপমা সম্ভবে? তবে উহা সঙ্গত হইতে পারে, যদি তোমার নির্জ্জিত শত্রুগণের সৌধশিখরে জাতশষ্পাঙ্কুর ভক্ষণার্থ ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রের ক্রোড়স্থ মৃগ বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

সংগ্রামাঙ্গনমাগতেন ভবতা চাপে সমাসাদিতে
দেবাকর্ণয় যেন যেন সহসা যদ্‌যৎসমাসাদিতং।
কোদণ্ডেন শরঃ শরেণ হি শিরস্তেনাপি ভূমণ্ডলং
তেন ত্বং ভবতাপি কীর্ত্তিরতুলা কীর্ত্ত্যা চ লোকত্রয়ং॥

হে দেব, রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তোমার ধনু ধারণ করিবামাত্রেই সহসা কোন্ কোন্ বস্তু কি কি প্রাপ্ত হইল, তাহা শুন—ধনু বাণ [প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ ধনুতে বাণ যোজিত হইল)]; বাণ শত্রুর শির [পাইল]; সেই শির পৃথিবী; পৃথিবী তোমাকে; তুমি অতুল কীর্ত্তি; এবং সেই কীর্ত্তি ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইল।

পাঠক, এই সকল শ্লোক পড়িয়া কি রঘু-মেঘ-কুমার-রচয়িতার কবিতা বলিয়া বোধ হয়? ধন্য রে কিংবদন্তি! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই চতুষ্পাঠীর সরল-বুদ্ধি ভট্টাচার্য্যবর্গ ও অন্তেবাসিদিগকে কি কুহকেই ফেলিয়াছিস্, যে তাঁহারা এই সকল অর্ব্বাচীন কবিকল্পের লেখনী-কণ্ডূয়নজাত "হিণ্ডীর-পিণ্ডী"কে ভারতীর বরপুত্রের স্কন্ধে চাপাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না!

যাহা হউক, রাজা এতক্ষণ কালিদাসের অভিমুখ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এই সকল শ্লোক শ্রবণানন্তর বিপরীত দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিলেন। এই সকল কবিতার পুরস্কার স্বরূপ রাজা সম্মুখস্থ রাজ্যবিভাগ কবিকে মনে মনে দান করাতেই রাজার এই পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের কারণ; কিন্তু কালিদাস বুঝিলেন অন্যরূপ। তাই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরতয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
হে কর্ণাট বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি ভূধরাম্বুদ-নদী-ভূগোল-বৃন্দাটবী
মারুত-চন্দ্র-চন্দনগণাস্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

হে কর্ণাট, প্রত্যুপকারে কাতরতা নিবন্ধন পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিওনা, আমার সুধাময়ী শ্লোকাবলী শ্রবণ কর। পর্ব্বত, মেঘ, নদী, প্রদেশ, বন, ঝড়, বায়ু, চন্দ্র, চন্দন প্রভৃতি কত কি বর্ণনা করিয়াছি, উহাদের হইতে আমি কবে কি প্রাপ্ত হইয়াছি?

অর্থাৎ কিছু পাইবার আশায় কালিদাস ভারতী-নিয়োগ করিতে আসেন নাই; আর, এই পৃষ্ঠ-প্রদর্শনেও কালিদাসের কিছু আসে যায় না ঃ—

পুরো বা পশ্চাদ্বা ক্বচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে
তদা কা নো হানির্বচনরচনৈঃ ক্রীত জগতাং।
বনে বা হর্ম্ম্যে বা কুচকলসহারে মৃগদৃশাং
মণেস্তুল্যং মূল্যং সহজ সুভগস্য দ্যুতিমতঃ॥

বাক্যরচনা দ্বারা জগৎ ক্রয়কারী আমাদের পুরোভাগে অবস্থানেই বা গৌরব কি, এবং পশ্চাৎভাগে অবস্থান ঘটিলেই বা হানি কি? অকৃত্রিম উজ্জ্বল মণি বনেই পড়িয়া থাকুক, প্রাসাদেই রক্ষিত হউক, অথবা সুন্দরীর কুচোপশোভী হার মধ্যেই গ্রথিত থাকুক, তাহাতে উহার মূল্য তুল্যরূপই থাকিবে। *

অবশ্য, ক্ষণকাল পরেই রাজা ও কবিতে আপোষ হইল। বেচারা বব্বন কাণ্ড দেখিয়া বোধ হয় অবাক্ হইয়া গেল!

রাজার কিন্তু 'সুধাসিক্ত সূক্ত'রস-পিপাসা মিটিল না। তিনি শৈব ছিলেন, কবিকে স্বকীয় ইষ্টদেব রুদ্রের বর্ণনা করিতে বলিলেন। শুনিবার দোষে 'রুদ্র' স্থলে কবি বুঝিলেন 'সমুদ্র', তাই বলিলেন—

কিংবাচ্যো মহিমা মহাজলনিধের্যস্যেন্দ্রবজ্রাহতি
ত্রস্তো ভূভৃদমজ্জদম্বুনিচয়ে কুলীরপোতাকৃতিঃ।
মৈনাকোঽতি গভীরনীর বিলসৎ পাঠীন পৃষ্ঠোল্লস-
চ্ছৈবালাঙ্কুর কোটি কোটর কুটীকুট্যন্তরে সংস্থিতঃ॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাহত হইবার ভয়ে মৈনাক পর্ব্বত কর্কট শাবকের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া যাহার গভীর নীরে বিচরণকারী কোনও পাঠীন মৎস্যের (বোয়াল মাছ, ইতি ভাষা) পৃষ্ঠলগ্ন শৈবালাঙ্কুরের কোটি কোটি কোটরের এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিল, সেই মহাসমুদ্রের মহিমা আর কি বলিব?

---

* সাটোপ ভাব টুকু বাদ দিলে এই দুইটি শ্লোক কালিদাসের লেখনীর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

রাজা একটু হাসিলেন:—শ্লোকের উৎকটত্ব নিমিত্ত নহে, কেন না ঈদৃশ গল্পাধিনায়ক রাজন্ত-বর্গের যেন একটু স্বাভাবিকী রস-বধিরতা ছিল, এই জন্য এতাদৃশী "কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী" শ্লোকাবলী ভিন্ন অপর মৃদুতর রচনা তাঁহাদের শ্রবণ বিবরাভ্যন্তরে বোধ হয় পৌঁছিত না; রাজা রুদ্রবর্ণনা করিতে বলিলেন, কিন্তু কবি সমুদ্রের যশোগান যুড়িয়া দিলেন; রাজা তাই হাসিয়া বলিলেন, ইহাই কি রুদ্রবর্ণনা? কবি অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন, তাই বলিলেন, হাঁ মহারাজ, ইহাই রুদ্রবর্ণনা; এখনও ত বর্ণনা শেষ হয় নাই,—

ঈদৃক্ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতা মহীভূভৃদ্ভিরভ্রঙ্কষৈ-
স্তাবদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতা পৃথুপৃথু দ্বীপৈঃ সমন্তাদিয়ং।
যস্য স্ফারফণা মণের্নিমিলিতা তির্য্যক্ কলঙ্কাকৃতিঃ
শেষোঽপ্যেকমগাদযদঙ্গদপদং তস্মৈ * * *॥

ঈদৃশ সাতটা সমুদ্র এবং ঐ সংখ্যক বিমানস্পর্শী পর্ব্বত দ্বারা মণ্ডিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত এই যে পৃথিবী, উহা যাহার শিরঃস্থিত স্বচ্ছ মণিতে সংলগ্ন হওয়াতে মণির কলঙ্কের ন্যায় প্রতিভাত হয়, সেই নাগরাজ শেষ ও যাঁহার কেয়ূর রূপে একতম অঙ্গের ভূষণ মাত্র, তাঁহাকে ———— এইমাত্র বলিয়া, "বেটা বল্ ত রে" বলিয়া কবি শ্লোকের সমাপ্তি করিলেন। নিকটে ভৃত্যরূপী বররুচি দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বলিলেন "নমঃ শম্ভবে"।* কালিদাস নাকি শিবের নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই এই বিড়ম্বনা।

কিন্তু, রে কুহকিনি কিংবদন্তি, ধন্য তোর সাহস! "বেটা বল্ ত রে" এই নিতান্ত আধুনিক প্রাকৃত বাঙ্গালা বুলিটাও কি কালিদাসের মুখনিঃসৃত বলিয়া বাজারে বিকাইতে চাহিয়াছিলি? তোর কি এটাও খেয়াল হইল না যে 'উজ্জয়িনীর' উজ্জ্বল রত্ন, 'বিক্রমাদিত্যে'র সভাসদ্, কালিদাস বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার জন্মের বহুপূর্ব্বে এবং বঙ্গদেশের বহু পশ্চিমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।† তোর অমূলকত্বের ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে?

---

* সুতরাং শ্লোকের শেষ পদটি হইল—
শেষোঽপ্যেকমগাদ্যদঙ্গদপদং তস্মৈ নমঃশম্ভবে॥

† কিন্তু "কালিদাস" এই নামটি বঙ্গজ এবং আধুনিক বলিয়াই প্রতীত হয়। কিংবদন্তীর বোধ হয় উহাতেই এই সাহস। অনেক স্থলে বাঙ্গালা প্রশ্নেরও কালিদাসকে দিয়া উত্তর দেওয়ান হইয়াছে!

এখানেই কালিদাসের এই কর্ণাট-সংবাদ-কাহিনী শেষ হইত। কিন্তু রাজা ছাড়িবার পাত্র নহেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং" ইত্যন্ত শ্লোকটি "কর্ণাট-রাজপ্রিয়া," কি স্বয়ং কর্ণাটরাজ, কাহারই মনোনীত হয় নাই। তাই কালিদাসকে বিদ্রূপ করিবার নিমিত্তই যেন রাজা 'কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং" এই কথাটি দুই একবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভাব বুঝিয়া, কবি ঐ কথাটিকেই অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্লোক রচনা করিলেন—

উগ্রগ্রাহমুদন্বতো জলমতিক্রামত্যনালম্বনে
ব্যোম্নি ভ্রাম্যতি দুর্জ্জয়ক্ষিতিভুজাং মূর্দ্ধনিমারোহতি।
ব্যাপ্তং যাতি বিষাকুলৈরহিকুলৈঃ পাতালমেকাকিনী
কীর্ত্তিস্তে মদনাভিরাম "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং"॥

হে মদনসুন্দর, তোমার কীর্ত্তি কোন অবলম্বন বিনাই একাকিনী ভীষণ হাঙ্গরাকীর্ণ সমুদ্রবারি অতিক্রম করিতেছে; আকাশোপরিস্থ স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছে; দুর্জ্জয় নৃপতিগণকে নির্জ্জিত করিয়া তাহাদের মস্তকোপরি আরোহণ করিতেছে; এবং বিষধর সর্পসমূহ-সমাকীর্ণ পাতাল প্রদেশেও গমন করিতেছে। ইহাতে বোধ হয় স্ত্রীলোকের ভয় কৃত্রিম মাত্র।

এই রূপে কবির কৃতিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া রাজার আর কিছু বক্তব্য রহিল না—বিজয়সূচক জয়পত্র লিখিয়া দিয়া কবির যথোচিত 'মর্য্যাদা' বিধান করিলেন। বলা বাহুল্য, জয়পত্র-সহকৃত কবি বিক্রমাদিত্য-সভায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিক্রমাদিত্যও হৃষ্টচিত্তে কবিকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অদ্ভুত রামায়ণ।—মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত মূল গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।—আজি কালি বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে যে কয়েকটী কল-কণ্ঠী সুমধুর ঝঙ্কারে বঙ্গীয় পাঠকের প্রাণমন তৃপ্ত করিতেছেন, শ্রীমতী সৌদামিনী

দেবী তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। বিধি-বিড়ম্বনায় অকালে পতি-হীনা হইয়া কয়েকটী অল্প বয়স্কা কন্যা লইয়া নিতান্ত নিঃসহায়াবস্থায় তিনি দারুণ দুঃখ-ভারে প্রপীড়িত হইয়াছেন এবং গত্যন্তর না থাকায় সাহিত্য-সেবাই তাঁহার দুঃখাপনোদনের অবলম্বন স্থির করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি সহৃদয় শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই সহানুভূতির পাত্রী। সকলে তদ্রচিত অদ্ভুত রামায়ণের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থ-কর্ত্রীকে উৎসাহিত করিলে আমরা পরম সুখী হইব। টাকাটী কোন অংশেই বৃথা নষ্ট হইবে না।

সীতার জীবন চরিত।—মূল্য ছয় আনা।—এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিও উক্ত সৌদামিনী দেবী প্রণীত। অদ্ভুত রামায়ণের মতানুযায়ী আদর্শসতী সীতার জীবনী পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহার শেষ অংশে "পতি-ব্রতা ধর্ম্ম" শীর্ষক একটী সুন্দর কবিতা আছে।

প্রেমাঞ্জলি।—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য আট আনা।—রত্নাকর সদৃশ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত দেবর্ষি নারদ সমভিব্যাহারে তদীয় ভাগিনেয় পর্ব্বত ঋষির ঘৃত ও শালি-অন্ন ভোজনেচ্ছায় মর্ত্তলোকে পরিভ্রমণ, সৃঞ্জয় রাজের আতিথ্য গ্রহণ, এবং নারদ ও সৃঞ্জয় রাজ-কন্যা সুকুমারীর প্রণয় সংঘটন, ইত্যাদি আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই নাটক খানি রচিত। ক্ষীরোদ বাবু ইতিপূর্ব্বে "ফুল-শয্যা" নামক আর একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থ খানি দ্বারা তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা যে আরও বদ্ধমূল হইবে, ইহা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। রুচিকর পরিহাস-রসিকতায় তিনি বর্ত্তমান নাট্যকারগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি নারদকে তিনি প্রেমের অবতার রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনাপ্রসূত ললিতা ও জনার্দ্দনরূপী প্রকৃতি-পুরুষ ওতপ্রোত ভাবে দেবর্ষির সেই নৈসর্গিক প্রণয়ের মহাপ্রাণ রূপে বিরাজ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও বেশ একটু ক্ষুদ্র প্রচ্ছন্ন লীলা-খেলা করিয়া লইয়াছেন। এরূপ উচ্চভাব পূর্ণ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় এই নূতন, ইহা নির্জ্জনে ধীরভাবে পাঠ্য। পাত্রপাত্রী বিবেচনা করিলে নারদের মুখে "স্মর-গরল-খণ্ডনং" বা ললিতার দ্বারা "জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু" ইত্যাদি বর্ত্তমান যুগের রচিত গান গুলি গীত হওয়াতে বিশেষ কোন দোষ স্পর্শে নাই।